قال الله تعالى وما اتكم الرسول فخذوه ق ومانهكم عنه فانتهوا ج

মা'আরিফুল হাদীস

হাদীসে নববীর এক নতুন ও ব্যাপকভিত্তিক সংকলন

বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ

দ্বিতীয় খন্ড

কিতাবুর রিকাক ও কিতাবুল আখলাক

সংকলন ঃ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী (রহঃ)

অনুবাদ ঃ

হাফেয মাওলানা মুজীবুর রহমান

শায়খুল হাদীস, মাদরাসা দারুল উলূম

মিরপুর-৬, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী

চকবাজার ঃ ঢাকা

সংকলকের ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদু লিল্লাহ! 'মা'আরিফুল হাদীস' এর প্রথম খন্ড (কিতাবুল ঈমান) ১৩৭৩ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় খন্ড এবার ১৩৭৬ হিজরীর শেষ দিকে ছাপা হচ্ছে। প্রথম খণ্ডে ঈমান ও আখেরাতের সাথে সংশ্লিষ্ট ১৬০টি হাদীসের ব্যাখ্যা হয়ে গিয়েছিল। এ দ্বিতীয় খণ্ড— যা রিকাক অধ্যায় ও আখলাক অধ্যায় সম্বলিত, এতে ২৬২টি হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।

অধম সংকলকের দৃষ্টিতে ঈমান সংক্রান্ত হাদীসসমূহের পর মানুষের দ্বীনি উন্নতি, আত্মিক উৎকর্ষ ও চরিত্র গঠনে ঐসব হাদীসই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাব সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে, যেগুলো মুহাদ্দেসীনে কেরাম নিজেদের কিতাবে রিকাক অধ্যায় ও আখলাক অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন। এ জন্য অধম এ দ্বিতীয় খণ্ডে ঐসব হাদীসকেই নির্বাচন করে পাঠকদের সামনে পেশ করছে।

এ খণ্ডে ১০০টি হাদীস রিকাক সংক্রান্ত, আর বাকী ১৬২টি আখলাক সম্পর্কীয়। রিকাক দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব বাণী, ভাষণ ও উপদেশ এবং তাঁর জীবনের ঐসব অবস্থা ও ঘটনাবলী, যেগুলো পাঠ করলে অথবা শুনলে অন্তরে কোমলতা, ভয় ও আবেগ সৃষ্টি হয়। মানুষের দৃষ্টিতে দুনিয়ার মর্যাদা ও মূল্য কমে যায় ও আখেরাতের চিন্তা বেড়ে যায় এবং একথা জানা যায় যে, এ দুনিয়ার জীবনে একজন মু'মিনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু কি হওয়া চাই এবং কিভাবে এখানের জীবন কাটানো উচিত, কোন্ বস্তুর সাথে মন লাগাতে হবে, আর কোন্ জিনিস থেকে অন্তর ও দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রাখতে হবে।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রকৃত কার্যকারক হচ্ছে ঐ উপাদান ও শক্তি, যাকে কলব অথবা অন্তর বলা হয়। এর গতি যদি সঠিক থাকে, তাহলে মানুষের পূর্ণ জীবনই সঠিক গতিতে চলে, আর এর গতি যদি ভ্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে মানুষের সারাটি জীবন ভ্রান্তপথে চলে যায়। রিকাক সংক্রান্ত হাদীসমূহের বিষয়বস্তু এবং এগুলোর বিশেষ কাজ এটাই যে, এর দ্বারা মানুষের অন্তরের গতি ঠিক হয়ে যায় এবং মানুষ এ জীবনে সঠিক গতির সন্ধান পেয়ে যায়। মানুষের অন্তরের গতি সঠিক হয়ে যাওয়ার পরই ঐসকল উন্নত নৈতিকতা ও আখলাক সৃষ্টি হতে পারে, যেগুলোতে সুশোভিত হয়ে একজন মানুষ আল্লাহ্র খলীফা হয়ে যায়। এ নৈতিকতা ও আখলাকের শিক্ষাদান এবং মানব সমাজে এর পূর্ণতা বিধানকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়াতে তাঁর আগমনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বলে উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন ঃ উন্নত নৈতিকতার পূর্ণতা দানের জন্যই আমি

প্রেরিত হয়েছি। যাহোক, অধম সংকলক নিজের এ ধারণা ও চিন্তার ভিত্তিতেই দ্বিতীয় খণ্ডে রিকাক ও আখলাক সম্পর্কীয় হাদীসগুলোকে সাজিয়ে পাঠকদের সামনে পেশ করার প্রয়াস পেয়েছে।

প্রথম খণ্ডের মত এ দ্বিতীয় খণ্ডেও অধিকাংশ হাদীস মেশকাত শরীফ থেকে নেওয়া হয়েছে। তবে কোন কোন হাদীস 'জমউল ফাওয়ায়েদ' থেকেও নেওয়া হয়েছে এবং উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে মূল সংকলকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। হাদীসের বিন্যাস, অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও শিরোনামের ক্ষেত্রে প্রথম খণ্ডে যে বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, এখানেও সেই রীতি অবলম্বন করা হয়েছে, যা এখানে পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই।

প্রথম খণ্ডের ভূমিকাতেও বলে এসেছি এবং এখানেও বলতে চাই যে, হাদীসের পাঠ ও এর চর্চা কেবল নিজের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যেন না হয়; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজের ঈমানী সম্পর্ককে তাজা ও পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে এবং হেদায়াত লাভ ও আমলের উদ্দেশ্যে হাদীস পাঠ করতে হবে। তাছাড়া হাদীস পাঠ ও এর চর্চার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা নিয়ে এভাবে আদব ও মনোযোগ সহকারে পড়তে অথবা শুনতে হবে যে, আমরা যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসে উপস্থিত এবং তিনি বলছেন, আর আমরা শুনছি। এমনটি করলেই আমরা এর দ্বারা পরিপূর্ণভাবে উপকৃত হতে পারব। আল্লাহ্ তওফীক দান করুন।

আল্লাহ্র রহমতের প্রত্যাশী এবং তাঁর বান্দাদের দো'আপ্রার্থী
মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী

শেষ নিবেদন

সম্মানিত ও ভাগ্যবান পাঠকদের খেদমতে আমার নিবেদন এই যে, হাদীসের অধ্যয়ন যেন কেবল জ্ঞান চর্চা হিসাবে না করা হয়; বরং এটা করতে হবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নিজের ঈমানী সম্পর্ক তাজা করার উদ্দেশ্যে এবং আমল ও হেদায়াত লাভের নিয়্যতে। তাছাড়া হাদীস অধ্যয়নের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদা ও ভালবাসাকে অন্তরে অবশ্যই জাগ্রত রাখতে হবে। হাদীস এভাবে পড়তে হবে এবং অন্যকে শুনাতে হবে যে, আমরা যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মজলিসে উপস্থিত, তিনি হাদীস বলছেন, আর আমরা শুনে যাচ্ছি। এমন যদি করা হয়, তাহলে হাদীসের নূর ও হেদায়াত ইনশাআল্লাহ্ নগদে লাভ হয়ে যাবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে সেই তওফীক দান করুন।

সকলের দো'আ প্রার্থী অধম ও গুনাহগার বান্দা
মুহাম্মদ মনযূর নো'মানী
যিলহজ্জ ১৩৭৬ হিজরী

সূচী-পত্র

✪✪✪

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

কিতাবুর রিকাক

[হৃদয় সিক্ত করা হাদীস]

হাদীসের কিতাবসমূহে যেভাবে কিতাবুল ঈমান, কিতাবুস্ সালাত, কিতাবুয্ যাকাত, কিতাবুন্ নিকাহ্, কিতাবুল বুয়ূ' ইত্যাদি শিরোনাম ব্যবহার করা হয়, যেগুলোর অধীনে এসব অধ্যায়ের হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়, ঠিক তেমনিভাবে একটি শিরোনাম 'কিতাবুর রিকাক' নামেও থাকে। যার অধীনে ঐসব হাদীস আনা হয়, যার দ্বারা অন্তরে কোমলতা ও ভাবাবেগ জন্মে, দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততা ও আখেরাতের প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পায় এবং মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টিবিধান ও পরকালীন সাফল্যকে নিজের জীবনের পরম লক্ষ্য স্থির করে নেয়। তাছাড়া এ শিরোনামের অধীনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব ভাষণ, উপদেশবাণী এবং ওয়াযও লিপিবদ্ধ করা হয়, যা মানুষের অন্তরে বিরাট প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

এটা এক বাস্তব সত্য যে, হাদীস-ভান্ডারে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তারকারী ও জীবনের গতি পরিবর্তন করে দেওয়ার মত শক্তিশালী অংশ এটাই, যা হাদীসগ্রন্থসমূহে 'কিতাবুর রিকাক' শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে। তাই এর বিশেষ ও বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। আর এ কথা বলা যায় যে, প্রকৃত ইসলামী তাসাওউফের মূল বুনিয়াদ এটাই।

আমরা এ অধ্যায়টি ঐসব হাদীস দ্বারা শুরু করছি, যেগুলোর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ও আখেরাতের চিন্তা জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন অথবা এর গুরুত্ব ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন।

দো'আ করি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বাণী ও বক্তব্যের যে প্রভাব ঐসব ভাগ্যবান মু'মিনদের অন্তরে পড়েছিল, যাঁরা সর্বপ্রথম স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে সরাসরি এসব বাণী শুনেছিলেন, আল্লাহ্ তা'আলা যেন এর ছিটে ফোঁটা আমাদেরও নসীব করেন।

আল্লাহ্র ভয় ও আখেরাতের চিন্তা

ঈমানের পর মানুষের জীবনকে সৌন্দর্যমন্ডিত করতে ও একে সাফল্যের স্তরে পৌঁছাতে যেহেতু সবচেয়ে বড় ভূমিকা আল্লাহ্ তা'আলার ভয় ও পরকাল-ভাবনার থাকে, তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উম্মতের মধ্যে এ দু'টি গুণ সৃষ্টি করার জন্য বিশেষভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি কখনো এ ভয় ও চিন্তার উপকারিতা ও ফযীলত বর্ণনা করতেন, আবার কখনো আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও শক্তিমত্তা এবং আখেরাতের ঐ কঠিন ও ভয়াবহ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন, যেগুলোর স্মরণ দ্বারা মানুষের অন্তরে এ দু'টি অবস্থার সৃষ্টি হত।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিখ্যাত সাহাবী হযরত হান্যালা (রাঃ)-এর একটি হাদীস— যা কয়েক পৃষ্ঠা পরেই আপনি দেখতে পাবেন— এর দ্বারাও জানা যায় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মজলিসের বিশেষ আলোচ্য বিষয় যেন এটাই ছিল। সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর দরবারে হাজির হতেন এবং আখেরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শুনতেন, তখন তাদের অবস্থা এই হত যে, জান্নাত ও জাহান্নাম যেন তাদের চোখের সামনে।

হাদীসের কেবল বর্তমান ভাণ্ডার থেকেও যদি এ ধরনের সব হাদীস একত্রিত করা হয়, যেগুলোর উদ্দেশ্য আল্লাহর ভয় ও পরকাল-ভাবনা সৃষ্টি করা, তাহলে নিঃসন্দেহে এ ধরনের হাদীস দিয়েই একটি পূর্ণাঙ্গ কিতাব তৈরী হয়ে যেতে পারে। এখানে এ বিষয়ের উপর সামান্য কয়েকটি হাদীসের উল্লেখ করা হল ঃ

অদৃশ্য জগত যদি আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়

(١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً * (رواه البخارى)

১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার জীবন, যদি (আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও শক্তিমত্তা এবং কেয়ামত ও আখেরাতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে) তোমরা জানতে পারতে, যা আমি জানি, তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং তোমাদের কান্না খুবই বেড়ে যেত। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার মাহাত্ম্য, তাঁর ক্রোধ ও প্রভাব এবং কেয়ামত ও আখেরাতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে আমার যা জানা আছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমার সামনে যা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, এ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান যদি তোমরাও লাভ কর, তোমাদের চোখের সামনেও যদি তাই ভেসে উঠে, যা আমি দেখি এবং তোমাদের কানও যদি তাই শুনতে শুরু করে, যা আমি শুনি, তাহলে তোমাদের মধ্যকার স্বস্তি ও শান্তি বিদায় নেবে। ফলে তোমরা খুব কমই হাসবে, আর খুব বেশী কাঁদবে। এর আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) বর্ণিত পরবর্তী হাদীসে জানা যাবে।

(٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ اَرٰى مَا لَا تَرَوْنَ وَاَسْمَعُ مَا لَاتَسْمَعُوْنَ اَطَّتِ السَّمَاءُ وَ حُقَّ لَهَا اَنْ تَاطَّ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا فِيْهَا مَوْضِعُ اَرْبَعِ اَصَابِعَ اِلَّا وَمَلَكٌ وَاضِعٌ جَبْهَتَهٗ سَاجِدًا لِلّٰهِ، وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلاً وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَّمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشَاتِ وَلَخَرَجْتُمْ اِلَى الصُّعُدَاتِ تَجْاَرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ يَالَيْتَنِىْ كُنْتُ شَجَرَةً تُعْضَدُ * (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

২। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি অদৃশ্য জগতের ঐসব জিনিস দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না এবং ঐসব ধ্বনি শুনি, যা তোমরা শুনতে পাও না। আসমান চড়চড় শব্দ করে যাচ্ছে, আর তার জন্য চড়চড় করাই স্বাভাবিক। ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আসমানে এমন চার আঙ্গুল জায়গাও নেই যেখানে কোন না কোন ফেরেশ্‌তা আল্লাহ্‌র দরবারে মাথা অবনত করে সেজদায় না পড়ে আছে। যদি তোমরা ঐ সকল বিষয় জানতে, যা আমি জানি, তাহলে তোমরা খুব কমই হাসতে এবং অনেক বেশী রোদন করতে। এমনকি তোমরা স্ত্রীদের সাথে শয্যা গ্রহণ করে আনন্দ উপভোগ করতে না; বরং আল্লাহর কাছে রোদন করতে করতে বিজন প্রান্তরের দিকে ছুটে যেতে। (এ হাদীস বর্ণনা করে) হযরত আবূ যর বলেন, হায়! আমি যদি কোন বৃক্ষ হতাম, যাকে কেটে ফেলা হয়। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ এ প্রসঙ্গে এ কিতাবের প্রথম খন্ডে (কিতাবুল ঈমানে) বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র রাসূলের আসল কাজ ও দায়িত্ব এটাই যে, আল্লাহ তা'আলা যেসব অদৃশ্য ব্যাপার তাঁর উপর উন্মুক্ত করে দেন এবং যেসব বিধি-বিধান ওহীর মাধ্যমে তাঁর কাছে প্রেরণ করেন, সেগুলো আল্লাহ্‌র অন্যান্য বান্দাদের কাছে পৌঁছে দেবেন। আর তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী উম্মতের কাজ ও দায়িত্ব হল, তারা এ রাসূলের উপর আস্থা ও বিশ্বাস রেখে তাঁর বাতানো বিষয়গুলো সত্য বলে স্বীকার করে নেবে, এগুলো মেনে চলবে এবং এ সত্যকেই নিজেদের জীবনের ভিত্তিমূল বানিয়ে নেবে।

আল্লাহ্ তা'আলা সাধারণ মানুষকে জ্ঞানের যেসব মাধ্যম যথা ঃ জ্ঞান-বুদ্ধি, অনুভূতিশক্তি ইত্যাদি দান করেছেন, এগুলোর উপলব্ধিশক্তি কেবল এ দৃশ্যজগত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ, অদৃশ্য জগতের বেলায় এসব কার্যকর নয়। এ জন্য অদৃশ্য জগতের বাস্তব বিষয়সমূহ জানার জন্য এবং এ ব্যাপারে ধারণা ও বিশ্বাস লাভ করার জন্য আমাদের সামনে কেবল এ একটি পথই রয়েছে যে, আল্লাহ্‌র নবী-রাসূলদের শ্রবণ ও দর্শন এবং তাঁদের সংবাদ দানের উপর আমরা আস্থা স্থাপন করে এগুলো বিশ্বাস করে নেব। আর এরই নাম হচ্ছে ঈমান।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য জগত সম্পর্কে তাঁর একটি ভয়ঙ্কর উপলব্ধির কথা উল্লেখ করেছেন যে, মহান আল্লাহ্‌র মহিমাময় প্রতাপ এবং ফেরেশ্‌তাদের সংখ্যাধিক্যের কারণে আসমান চড়চড় করে কাঁপছে। এতে চার আঙ্গুল জায়গাও এমন নেই, যেখানে কোন না কোন ফেরেশ্‌তা সেজদাবনত হয়ে না আছে। আল্লাহু আকবার!

এরপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আমার মত তোমরাও সেসব বিষয় জেনে নিতে, যা আমি জানি এবং শুনি, তাহলে তোমরা এ দুনিয়াতে এমন হাসিখুশী ভাব নিয়ে বসবাস করতে পারতে না এবং তোমাদের স্ত্রীদের সাথে আনন্দ-মিলনের কথাও তোমরা ভুলে যেতে। তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বের হয়ে পথে-প্রান্তরে আল্লাহর উদ্দেশ্যে রোদন করতে থাকতে।

হাদীসটির বর্ণনাকারী হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ)-এর উপর এ হাদীসের এমন প্রভাব পড়েছিল যে, অনেক সময় এ হাদীস বর্ণনা করার পর তাঁর অন্তরের এই আকুতি বের হয়ে যেত যে, হায়! আমি যদি একটি বৃক্ষ হতাম, যা শিকড় থেকে কেটে ফেলা হত। আর এতে করে আমি আখেরাতে হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিত হওয়া থেকে রেহাই পেতাম।

শিক্ষা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার অভিপ্রায় যেহেতু মানবজাতিকে দিয়ে পৃথিবীর খেলাফতের কাজ নেওয়া, আর এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ এ পৃথিবীতে স্বস্তি ও শান্তিতে থাকতে পারবে। এ জন্য ঐসব বাস্তবতা ও বিষয়সমূহ সাধারণ মানুষ থেকে পর্দার অন্তরালে রাখা হয়েছে, যেগুলো উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর মানুষ এ পৃথিবীতে স্বস্তিতে থাকতে পারবে না। যেমন, কবর অথবা জাহান্নামের আযাব এবং অনুরূপভাবে কেয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্যাবলী যদি এ দুনিয়াতেই আমাদের মত মানুষের সামনে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয় এবং আমরা তা স্বচক্ষে দেখে নেই, তাহলে আমরা এ দুনিয়াতে কোন কাজই করতে পারব না; এমনকি জীবন ধারনও করতে পারব না।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বারা আল্লাহ তা'আলা যে বিশেষ কাজ নিতে চান, এর জন্য জরুরী ছিল এসকল বিষয় তাঁর সামনে খুলে দেওয়া এবং এক পর্যায় পর্যন্ত এসব বাস্তব অবস্থা তাঁকে পর্যবেক্ষণ করিয়ে দেওয়া, যাতে তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ চূড়ান্ত বিশ্বাস ও প্রত্যয় সৃষ্টি হয়ে যায়, যা তাঁর উচ্চ মর্যাদা ও মহান কাজের জন্য অপরিহার্য ছিল। এ জন্যই এ জাতীয় অনেক অদৃশ্য বিষয়াবলী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে খুলে দেওয়া হয়েছে। এর সাথে মহান আল্লাহ্‌র অপার হেকমত তাঁর অন্তরকে এমন অসাধারণ শক্তিও দান করেছে যে, এ উপলব্ধি ও পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও তিনি যেন নিজের সকল নবুওতী দায়িত্ব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারেন। তিনি যেন দুনিয়াতে এমন সম্পূর্ণ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের নিদর্শন রেখে যেতে পারেন, যা কেয়ামত পর্যন্ত আগত সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের মানুষের জন্য আদর্শ হয়ে থাকে।

আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা দূর করার জন্য মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ করতে হবে

(٣) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةٍ فَرَاَى النَّاسَ كَاَنَّهُمْ يَكْتَشِرُوْنَ قَالَ اَمَا اِنَّكُمْ لَوْ اَكْثَرْتُمْ ذِكْرَهَادِمِ اللَّذَّاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا اَرٰى اَلْمَوْتِ فَاَكْثِرُوْا ذِكْرَهَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ فَاِنَّهٗ لَمْ يَاْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمٌ اِلَّا تَكَلَّمَ فَيَقُوْلُ اَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَاَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَاَنَا بَيْتُ التُّرَابِ وَاَنَا بَيْتُ الدُّوْدِ وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَّ اَهْلًا اَمَا اِنْ كُنْتَ لَاَحَبَّ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاِذَا وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِىْ بِكَ قَالَ فَيَتَّسِعُ لَهٗ مَدَّ بَصَرِهٖ وَيُفْتَحُ لَهٗ بَابٌ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ اَوِ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَامَرْحَبًا وَّ لَااَهْلًا اَمَا اِنْ كُنْتَ لَاَبْغَضَ مَنْ يَّمْشِىْ عَلٰى ظَهْرِىْ اِلَىَّ فَاِذَا وُلِّيْتُكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ اِلَىَّ فَسَتَرٰى صَنِيْعِىْ بِكَ قَالَ فَيَلْتَئِمُ عَلَيْهِ حَتّٰى تَخْتَلِفَ اَضْلَاعُهٗ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاَصَابِعِهٖ فَاَدْخَلَ بَعْضَهَا فِىْ جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ وَيُقَيِّضُ لَهٗ سَبْعُوْنَ تِنِّيْنًا لَوْ اَنَّ وَاحِدًا مِّنْهَا نَفَخَ فِى الْاَرْضِ مَا اَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَسْنَهٗ وَيَخْدِشْنَهٗ حَتّٰى يُفْضٰى بِهٖ اِلَى الْحِسَابِ قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفَرِ النَّارِ * (رواه الترمذى)

৩। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন নামাযের জন্য ঘর থেকে মসজিদে তশরীফ আনলেন। তিনি এসে দেখলেন যে, লোকেরা যেন খিলখিল করে হাসছে। (এ অবস্থাটি ছিল আখেরাত সম্পর্কে উদাসীনতার পরিচায়ক।) তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাদের এ অবস্থার সংশোধনের জন্য) বললেন ঃ আমি তোমাদেরকে বলছি যে, তোমরা যদি সকল স্বাদ বিনাশকারী মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ করতে, তাহলে তা তোমাদেরকে এ অবস্থা থেকে বিরত রাখত, যে অবস্থাটি আমি দেখছি। তাই তোমরা মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ কর। কেননা, কবর (অর্থাৎ, ভূমির ঐ অংশটি, যা মৃত্যুর পর মানুষের শেষ ঠিকানা হয়ে থাকে,) প্রতিদিন ডাক দিয়ে বলে ঃ আমি মুসাফেরীর ঘর, আমি একাকীত্বের ঘর, আমি মাটির ঘর এবং আমি সাপ-বিচ্ছুর ঘর। (কবরের এ আহ্বানের অর্থ তার মুখের ভাষাও হতে পারে। এমতাবস্থায় তার এ আহ্বান তারাই শুনতে পায়, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা শুনাতে চান। আর এ অর্থও হতে পারে যে, কবর তার অবস্থার ভাষায় এ আহ্বান জানাতে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা যাদেরকে অবস্থার ভাষা শোনার কান দান করেছেন, তারা অহরহই এ আহ্বান শুনতে থাকে।) কোন মু'মিন বান্দাকে যখন মাটিতে দাফন করা হয়, তখন মাটি (কোন প্রিয়তম ও সম্মানিত মেহমানের মত তাকে সাদরে বরণ করে) বলে ঃ মারহাবা! (আমার অন্তর ও চোখ তোমার পথের বিছানা হোক।) ভালই এসেছ এবং নিজের বাড়ীতেই এসেছ। পৃথিবীতে আমার বুকের উপর যারা চলাফেরা করত, তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার কাছে অধিক প্রিয়। তাই আজ যখন তোমাকে আমার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে এবং তুমি আমার কাছে এসে গিয়েছ, এবার দেখতে পাবে যে, আমি (তোমার খেদমত ও আরামের জন্য) কি করি। তারপর ঐ কবর-ভূমি তার দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত প্রশস্ত হয়ে যায় এবং তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়।

পক্ষান্তরে যখন কোন পাপাচারী (অথবা বলেছেন, কোন কাফের) মাটিতে সমর্পিত হয়, তখন মাটি তাকে বলে ঃ আমার নিকট তোমার এ আগমন সুখকর হবে না। পৃথিবীতে যত মানুষ আমার বুকের উপর চলাফেরা করত, তাদের মধ্যে তুমিই ছিলে আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত। আজ যখন তোমাকে আমার কাছে সমর্পণ করা হয়েছে এবং তুমি আমার কাছে এসে গিয়েছ, তখন দেখতে পাবে যে, আমি তোমার সাথে কিরূপ আচরণ করি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারপর চতুর্দিক থেকে মাটি তাকে এমনভাবে চাপ দিতে থাকে যে, এর ফলে তার এক দিকের পাঁজরের হাড় অন্য দিকে ঢুকে যায়। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এক হাতের আঙ্গুলগুলো অন্য হাতের আঙ্গুলসমূহের ভিতর ঢুকিয়ে আমাদেরকে এর প্রতিচিত্র দেখালেন এবং বললেন ঃ তারপর তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য এমন সত্তরটি বিষধর অজগর নিযুক্ত করা হয় যে, এগুলোর একটিও যদি পৃথিবীতে একবার নিঃশ্বাস ফেলে, তাহলে কেয়ামত পর্যন্ত এ মাটি আর কোন তৃণলতা জন্ম দিতে পারবে না। এ অজগরগুলো তাকে অনবরত দংশন করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাকে হিসাবের জন্য উপস্থিত করা হবে।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন ঃ কবর হয়তো জান্নাতের একটি বাগান অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত, এ ছাড়া আর কিছুই নয়। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কবরের শাস্তি ও শান্তি সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা এ কিতাবের প্রথম খন্ডে করা হয়েছে। মানুষের জ্ঞানের অপূর্ণতা বা সীমাবদ্ধতার দরুন এ ব্যাপারে যেসব প্রশ্ন ও সংশয় সৃষ্টি হয়ে থাকে, এগুলোর জবাবও সেখানে দেওয়া হয়েছে। সেখানে একথাও বলে দেওয়া হয়েছে যে, কবর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে বরযখ জগতে মানুষের ঠিকানা— চাই সেটা পারিভাষিক অর্থের কবর হোক বা অন্য কিছু। সেখানে একথাও বলা হয়েছে যে, শাস্তি অথবা পুরস্কারের ক্ষেত্রে যেখানে সত্তর অথবা অন্য কোন বড় সংখ্যা হাদীসে উল্লেখ করা হয়, সেখানে এর দ্বারা কেবল আধিক্য বুঝানো উদ্দেশ্য হতে পারে। মোটকথা, এসকল বিষয়ের আলোচনা বিস্তারিতভাবে প্রথম খন্ডেই করা হয়েছে। এখানে হাদীসের মূল প্রেরণাটি উপলব্ধি করাই উদ্দেশ্য যে, কোন বান্দার জন্য আল্লাহ্ থেকে এবং আখেরাতে নিজের পরিণাম থেকে কখনো গাফেল এবং উদাসীন হয়ে থাকা উচিত নয়; বরং মৃত্যু এবং কবরের কথা স্মরণ করে, এর মাধ্যমে উদাসীনতার চিকিৎসা করে যাওয়া চাই। নিঃসন্দেহে এটাই হচ্ছে এর অব্যর্থ চিকিৎসা।

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আল্লাহ্র যে ভয় ও আখেরাতের যে চিন্তা ছিল, সেটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ চিকিৎসা পদ্ধতিরই সুফল ছিল। আজও এ গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহ কিছুটা তাদের মধ্যেই পাওয়া যায়, যারা মৃত্যু এবং কবরের স্মরণকে নিজেদের জীবনবৃত্তি বানিয়ে নিয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, আমরা যেন মৃত্যু এবং কবরের স্মরণ দ্বারা নিজেদের উদাসীনতার চিকিৎসা করতে পারি এবং আল্লাহ্র ভয় এবং পরকাল-চিন্তাকে নিজেদের জীবনের ভিত্তিমূল বানিয়ে নিতে পারি।

(٤) عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا ذَهَبَ ثُلُثَا اللَّيْلِ قَامَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اُذْكُرُوا اللّٰهَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ جَاءَتِ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ جَاءَ الْمَوْتُ بِمَا فِيْهِ * (رواه الترمذى)

৪। হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল এই যে, যখন রাতের দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হয়ে যেত, তখন তিনি উঠতেন এবং বলতেন ঃ হে লোকসকল! আল্লাহ্কে স্মরণ কর, আল্লাহ্কে স্মরণ কর। প্রকম্পিতকারী বস্তু অর্থাৎ, কেয়ামত নিকটে এসে গিয়েছে। এর পেছনেই আসবে পশ্চাদগামী আরেকটি বস্তু। (অর্থাৎ, দ্বিতীয় ফুৎকার।) মৃত্যু তার সকল অবস্থা নিয়ে মাথার উপর এসে গিয়েছে। মৃত্যু তার সবকিছু নিয়ে মাথার উপর এসে গিয়েছে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের রুটীন ও অভ্যাস সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে, এর সবগুলোকে সামনে রাখলে জানা যায় যে, তাঁর সাধারণ অভ্যাস ও রুটীন এই ছিল যে, রাতের প্রায় এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তিনি নিজের কাজ-কর্ম ও ব্যস্ততা এবং এশার নামায ইত্যাদি থেকে অবসর হয়ে যেতেন। এর পর কিছু সময় বিশ্রাম ও আরাম করতেন। তারপর তাহাজ্জুদের জন্য উঠে যেতেন। রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তিনি নিজের পরিবার-পরিজন ও সাধারণ মু'মিনদেরকেও জাগ্রত করতে চাইতেন। তখন তিনি নিদ্রার

অবসাদ দূর করার জন্য তাদেরকে কেয়ামতের কম্পন সৃষ্টিকারী ও ভয়াবহ অবস্থা এবং মৃত্যুর কঠিন যন্ত্রণার কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। নিঃসন্দেহে আলস্য-নিদ্রা দূর করার জন্য, আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে চিন্তা ও আখেরাতের ভাবনা সৃষ্টি করার জন্য এবং তাদেরকে আল্লাহ্‌মুখী করে তাঁর এবাদত ও যিকিরে লিপ্ত করার জন্য এ পদ্ধতিটি একটি অব্যর্থ চিকিৎসা। আজও যার কাছে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য বিছানা থেকে উঠা কঠিন মনে হয়, সে যদি এ সময় মৃত্যু, কবর এবং কেয়ামতের কঠিন অবস্থাকে স্মরণ করে নেয়, তাহলে তার ঘুমের নেশা অবশ্যই উড়ে যাবে।

যারা ভয় ও চিন্তার অধিকারী তারাই সফলকাম হবে

(٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَافَ اَدْلَجَ وَمَنْ اَدْلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلَ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ غَالِيَةٌ اَلَا اِنَّ سِلْعَةَ اللّٰهِ الْجَنَّةُ * (رواه الترمذى)

৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ভয় রাখে, সে রাতের প্রথম প্রহরেই রওয়ানা হয়ে যায়। আর যে রাতের শুরুতে রওয়ানা হয়ে যায়, সে নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে যায়। মনে রেখো! আল্লাহ্‌র পণ্য কোন সস্তা জিনিস নয়; বরং খুবই মূল্যবান। স্মরণ রেখো যে, আল্লাহ্‌র এ পণ্য হচ্ছে জান্নাত। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ আরবদের সাধারণ রীতি ছিল এই যে, মুসাফিরদের কাফেলা গভীর রাতে যাত্রা করত এবং এ কারণে অস্ত্রধারী এবং ডাকাতের আক্রমণও সাধারণতঃ শেষ রাতের দিকেই হত। এর অনিবার্য ফল হিসাবে যে পথিক অথবা কাফেলা ডাকাতদের আক্রমণের আশংকা করত, তারা মধ্য রাতের পরিবর্তে রাতের প্রথম ভাগেই যাত্রা শুরু করে দিত এবং এ কৌশলে তারা নিরাপদে নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছে যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উদাহরণ দ্বারা এ বিষয়টি বুঝাতে চেয়েছেন যে, ডাকাতের ভয়ে শংকিত মুসাফির যেভাবে নিজের আরাম ও নিদ্রা বিসর্জন দিয়ে রাতের প্রথম ভাগেই যাত্রা শুরু করে দেয়, তদ্রূপ নিজের পরিণাম চিন্তাকারী ও জাহান্নাম থেকে শংকিত আখেরাতের পথিককেও নিজের গন্তব্যস্থল অর্থাৎ, জান্নাতে পৌঁছার জন্য আরাম-আয়েশ এবং প্রবৃত্তির চাহিদা বিসর্জন দিয়ে দ্রুত পথ চলতে হবে।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিলেন যে, বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট থেকে যা নিতে চায়, সেটা কোন সস্তা জিনিস নয় যে, এমনিতেই বিনামূল্যে দিয়ে দেওয়া হবে; বরং সেটা হচ্ছে খুবই মূল্যবান ও দামী জিনিস। সেটা জীবন ও সম্পদের কুরবানী এবং প্রবৃত্তির চাহিদা বিসর্জন দেওয়ার মাধ্যমেই লাভ হতে পারে। আর সে জিনিসটি হচ্ছে জান্নাত। কুরআন মজীদেও এরশাদ হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের নিকট থেকে তাদের জীবন ও অর্থ-সম্পদ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে। তারা যদি নিজেদের জীবন ও সম্পদ আল্লাহ্‌র রাহে উৎসর্গ করে দেয়, তাহলে তারা জান্নাতের অধিকারী হবে। অতএব, জান্নাত যেন এমন পণ্য, যার মূল্য হচ্ছে বান্দার জীবন ও অর্থ-সম্পদ।

মৃত্যু এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণকারীরাই বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী

(٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَجُلٌ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَنْ اَكْيَسُ النَّاسِ وَاَحْزَمُ النَّاسِ قَالَ اَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ وَاَكْثَرُهُمْ اِسْتِعْدَادًا اُولٰئِكَ الْاَكْيَاسُ ذَهَبُوْا بِشَرَفِ الدُّنْيَا وَكَرَامَةِ الْاٰخِرَةِ * (رواه الطبرانى فى المعجم الصغير)

৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহ্‌র নবী! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সব চাইতে পরিণামদর্শী কে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ ঐ ব্যক্তি যে মৃত্যুকে বেশী করে স্মরণ করে এবং এর জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে। বস্তুতঃ এরাই হচ্ছে বুদ্ধিমান। তারা দুনিয়ার সম্মানও লাভ করেছে এবং আখেরাতের মর্যাদারও অধিকারী হয়েছে। —তাবরানী

ব্যাখ্যা ঃ যখন এটাই বাস্তবতা যে, আখেরাতের জীবনই আসল জীবন, আর এটা কোন দিন শেষ হবে না। তাহলে এতে কি সন্দেহ থাকতে পারে যে, জ্ঞানী এবং পরিণামদর্শী হচ্ছে ঐ সকল বান্দাই, যারা সর্বদা মৃত্যুর কথা সামনে রেখে এর প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত থাকে। পক্ষান্তরে ঐসব লোক খুবই বোকা এবং অপরিণামদর্শী, যারা নিজেদের মৃত্যুর কথা বিশ্বাস করেও এর প্রস্তুতি গ্রহণে উদাসীন এবং দুনিয়ার স্বাদ ও মজা গ্রহণেই ব্যস্ত থাকে।

(٧) عَنْ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهٗ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهٗ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ - (رواه الترمذى وابن ماجه)

৭। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বুদ্ধিমান হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে নিজের প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ করে যায়। পক্ষান্তরে নির্বোধ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে নিজেকে প্রবৃত্তির অধীন করে রাখে। (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের পরিবর্তে নফসের দাবী ও চাহিদা পূরণ করে যায়,) আর আল্লাহ্‌র কাছে অনেক আশা করে বসে থাকে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়াতে চালাক ও বুদ্ধিমান হিসাবে ঐ ব্যক্তিকেই বিবেচনা করা হয়, যে দুনিয়া উপার্জনে খুবই তৎপর, দু'হাতে দুনিয়ার সম্পদ কব্জা করে নিতে পারে এবং যা ইচ্ছা তাই করতে পারে। পক্ষান্তরে নির্বোধ মনে করা হয় ঐ ব্যক্তিকে, যে দুনিয়া উপার্জন করতে দ্রুতগামী ও তৎপর নয়। আর দুনিয়াদার মানুষ, যারা এ দুনিয়াকেই সবকিছু মনে করে, তাদের পক্ষে এমন ধারণা করাটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে বলে দিয়েছেন যে, যেহেতু আসল জীবন এ কয়েক দিনের অস্থায়ী জীবন নয়; বরং আখেরাতের অনন্তকালীন জীবনই হচ্ছে আসল জীবন এবং ঐ জীবনের সফলতা তাদের জন্যই নির্ধারিত, যারা দুনিয়ায় থেকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যের জীবন কাটায়। তাই প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধিমান ও সফল বান্দা তারাই, যারা আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণে ব্যস্ত থাকে এবং প্রবৃত্তির উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তাকে আল্লাহ্‌র আনুগত্যে লাগিয়ে রাখে।

পক্ষান্তরে যেসব নির্বোধের এ অবস্থা যে, তারা নিজেদেরকে প্রবৃত্তির গোলাম বানিয়ে রেখেছে এবং এ দুনিয়াতে তারা আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানের অনুসরণের পরিবর্তে নিজেদের প্রবৃত্তির দাসত্ব করে যাচ্ছে এবং এ সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র কাছে নিজেদের শুভ পরিণতির আশা করছে, নিঃসন্দেহে এরা বড়ই মূর্খ ও চিরদিনের জন্য ব্যর্থ। দুনিয়া উপার্জনে তারা যতই পারঙ্গম ও তৎপর হোক না কেন, আসলে তারা খুবই অপরিণামদর্শী, নির্বোধ ও ব্যর্থ। কেননা, তারা প্রকৃত ও স্থায়ী জীবনের প্রস্তুতি গ্রহণ থেকে উদাসীন এবং প্রবৃত্তির দাসত্বে জীবন কাটিয়েও আল্লাহ্‌র আনুগত্যে জীবন যাপনকারীদের মত শুভ পরিণামের আশা করে থাকে। এই মূর্খরা এ সহজ কথাটিও উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে না যে, "যেমন কর্ম তেমন ফল।"

এ হাদীসে ঐসব লোকদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে, যারা নিজেদের বাস্তব জীবনে আল্লাহ্‌র আহকাম ও আখেরাতের পরিণাম থেকে উদাসীন ও নিশ্চিন্ত হয়ে নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে যায় এবং এরপরও আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহের প্রত্যাশায় থাকে। আল্লাহ্‌র কোন বান্দা যদি তাদেরকে সতর্ক করতে যায়, তখন তারা বলেন ঃ আল্লাহ্‌র রহমত খুবই সুবিস্তৃত। এ হাদীসটি বলে দিয়েছে যে, এ ধরনের মানুষগুলো আত্মপ্রবঞ্চনায় পড়ে আছে এবং তাদের পরিণতি হবে খুবই অশুভ।

হাদীসটি দ্বারা এ কথাও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহের আশা তখনই প্রশংসনীয়, যখন তা আমলের সাথে হয়। এ আশা যদি আমলশূন্য ও বদ আমলের সাথে অথবা আখেরাতের প্রতি উদাসীনতার সাথে হয়, তাহলে সেটা প্রশংসনীয় আশা নয়; বরং নফ্‌স ও শয়তানের প্রবঞ্চনা।

পুণ্যকাজ ও এবাদত করেও যারা অন্তরে ভয় রাখে

(৮) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذِهِ الْاٰيَةِ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُوْنَ ؟ قَالَ لَا يَاابْنَةَ الصِّدِّيْقِ وَلٰكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَهُمْ يَخَافُوْنَ اَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِى الْخَيْرَاتِ *

(رواه الترمذى وابن ماجه)

৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনের এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, যেখানে বলা হয়েছে ঃ আর যারা দান করে যা দান করার, এ অবস্থায় যে, তাদের অন্তর ভীত থাকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কি ঐসব লোক, যারা মদ পান করে এবং চুরি করে ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ হে ছিদ্দীক কন্যা! না; বরং এরা আল্লাহ্‌র ঐসব বান্দা, যারা রোযা রাখে, নামায পড়ে এবং দান-খয়রাত করে। এতদসত্ত্বেও তারা ভয় করে যে, তাদের এ এবাদত কবূল হয় কিনা। এরাই কল্যাণের পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ সূরা "মু'মিনূন"-এর চতুর্থ রুকূতে আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব বান্দাদের কিছু বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন, যারা কল্যাণ ও শুভপরিণতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে তাদের একটি গুণ এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যা কিছু দান করে, এ অবস্থায় করে যে, তাদের অন্তর ভীত থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) এ আয়াত সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, এর দ্বারা কি ঐসব লোক উদ্দেশ্য, যারা দুর্ভাগ্যক্রমে গুনাহ্ করে ফেলে, কিন্তু গুনাহ্র ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে থাকে না; বরং গুনাহ্গার হওয়া সত্ত্বেও তাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থাকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ না, এ আয়াতের দ্বারা উদ্দেশ্য ঐসব লোক নয়; বরং উদ্দেশ্য আল্লাহ্র ঐসব অনুগত ও এবাদতকারী বান্দা, যাদের অবস্থা এই যে, তারা নামায, রোযা, দান-খয়রাত ইত্যাদি নেক আমল করে যায়, কিন্তু তাদের অন্তরে এ ভয় থাকে যে, কে জানে, আমাদের এ আমল আল্লাহ্র দরবারে কবূল হবে কিনা।

কুরআন মজীদে এসব বান্দাদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে ঃ এরাই প্রকৃত সাফল্য ও সুখের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে এ পর্যায়ে এই শেষ আয়াতটির দিকেও ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিলেন যে, অন্তরের এ ভয় এবং এ চিন্তাই মানুষকে শুভ পরিণতি ও সাফল্যের দ্বারে নিয়ে যায়।

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, মহান আল্লাহ্র অমুখাপেক্ষিতা এবং তাঁর প্রভাব ও প্রতাপের দাবী এটাই যে, বান্দা বিরাট বিরাট নেক আমল ও এবাদত করার পরও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবে না; বরং সর্বদা ভীত থাকতে হবে যে, কোন ত্রুটির কারণে আমার এ আমল আমার মুখের উপরই নিক্ষেপ করে দেওয়া হয় কিনা। আর যার অন্তরে যতটুকু ভয় থাকবে, সে ততটুকুই কল্যাণ ও সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবে।

কেয়ামতের দিন বড় বড় আবেদরাও নিজের এবাদতকে তুচ্ছ মনে করবে

(৯) عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَفَعَهُ لَوْ اَنَّ رَجُلًا يَخِرُّ عَلٰى وَجْهِهٖ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ اِلٰى يَوْمِ يَمُوْتُ فِىْ مَرْضَاةِ اللّٰهِ لَحَقَّرَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ * (رواه احمد)

৯। ওতবা ইবনে ওবাইদ (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি তার জন্মের দিন থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একাধারে সেজদায় পড়ে থাকে, তবুও কেয়ামতের দিন সে তার এ আমলকে তুচ্ছ মনে করবে। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, কেয়ামতের দিন যখন মানুষের উপর ঐসব বাস্তবতা উন্মোচিত হয়ে যাবে এবং শান্তি ও শাস্তির ঐসব দৃশ্যাবলী চোখের সামনে এসে যাবে, যা এখানে অদৃশ্যের অন্তরালে রয়েছে, তখন আল্লাহ্র ঐসব বান্দারাও যারা নিজেদের জীবনের অধিকাংশ সময় আল্লাহ্র এবাদতে কাটিয়েছে, এ কথাই অনুভব করবে যে, আমরা তো কিছুই করি নাই। এমনকি কোন বান্দা যদি এমনও হয় যে, জন্ম থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত সারাটি জীবন সেজদায় কাটিয়ে দিয়েছিল, তারও অনুভূতি এটাই হবে এবং সে নিজের এ আমল ও সাধনাকেও তুচ্ছ মনে করবে।

কেয়ামতের দিন মামুলী গুনাহ্র জন্যও পাকড়াও হবে

(١٠) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا عَائِشَةُ اِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوْبِ فَاِنَّ لَهَا مِنَ اللّٰهِ طَالِبًا * (رواه ابن ماجه والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان)

১০। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছিলেন ঃ হে আয়েশা! নিজেকে ঐসব গুনাহ্ থেকেও দূরে রাখ, যেগুলোকে তুচ্ছ ও মামুলী মনে করা হয়। কেননা, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এগুলোর ব্যাপারেও কৈফিয়ত তলব করা হবে। —ইবনে মাজাহ্, দারেমী, বায়হাকী শু'আবুল ঈমানে

ব্যাখ্যা ঃ যেসব লোকের মধ্যে আখেরাতের হিসাব-নিকাশের কিছুটা চিন্তা থাকে এবং যারা আল্লাহ্র আযাব ও পাকড়াওকে ভয় করে, তারা কবীরা গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকার ব্যাপারে সাধারণতঃ যত্নবান হয়ে থাকে। কিন্তু যেসব গুনাহ্কে হাল্কা ও সগীরা মনে করা হয়, সেগুলোকে তুচ্ছ ও মামুলী মনে করার দরুন অনেক খোদাভীরু মানুষও এগুলো থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা বেশী একটা করে না। অথচ গুনাহ্ হিসাবে এবং এ বিবেচনায় যে, এগুলো করলেও আল্লাহ্র হুকুম লংঘিত হয় এবং আখেরাতে এর জন্যও জবাবদিহি করতে হবে, আমাদেরকে এগুলো থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা ও চেষ্টা করতে হবে।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে এ নসীহতই করেছেন। এখানে বিশেষভাবে হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে সম্বোধন করে কথাটি বলা হলেও আসলে এ সতর্কবাণী ও উপদেশটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের সকল নারী-পুরুষের জন্যই ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের লোকদের জন্য যখন এ চিন্তা ও সতর্কতার প্রয়োজন, তাহলে আমাদের মত লোকদের পক্ষে এ ব্যাপারে উদাসীনতার কি অবকাশ থাকতে পারে ?

প্রকৃত বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, সগীরা গুনাহ্ যদিও কবীরার তুলনায় ছোট; কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধের কারণ হিসাবে– এবং এ হিসাবে যে, আখেরাতে এরও কৈফিয়ত দিতে হবে– এটা কখনো ছোট এবং হাল্কা নয়। এ দু'টির মধ্যে এতটুকুই পার্থক্য, যেমন অধিক বিষাক্ত ও কম বিষাক্ত সাপের মধ্যে হয়ে থাকে। অতএব, আমরা যেমন কম বিষাক্ত সাপ থেকেও আত্মরক্ষা ও সতর্কতা অবলম্বন করে থাকি, তেমনিভাবে সগীরা গুনাহ থেকেও আমাদের নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখার এবং হেফাযতে রাখার পূর্ণ চেষ্টা-সাধনা করা উচিত। এটাই এ হাদীসের দাবী ও উদ্দেশ্য।

গুনাহ্র পরিণতির ভয় এবং আল্লাহ্র রহমতের আশা

(١١) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى شَابٍّ وَهُوَ فِى الْمَوْتِ فَقَالَ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ اَرْجُوا اللّٰهَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنِّىْ اَخَافُ ذُنُوْبِىْ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِىْ قَلْبٍ فِىْ مِثْلِ هٰذَا الْمَوْطَنِ اِلَّا اَعْطَاهُ اللّٰهُ مَا يَرْجُوْ مِنْهُ وَاٰمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ – (رواه الترمذى)

১১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুবকের কাছে গেলেন, যখন সে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি ঐ যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি নিজেকে কি অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ ? সে উত্তর দিল, আমার অবস্থা এই যে, আমি আল্লাহ্র রহমতের আশাও করছি, আবার আমার গুনাহ্র কারণে আযাবের ভয়ও করছি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অবস্থা শুনে বললেন ঃ আশা ও ভয়ের এদু'টি অবস্থা এমন মুহূর্তে যার অন্তরে বিদ্যমান থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অবশ্যই তার আশার বস্তুটি দিয়ে দেবেন এবং তার আশংকার বস্তু থেকে তাকে নিরাপদ রাখবেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ভীতি এবং তাঁর আযাব ও পাকড়াওকে ভয় করাই মুক্তির চাবিকাঠি।

যার অন্তরে কোন ক্ষেত্রে আল্লাহ্র ভয় সৃষ্টি হয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে

(١٢) عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ جَلَّ ذِكْرُهُ اَخْرِجُوْا مِنَ النَّارِ مَنْ ذَكَرَنِىْ يَوْمًا اَوْ خَافَنِىْ فِىْ مَقَامٍ – (رواه الترمذى والبيهقى فى كتاب البعث والنشور)

১২। হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্ তা'আলা (জাহান্নামের দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশ্তাদেরকে) নির্দেশ দেবেন, আমার যে বান্দা কোন দিন আমাকে স্মরণ করেছে অথবা কোন স্থানে আমাকে ভয় করেছে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস। —তিরমিযী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ ইতঃপূর্বে কিতাবুল ঈমানে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে এবং একথাটি কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, যে ব্যক্তি কুফর অথবা শিরকের অবস্থায় এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবে, সে চিরকাল জাহান্নামেই থাকবে এবং তার কোন আমলই তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনতে পারবে না। তাই হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ হাদীসটির মর্ম এই হবে, যে ব্যক্তি দুনিয়া থেকে এ অবস্থায় বিদায় নিয়েছে যে, সে কাফের অথবা মুশরিক ছিল না; বরং ঈমান তার মধ্যে ছিল, কিন্তু তার গুনাহ্ ছিল অনেক এবং নেক আমলের সঞ্চয় তার সাথে ছিল না। তবে সে কখনো আল্লাহ্র কথা স্মরণ করেছিল অথবা কোন ক্ষেত্রে তার অন্তরে আল্লাহ্র ভয়ের কিছুটা ভাব জাগ্রত হয়েছিল। কেয়ামতের দিন তার পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য তাকে জাহান্নামে তো নিক্ষেপ করা হবে; কিন্তু কোন দিন আল্লাহ্কে স্মরণ করার কারণে এবং আল্লাহ্কে ভয় করার বরকতে সে মুক্তি পেয়েই যাবে এবং তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে।

আল্লাহ্র ভয়ে নির্গত অশ্রুর মূল্য

(١٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يَخْرُجُ مِنْ عَيْنَيْهِ دُمُوْعٌ وَ اِنْ كَانَ مِثْلَ رَأْسِ الذُّبَابِ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ثُمَّ يُصِيْبُ شَيْئًا مِنْ حَرِّ وَجْهِهِ اِلَّا حَرَّمَهُ اللّٰهُ عَلَى النَّارِ – (رواه ابن ماجة)

১৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র ভয়ে যে মু'মিন বান্দার চোখ থেকে অশ্রু নির্গত হয়, সেটা যদি মাছির মাথার সমানও হয়, (অর্থাৎ, এক ফোঁটা পরিমাণও হয়) তারপর সেই অশ্রু গড়িয়ে তার

চেহারায় পৌঁছে যায়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এ চেহারাকে জাহান্নামের আগুনের জন্য হারাম করে দেবেন। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, যে চেহারা আল্লাহ্র ভয়ে নির্গত অশ্রু দ্বারা কখনো সিক্ত হয়েছে, সেই চেহারাকে জাহান্নামের আগুন থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ রাখা হবে এবং জাহান্নামের আঁচ এতে লাগতে পারবে না।

"কিতাবুল ঈমানে" বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, যেসব হাদীসের মধ্যে কোন বিশেষ নেক আমলের উপর জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যাওয়ার সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে, সেগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য সাধারণতঃ এই হয়ে থাকে যে, এ নেক আমলের নিজস্ব প্রভাব ও দাবী এটাই এবং আল্লাহ্ তা'আলা এর আমলকারীকে জাহান্নামের আগুন থেকে সম্পূর্ণ হেফাযতে রাখবেন। কিন্তু শর্ত এই যে, তার পক্ষ থেকে এমন কোন বড় গুনাহ্ সংঘটিত না হওয়া, যার কারণে এর বিপরীত দাবী অর্থাৎ, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার দাবী সৃষ্টি হয়ে যায়। অথবা এমন কোন গুনাহ্ হয়ে থাকলেও সে যদি তওবা করে নেয় এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দিয়ে থাকেন। একথা কেউ যেন মনে না করে যে, এটা মনগড়া ব্যাখ্যা। কেননা, বাস্তবতাকে সামনে রেখেই বলতে হয় যে, আমাদের দৈনন্দিন কথা-বার্তা এবং বাকরীতিতেও এ ধরনের সুসংবাদ ও প্রতিশ্রুতির বেলায় এ শর্ত সর্বদাই আরোপিত থাকে।

আল্লাহ্র ভয়ে শরীরে শিহরণ সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার সৌভাগ্য

(١٤) عَنِ الْعَبَّاسِ رَفَعَهُ اِذَا اقْشَعَرَّ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللهِ تَحَاتَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ كَمَا تَحَاتُّ عَنِ الشَّجَرَةِ الْبَالِيَةِ وَرَقُهَا - (رواه البزار)

১৪। হযরত আব্বাস (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ে যখন কোন বান্দার লোম কাঁটা দিয়ে উঠে, তখন তার গুনাহ্ এভাবে ঝরে পড়ে, যেভাবে শুকনো গাছের পাতাগুলো ঝরে পড়ে। —মুসনাদে বায্যার

ব্যাখ্যা ঃ ভয়-ভীতি ও আতংক আসলে মানুষের অন্তরের অবস্থার নাম। কিন্তু মানুষকে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তার অন্তরের অবস্থার প্রকাশ দেহের উপরও হয়ে যায়। যেমন, যখন মানুষের অন্তরে খুশী ও আনন্দের অবস্থা থাকে, তখন চেহারার উপরও আনন্দ-চিত্ততা ফুটে উঠে এবং অনেক সময় সে এ ভাবের কারণে হাসে। অনুরূপভাবে যখন মানুষের অন্তরে দুঃখ ও বেদনা থাকে, তখন এটাও তার চেহারা থেকে প্রকাশ পায় এবং কখনো কখনো সে এর প্রভাবে কাঁদে। এমনকি তার চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে।

এমনিভাবে মানুষের অন্তরে যখন ভয়-ভীতি ও আতংকের অবস্থা সৃষ্টি হয়, তখন তার দেহে এর এ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যে, তার সারা দেহের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণিত পূর্বের হাদীসটিতে ঈমানদারদেরকে এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র ভয়ে যাদের চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে, তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম। আর হযরত আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীসে এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র ভয়ে যার শরীরের লোম কাঁটা দিয়ে উঠে, তার শরীর থেকে তার গুনাহ্ এভাবে ঝরে পড়ে, যেভাবে শীতের শেষ ভাগে শুকনো গাছের পাতা ঝরে পড়ে।

আল্লাহ্র ভয়ে এক বান্দা চরম মূর্খের মত কাজ করেও ক্ষমা পেয়ে গেল

(١٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْرَفَ رَجُلٌ عَلٰى نَفْسِهٖ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ اَوْصٰى بَنِيْهِ اِذَا مَاتَ فَحَرِّقُوْهُ ثُمَّ اذْرُوْا نِصْفَهٗ فِى الْبَرِّ وَنِصْفَهٗ فِى الْبَحْرِ فَوَاللّٰهِ لَئِنْ قَدَرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِيْنَ فَلَمَّا مَاتَ فَعَلُوْا مَا اَمَرَهُمْ فَاَمَرَ اللّٰهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ وَاَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيْهِ ثُمَّ قَالَ لَهٗ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ يَا رَبِّ وَاَنْتَ اَعْلَمُ فَغَفَرَ لَهٗ * (رواه البخارى ومسلم)

১৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি নিজের উপর বড়ই জুলুম করেছিল। (অর্থাৎ, উদাসীনতার কারণে আল্লাহ্র অবাধ্যতায় জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল।) যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হল, তখন (আল্লাহ্র ভয় ও আখেরাতের পরিণাম চিন্তায়) সে তার ছেলেদেরকে বলল ঃ আমি যখন মারা যাব, তখন তোমরা আমাকে আগুনে জ্বালিয়ে ছাই করে ফেলবে। তারপর এ ছাইয়ের অর্ধেক অংশ স্থল ভাগে এবং বাকী অর্ধেক অংশ সমুদ্রে ছিটিয়ে দেবে। আল্লাহ্র কসম! তিনি যদি আমাকে পাকড়াও করে নিতে পারেন, তাহলে আমাকে এমন শাস্তি দেবেন, যা তাঁর কোন সৃষ্ট জীবকেই দেবেন না। তারপর সে যখন মারা গেল, তখন তার ছেলেরা সেই ওসিয়্যত অনুযায়ীই কাজ করল। (অর্থাৎ, আগুনে পুড়িয়ে তার ছাইভস্ম কিছুটা বাতাসে আর কিছুটা সমুদ্রে ছিটিয়ে দিল।) তারপর আল্লাহ্র নির্দেশে সমুদ্র এবং স্থলভাগ থেকে তার দেহের অংশগুলো একত্রিত করা হল (এবং তাকে পুনর্জীবন দান করা হল।) এবার আল্লাহ্ তা'আলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমনটি করলে কেন ? সে উত্তর দিল, হে আমার রব! তুমি তো ভালভাবেই জান যে, আমি তোমার ভয়েই এমন কাজ করেছি। আল্লাহ তা'আলা তখন তাকে ক্ষমা করে দিলেন।
—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বযুগের যে ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন, এ লোকটি আল্লাহ্ তা'আলার শান ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কেও অজ্ঞ ছিল এবং তার আমলও ভাল ছিল না। কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে তার উপর আল্লাহ্র ভয় এমন প্রবল হয়ে উঠল যে, সে নিজের সন্তানদেরকে এমন মূর্খতাপ্রসূত ওসিয়্যত করে গেল। সে মনে করেছিল যে, আমার দেহের ছাইভস্ম এভাবে জলে-স্থলে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পর আমার পুনরায় জীবিত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই থাকবে না। তবে এ মূর্খতাপ্রসূত ভুলের কারণ যেহেতু ছিল আল্লাহ্র ভয় এবং তাঁর আযাবের আশংকা, তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ক্ষমা করে দিলেন।

হাদীসের এ বাক্যটি নিয়ে "আল্লাহ্ যদি আমাকে পাকড়াও করে নিতে পারেন," হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ অনেক সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এ অধম সংকলকের মতে সোজা কথা হচ্ছে এই যে, এটা ছিল আল্লাহ্র ভয়ে চরমভাবে ভীত এক মূর্খ মানুষের মুখের কথা। তার পক্ষে এর চাইতে সুন্দর উপস্থাপনা সম্ভবই ছিল না।

আল্লাহ্‌র ভয় এবং তাক্‌ওয়াই হচ্ছে মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি

(١٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اِنَّكَ لَسْتَ بِخَيْرٍ مِنْ اَحْمَرَ وَلَا اَسْوَدَ اِلَّا اَنْ تَفْضُلَهُ بِتَقْوٰى- (رواه احمد)

১৬। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ কোন কালো অথবা সাদা মানুষের তুলনায় তোমার কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তবে তাক্‌ওয়া এবং খোদাভীরুতার ভিত্তিতে তুমি কারো চাইতে বেশী মর্যাদার অধিকারী হতে পার। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, ধন-সম্পদ, গঠন-আকৃতি, বংশ-বর্ণ এবং ভাষা ও দেশ ইত্যাদি কোন বস্তুর দ্বারা কারো উপর অন্য কারোর মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয় না। মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে কেবল তাক্‌ওয়া, (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র ভয় এবং এর ভিত্তিতে যে জীবন গড়ে উঠে।) তাই এ তাক্‌ওয়ায় যে যতটুকু অগ্রগামী হবে, সে আল্লাহ্‌র কাছেও ততটুকু উচ্চ মর্যাদা লাভ করবে। এ বাস্তব কথাটিই কুরআন মজীদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ নিশ্চয়ই, আল্লাহ্‌র কাছে সে-ই সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী, যে তোমাদের মধ্যে সবচাইতে খোদাভীরু।

(١٧) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْصِيْهِ وَمُعَاذٌ رَاكِبٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِىْ تَحْتَ رَاحِلَتِهِ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا مُعَاذُ اِنَّكَ عَسٰى اَنْ لَا تَلْقَانِىْ بَعْدَ عَامِىْ هٰذَا وَلَعَلَّكَ اَنْ تَمُرَّ بِمَسْجِدِىْ هٰذَا وَقَبْرِىْ فَبَكٰى مُعَاذٌ جَشَعًا لِفِرَاقِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَاَقْبَلَ بِوَجْهِهٖ نَحْوَ الْمَدِيْنَةِ فَقَالَ اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ بِىَ الْمُتَّقُوْنَ مَنْ كَانُوْا وَحَيْثُ كَانُوْا * (رواه احمد)

১৭। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামনের (বিচারক অথবা শাসনকর্তা নিয়োগ করে) পাঠালেন, তখন (তাকে বিদায় দেওয়ার জন্য) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও কিছু উপদেশ দিতে দিতে তার সাথে চললেন। সে সময় হযরত মো'আয (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে) সওয়ারীর উপর আরোহী ছিলেন, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মো'আযের সওয়ারীর সাথে হেঁটে যাচ্ছিলেন। তিনি যখন প্রয়োজনীয় উপদেশাবলী দিয়ে শেষ করলেন, তখন শেষ কথাটি এই বললেন ঃ হে মো'আয! হয়তো বা এ বছরের পর তুমি আর আমার সাক্ষাত পাবে না। (এ কথা দ্বারা তিনি ইঙ্গিত করে দিলেন যে, আমার জীবনের এটাই হচ্ছে শেষ বছর, অচিরেই আমি এ জগত ছেড়ে অন্য এক জগতে পাড়ি জমাব। তারপর তিনি বললেন,) হয়তো এমন হবে যে, (তুমি ইয়ামন থেকে ফিরে এসে আমার অবর্তমানে মদীনায়) আমার এ মসজিদ ও আমার কবরের পাশ দিয়ে যাবে। একথা শুনে হযরত মো'আয রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরহ-ব্যথায় কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থা দেখে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং

মদীনার দিকে মুখ করে বললেন ঃ আমার সবচেয়ে আপনজন ও ঘনিষ্ঠতর লোক হচ্ছে তারা, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে চলে (এবং তাক্ওয়ার জীবন অবলম্বন করে,) তারা যেই হোক এবং যেখানেই থাকুক। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যের শেষ কথাটির অর্থ এই যে, আসল জিনিস হচ্ছে আত্মিক সম্পর্ক ও ঘনিষ্ঠতা, আর আমার সাথে এ সম্পর্কের ভিত্তি হচ্ছে তাক্ওয়া। তাই আল্লাহ্র কোন বান্দা যদি দৈহিকভাবে আমার নিকট থেকে অনেক দূরে ইয়ামনে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন অঞ্চলেও থাকে, আর তার অন্তরে তাক্ওয়া ও আল্লাহ্র ভয় অর্জিত হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে আমার নিকটবর্তী এবং সে যেন আমার সাথেই আছে। এর বিপরীত কোন ব্যক্তি যদি বাহ্যিক ও দৈহিকভাবে আমার সাথেও থাকে; কিন্তু তার অন্তর যদি তাক্ওয়াশূন্য হয়, তাহলে এ বাহ্যিক সান্নিধ্য সত্ত্বেও সে আমার নিকট থেকে অনেক দূরে এবং আমিও তার থেকে অনেক দূরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বক্তব্য দ্বারা হযরত মো'আযকে সান্ত্বনা দিলেন যে, এ বাহ্যিক বিচ্ছেদের কারণে মনে দুঃখ নিয়ো না। যেহেতু তোমার অন্তরে আল্লাহ্র ভয় ও তাক্ওয়া রয়েছে, তাই ইয়ামনে থেকেও তুমি আমার নিকট থেকে দূরে থাকবে না। তাছাড়া দুনিয়ার এ জীবন তো কেবল কয়েক দিনের। চিরকাল থাকার আবাস তো হচ্ছে আখেরাত, আর সেখানে তাক্ওয়ার অধিকারী বান্দারা অনন্তকাল পর্যন্ত আমার সাথে এবং আমার সান্নিধ্যে থাকবে। আর সেই মিলন ও সান্নিধ্যের পর কোন ধরনের বিরহ-বিচ্ছেদের আশংকা থাকবে না।

এ শেষ কথাটি বলার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে হযরত মো'আযের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মদীনামুখী হয়ে গিয়েছিলেন, এর কারণ সম্ভবতঃ এই হবে যে, হযরত মো'আযের কান্না দেখে তাঁর চোখও অশ্রুসজল হয়ে গিয়েছিল। তাই তিনি চাইলেন যে, মো'আয যেন তাঁর অশ্রুপাত দেখতে না পায়। এর কারণ এটাও হতে পারে যে, তিনি তাঁর এক খাঁটি প্রেমিকের কান্না দেখে নিজের অন্তরে ব্যথা অনুভব করছিলেন। তাই তিনি এটা সইতে না পেরে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ভালবাসা ও ভক্তির জগতে এ বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক।

আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, হযরত মো'আযকে বিদায় দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তো হুকুম দিয়ে সওয়ারীর উপর আরোহণ করিয়ে দিলেন, কিন্তু নিজে কথা বলতে বলতে পায়ে হেঁটে চললেন। এতে ঐসব লোকদের জন্য কত বড় শিক্ষা ও আদর্শ রয়েছে, যাদেরকে দ্বীনী ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরসুরী ও নায়েব মনে করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের অন্তরে তাঁর ভয় ও তাক্ওয়া দান করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আত্মিক নৈকট্য এবং আখেরাতে তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ দান করুন, যার সুসংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে দিয়েছেন।

আল্লাহ্র ভয় ও পরকাল-চিন্তার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা

নিম্নে এমন কিছু হাদীসের উল্লেখ করা হচ্ছে, যেগুলোর দ্বারা জানা যাবে যে, আল্লাহ্র ভয়

ও আখেরাতের চিন্তার বেলায় স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা কি ছিল এবং তাদের জীবনে এর কি প্রভাব পড়েছিল।

(١٨) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُدْخِلُ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ وَلَا يُجِيْرُهُ مِنَ النَّارِ وَلَا اَنَا اِلَّا بِرَحْمَةِ اللّٰهِ * (رواه مسلم)

১৮। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো আমল তাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারবে না। আর আমার অবস্থাও তাই। তবে যদি আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ হয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথাটি যে, আমিও নিজের আমল ও এবাদত দ্বারা নয়; বরং কেবল আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহেই জান্নাতে যেতে পারব, তাঁর অন্তরের খোদাভীতির অবস্থা অনুধাবন করার জন্য যথেষ্ট।

(١٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّمَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاِذَا تَخَيَّلَتِ السَّمَاءُ تَغَيَّرَ لَوْنُهٗ وَخَرَجَ وَدَخَلَ وَاَقْبَلَ وَاَدْبَرَ فَاِذَا مُطِرَتْ سُرِّيَ عَنْهُ فَعَرَفَتْ ذٰلِكَ عَائِشَةُ فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ لَعَلَّهٗ يَا عَائِشَةُ كَمَا قَالَ قَوْمُ عَادٍ "فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اَوْدِيَتِهِمْ قَالُوْا هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا" * (رواه البخارى ومسلم)

১৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা এই ছিল যে, যখন দ্রুতবেগে বাতাস বইত, তখন তিনি দো'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এ বাতাসের কল্যাণ, এ বাতাসে যা রয়েছে এর কল্যাণ এবং যে উদ্দেশ্যে এ বাতাস পাঠানো হয়েছে এর কল্যাণ। আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এ বাতাসের অকল্যাণ থেকে, এতে যা রয়েছে এর অকল্যাণ থেকে এবং যে উদ্দেশ্যে এটা পাঠানো হয়েছে এর অকল্যাণ থেকে। আর আকাশে যখন মেঘমালা দেখা দিত, তখন তাঁর চেহারার রঙ পরিবর্তন হয়ে যেত এবং (অস্থিরতার দরুন এ অবস্থা হত যে, তিনি) কখনো বাইরে যেতেন, কখনো ভিতরে আসতেন, কখনো সামনের দিকে যেতেন এবং কখনো পেছনের দিকে যেতেন। তারপর যখন বৃষ্টি হয়ে যেত (স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত) তখন এ অস্থিরতা দূর হয়ে যেত।

হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর এ অবস্থা টের পেয়ে গেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, (এ দ্রুত বাতাস ও মেঘ দেখে আপনার এ অবস্থা হয় কেন?) তিনি তখন উত্তর দিলেন ঃ আয়েশা! (আমার আশংকা হয় যে,) এ মেঘ ও বাতাস ঐ ধরনের হয় কিনা, যা (হযরত হূদ আলাইহিস-সালামের সম্প্রদায়) আদ জাতির প্রতি পাঠানো হয়েছিল। (যার উল্লেখ কুরআন মজীদে এভাবে করা হয়েছে ঃ) তারা যখন মেঘমালাকে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখল, তখন বলল, এতো

মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে। (অথচ এটা বৃষ্টি বহনকারী মেঘ ছিল না; বরং এটা ছিল প্রবল ঝঞ্ঝা বায়ু যা তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য পাঠানো হয়েছিল।) —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীসটির শিক্ষা ও উদ্দেশ্য কেবল এই, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় এত প্রবল ছিল যে, একটু দ্রুত বেগে বাতাস বইতে শুরু করলে তিনি অস্থির হয়ে গিয়ে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এর কল্যাণ লাভ ও অকল্যাণ থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দো'আ করতেন। তদ্রূপভাবে আকাশে যখন মেঘ দেখা দিত, তখন আল্লাহ্র ভয়ে তাঁর এ অবস্থা হয়ে যেত যে, কখনো ভিতরে আসতেন, কখনো বাইরে ছুটে যেতেন, কখনো সামনে অগ্রসর হতেন আবার কখনো পিছু হটতেন। তাঁর এ অবস্থা ঐ ভয় ও আতংকের কারণে হত যে, মেঘের আকৃতিতে এটা কি ঐ রকম আযাব হয়ে যায় কিনা, যেমন হযরত হুদ (আঃ)-এর অবাধ্য সম্প্রদায় আদ জাতির উপর মেঘের আকৃতিতেই আযাব পাঠানো হয়েছিল। তারা তাদের অঞ্চলের দিকে মেঘমালা আসতে দেখে নিজেদের অজ্ঞতা বশতঃ খুবই খুশী হয়েছিল এবং এটাকে শান্তির মেঘ মনে করেছিল। অথচ সেটা ছিল আল্লাহ্র আযাবের ঝঞ্ঝা বায়ু। হাদীসে আয়াতের যে অংশটুকু উল্লেখ করা হয়েছে, এটা অসম্পূর্ণ। কেননা, আয়াতের শেষাংশে এ কথাটিও রয়েছে; "বরং এটা ঐ বস্তু, যা তোমরা দ্রুত কামনা করেছিলে। এটা ঝঞ্ঝাবায়ু, এতে রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি।"

(٢٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ اَبُوْبَكْرٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ شِبْتَ قَالَ شَيَّبَتْنِيْ هُوْدٌ وَالْوَاقِعَةُ وَالْمُرْسَلٰتُ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ وَاِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ * (رواه الترمذى)

২০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আবু বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উপর তো বার্ধক্য এসে গিয়েছে। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সূরা হূদ, সূরা ওয়াক্বি'আহ্, সূরা মুরসালাত, সূরা 'আম্মা ইয়াতাসা-আলূন (নাবা) ও সূরা ইযাশ্ শামসু কুব্বিরাত (তাকভীর) আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বাস্থ্য, দৈহিক শক্তি এবং মন-মেযাজ ইত্যাদির বিবেচনায় তাঁর উপর বার্ধক্যের প্রভাব খুব দেরীতে প্রকাশ পাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যখন বার্ধক্যের প্রভাব স্বাভাবিক সময়ের পূর্বেই প্রকাশ পেতে লাগল, তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) একদিন নিবেদন করলেন যে, হুযূর! আপনার উপর তো এখনই বার্ধক্য আসতে শুরু করেছে! তিনি উত্তর দিলেন যে, কুরআন মজীদের এ সূরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।

কুরআনের এ সূরাগুলোতে কেয়ামত, আখেরাত এবং অপরাধীদের উপর আল্লাহ্র ভয়াল আযাবের বর্ণনা রয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সূরাসমূহের বিষয়বস্তু দ্বারা এমন প্রভাবান্বিত হয়ে যেতেন এবং এগুলোর তেলাওয়াত দ্বারা তাঁর উপর আল্লাহ্র ভয় এবং আখেরাতের চিন্তার এমন প্রাবল্য দেখা যেত যে, এর প্রভাব তাঁর স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তির উপরও পড়ে যেত। বাস্তবিক পক্ষেও ভয় এবং চিন্তা এ দু'টি এমন জিনিস, এগুলো যুবকদেরকে তাড়াতাড়ি বুড়ো বানিয়ে দেয়। এ জন্যই কেয়ামত প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, কেয়ামতের দিনটি বালকদেরকে বৃদ্ধে পরিণত করবে। এ হাদীস দ্বারা অনুমান করা যেতে

পারে যে, আল্লাহ্‌র ভয় এবং আখেরাতের চিন্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তরের অবস্থা কী ছিল ?

(٢١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالاً هِيَ اَدَقُّ فِيْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ يَعْنِي الْمُهْلِكَاتِ * (رواه البخاري)

২১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর যুগের লোকদেরকে বলেন ঃ তোমরা এমন অনেক কাজ কর, যেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুলের চাইতেও অনেক সরু ও হাল্কা। অথচ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এগুলোকে ধ্বংসকারী বিষয় মনে করতাম। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে মুসলমানদের উপর অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর আল্লাহ্‌র ভয় এমন প্রবল ছিল এবং তাঁরা আখেরাতের হিসাব-নিকাশ ও এর পরিণতি সম্পর্কে এমন ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন যে, অনেক ঐ ধরনের কাজ, যেগুলোকে তোমরা খুবই মামুলী মনে কর এবং নির্দ্বিধায় করতে থাক, তাঁরা এগুলোকে ধ্বংসকারী মনে করতেন এবং এগুলো থেকে বাঁচার জন্য এমন চেষ্টা-সাধনা করতেন, যেমন বিধ্বংসী জিনিসসমূহ থেকে বাঁচার জন্য করা হয়ে থাকে।

(٢٢) عَنِ النَّضْرِ قَالَ كَانَتْ ظُلْمَةٌ عَلٰى عَهْدِ اَنَسٍ فَاَتَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا حَمْزَةَ هَلْ كَانَ هٰذَا يُصِيْبُكُمْ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنْ كَانَتِ الرِّيْحُ لَتَشْتَدُّ فَنُبَادِرُ اِلَى الْمَسْجِدِ مَخَافَةَ اَنْ تَكُوْنَ الْقِيَامَةُ * (رواه ابوداؤد)

২২। বিখ্যাত তাবেয়ী নয্‌র থেকে বর্ণিত যে, হযরত আনাস (রাঃ)-এর যুগে একবার ধূলি-ঝঞ্ঝা দেখা দিল। আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবূ হামযা! এমন ধূলি-ঝঞ্ঝা ও কালোমেঘ কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেও আপনাদের উপর আসত ? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র পানাহ। তখন তো অবস্থা এই ছিল যে, একটু দ্রুত বাতাস বইতে শুরু করলেই আমরা কেয়ামতের ভয়ে মসজিদের দিকে ছুটে যেতাম। —আবূ দাঊদ

(٢٣) عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاُسَيْدِيِّ قَالَ لَقِيَنِيْ اَبُوْبَكْرٍ فَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ ؟ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ ؟ قُلْتُ نَكُوْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَاَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهٖ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ وَنَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ اَبُوْبَكْرٍ فَوَاللّٰهِ اِنَّا لَنَلْقٰى مِثْلَ ذٰلِكَ فَانْطَلَقْتُ اَنَا وَاَبُوْبَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قُلْتُ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَاَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ فَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْاَوْلَادُ وَالضَّيْعَاتُ وَنَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلٰئِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَفِيْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلٰثَ مَرَّاتٍ * (رواه مسلم)

২৩। হযরত হান্‌যালা ইবনে রবী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন আবূ বকর (রাঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাত হল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হান্‌যালা! কেমন আছ ? আমি উত্তরে বললাম, হান্‌যালা তো মুনাফেক হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ্! তুমি একি বলছ ? আমি বললাম, ঘটনা হচ্ছে এই যে, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত থাকি এবং তিনি আমাদেরকে জাহান্নাম ও জান্নাতের আলোচনা করে উপদেশ দেন, তখন আমাদের এ অবস্থা হয় যে, আমরা যেন জান্নাত ও জাহান্নামকে চোখে দেখছি। তারপর যখন আমরা তাঁর মজলিস থেকে বের হয়ে বাড়ীতে ফিরে আসি, তখন স্ত্রী, সন্তান, ঘর-সংসার ও ক্ষেত-খামারের কাজ আমাদেরকে ব্যস্ত করে ফেলে এবং আমরা এর অনেক কিছুই ভুলে যাই। এ কথা শুনে আবূ বকর বললেন ঃ এ ধরনের অবস্থা তো আমাদেরও হয়ে থাকে। তারপর আমি ও আবূ বকর দু'জনই রওয়ানা হয়ে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলাম। আমি (নিজের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে) নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হান্‌যালা তো মুনাফেক হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন ঃ এ কেমন কথা ? আমি আরয করলাম, আমরা যখন আপনার নিকট থাকি এবং আপনি জাহান্নাম ও জান্নাতের আলোচনা করে আমাদেরকে উপদেশ দেন, তখন তো আমাদের অবস্থা এই থাকে যে, আমরা যেন জান্নাত ও জাহান্নাম নিজ চোখে দেখছি। তারপর যখন আপনার মজলিস থেকে উঠে বাড়ীতে আসি, তখন স্ত্রী-সন্তান, বাড়ী-ঘর ও ক্ষেত-খামারের কাজ আমাদেরকে ব্যস্ত করে ফেলে এবং আমরা অনেক কিছুই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন ঃ ঐ সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমাদের অবস্থা যদি সর্বদা তাই থাকত, যা আমার এখানে অবস্থানের সময় হয়ে থাকে এবং তোমরা যদি সব সময় যিকিরে লেগে থাক, তাহলে ফেরেশ্‌তারা তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের চলার পথে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতে আসত। কিন্তু হে হান্‌যালা! মনে রেখো, এ অবস্থা কখনো কখনো হওয়াই যথেষ্ট। এ কথাটি তিনি তিন বার বললেন। —মুসলিম

ফায়দা ঃ হযরত হান্‌যালার এ রেওয়ায়াত দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে আখেরাতের এবং দ্বীনের চিন্তা কি পর্যায়ের ছিল যে, তারা নিজেদের অবস্থার মধ্যে সামান্য পরিবর্তন ও অবনতি দেখে নিজেদের উপর মুনাফেকীর সন্দেহ করে বসতেন।

(٢٤) عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ لِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ هَلْ تَدْرِيْ مَا قَالَ اَبِيْ لِاَبِيْكَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَاِنَّ اَبِيْ قَالَ لِاَبِيْكَ يَا اَبَا مُوْسٰى هَلْ يَسُرُّكَ اَنَّ اِسْلَامَنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِجْرَتَنَا وَجِهَادَنَا مَعَهٗ وَعَمَلَنَا كُلَّهٗ مَعَهٗ بَرَدَلَنَا وَاَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَا بَعْدَهٗ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ اَبُوْكَ لِاَبِيْ لَا وَاللّٰهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّيْنَا

وَصُمْنَا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيْرًا وَاَسْلَمَ عَلٰى اَيْدِيْنَا بَشَرٌ كَثِيْرٌ وَاِنَّا لَنَرْجُوْ ذَاكَ قَالَ اَبِىْ لٰكِنِّىْ اَنَا وَالَّذِىْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهٖ لَوَدِدْتُّ اَنَّ ذٰلِكَ بَرَدَ لَنَا وَاَنَّ كُلَّ شَىْءٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهٗ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ، فَقُلْتُ اِنَّ اَبَاكَ وَاللّٰهِ كَانَ خَيْرًا مِنْ اَبِىْ * (رواه البخارى)

২৪। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)-এর পুত্র আবূ বুরদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাকে আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর একদিন বললেন, তোমার কি জানা আছে যে, আমার পিতা তোমার পিতাকে কি কথা বলেছিলেন ? আমি বললাম, না, আমার জানা নেই। তিনি বললেন, আমার পিতা তোমার পিতাকে বলেছিলেন, হে আবূ মূসা! তুমি কি এতে খুশী আছ যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং তাঁর হাতে আমাদের ইসলাম গ্রহণ, তাঁর সাথে আমাদের হিজরত ও জেহাদ এবং অন্য যেসব আমল আমরা তাঁর সাথে করেছি, এগুলো আমাদের জন্য সংরক্ষিত থাকুক (এবং এসবের বিনিময় ও পুণ্য আমরা পেয়ে যাই,) আর আমরা যেসব আমল তাঁর (ওফাতের) পরে করেছি, সেগুলো থেকে সমান সমান নিষ্কৃতি পেয়ে যাই। (অর্থাৎ, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আমরা ভাল অথবা মন্দ যেসব কাজ করেছি, এগুলোর উপর আমাদেরকে কোন সওয়াবও প্রদান না করা হোক এবং শাস্তিও না দেওয়া হোক।) আমার পিতার এ কথা শুনে তোমার পিতা বলেছিলেন, না, আল্লাহ্র কসম! আমি তো এটা চাই না, (আমি এতে রাজী না।) আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে জেহাদ করেছি, নামায পড়েছি, রোযা রেখেছি এবং অন্যান্য অনেক নেক আমল করেছি। আমাদের হাতে বিপুল সংখ্যক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তাই আমি আল্লাহ্র কাছে এসকল কাজের প্রতিদান আশা করি। (এ জন্য আমি আপনার সাথে একমত নই।)

এ উত্তর শুনে আমার পিতা (হযরত ওমর) বললেন, ঐ মহান সত্তার শপথ, যার হাতে আমার জীবন! আমি তো আন্তরিকভাবে কামনা করি যে, আমাদের ঐসব আমল (যা আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে করেছি সেগুলো) আমাদের জন্য স্থায়ী ও সংরক্ষিত থাকুক, আমরা এগুলোর বিনিময় পেয়ে যাই। আর যেসব আমল আমরা তাঁর পরে করেছি, সেগুলো থেকে কোন রকমে নিষ্কৃতি পেয়ে যাই। আবূ বুরদা বলেন, আমি আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমরকে বললাম, তোমার পিতা (ওমর) আমার পিতা (আবূ মূসা) থেকে অনেক উত্তম ছিলেন। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ যেভাবে আল্লাহ্র কোন পুণ্যবান ও প্রিয় বান্দার পেছনে আদায়কৃত নামাযের গ্রহণযোগ্যতার প্রবল আশা করা যায়, ঠিক তদ্রূপভাবে হযরত ওমর (রাঃ) চরম বিশ্বাসের সাথে এ আশা পোষণ করতেন যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যেসব নেক আমল নামায, রোযা, হিজরত, জেহাদ ইত্যাদি আমরা করেছি, সেগুলো তো হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের বরকতে অবশ্যই কবূল হবে। কিন্তু যেসব আমল তাঁর তিরোধানের পর করা হয়েছে, সেগুলোতে যেহেতু এ বৈশিষ্ট্য নেই; বরং এগুলো কেবল নিজেদের কৃত আমল, তাই হযরত ওমর (রাঃ) সাধারণ তত্ত্বজ্ঞানীদের মত এগুলোর পরিণতি সম্পর্কে মনে আশংকা পোষণ করতেন। তিনি এতেই নিজের নিরাপত্তা ও সফলতা মনে

করতেন যে, পরবর্তীকালে কৃত আমলসমূহ দ্বারা যদি কোন রকমে দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, অর্থাৎ, এগুলোর জন্য যদি শাস্তি না হয় এবং প্রতিদানও না পাওয়া যায়, তাহলে এটাই যথেষ্ট। জনৈক কবি বলেন ঃ আমাদের ক্রুটিপূর্ণ এবাদত আমাদের ক্ষমার কারণ হতে পারবে বলে তা মনে হয় না। তবে এটা যদি গুনাহ্র পাল্লা ভারী না করে দেয়, তাহলেই আমরা খুশী।

হাদীসটির শেষে আবূ বুরদা যে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমরকে বলেছেন যে, আল্লাহ্র কসম! আমার পিতার চেয়ে তোমার পিতা অনেক ভাল ছিলেন, বাহ্যতঃ এর দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য এ ছিল যে, হযরত ওমর যেহেতু শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই নিজের আমলের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন থাকতেন এবং তাঁর মধ্যে আল্লাহ্র ভয়ের প্রভাব এত বেশী ছিল।

বুখারী শরীফেই হযরত ওমর (রাঃ)-এর শাহাদতের ঘটনার এক বর্ণনায় তাঁর এ উক্তিটিও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ আল্লাহ্র কসম! আমার কাছে যদি পৃথিবী ভরা সোনা থাকত, তাহলে আল্লাহ্র আযাব দেখার পূর্বেই এর সবটুকু মুক্তিপণের মত দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করতাম।

আল্লাহু আকবার। এ হচ্ছে আল্লাহ্র ঐ বান্দার খোদাভীতির অবস্থা, যিনি বহুবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে নিজের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ শুনেছেন। জনৈক জ্ঞানী সত্যই বলেছেন ঃ "নৈকট্যশীলদের উদ্বেগ থাকে বেশী।"

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকেও এ খোদাভীতির কিছু অংশ নসীব করুন।

দুনিয়ার তুচ্ছতা ও এর নিন্দাবাদ

"রেকাক" সংক্রান্ত যেসব হাদীস সামনে আসবে, এগুলোতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ার অসারতা ও এর নিন্দাবাদ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে, আখেরাতের তুলনায় আল্লাহ্র নিকট এ দুনিয়া কত তুচ্ছ ও মূল্যহীন।

যেহেতু আমাদের এ যুগে দুনিয়ার সাথে মানুষের সম্পর্ক ও এর প্রতি তাদের আসক্তি সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে এবং নিছক পার্থিব ও বৈষয়িক উন্নতির ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে যে, সম্ভবতঃ ইতঃপূর্বে কখনো এটা এত গুরুত্ব লাভ করে নি। তাই বর্তমানে অবস্থা এই যে, দুনিয়ার তুচ্ছতা ও এর নিন্দাবাদের বিষয়টি অনেক মুসলমানের অন্তরেও সহজে আসতে চায় না; বরং অবস্থা এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে, অনেক এমন লোক, যাদেরকে মুসলমানদের পথপ্রদর্শক ও সংস্কারক মনে করা হয়, তারাও দুনিয়ার অসারতা ও এর স্থায়িত্বহীনতার আলোচনা শুনলে অবলীলায় মন্তব্য করে বসে যে, "এটা হচ্ছে বৈরাগ্যবাদ ও ভ্রান্ত তাসাওউফের প্রচার।" তারপর যখন তাদের সামনে এ প্রসঙ্গের হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হয়, তখন হাদীস অস্বীকারকারীদের মত তারাও এসব হাদীসের ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করতে শুরু করে। এ জন্য এ প্রসঙ্গের হাদীসসমূহ সংকলন করার পূর্বে আমরা ভূমিকা হিসাবে ঈমানের স্বীকৃত বিষয়াদি এবং কুরআন মজীদের আলোকে এ বিষয়টির উপর কিছু মৌলিক আলোচনার প্রয়াস পাব। আর আল্লাহ্ই হচ্ছেন তওফীকদাতা।

দুনিয়া ও আখেরাত

(১) এই যে দুনিয়া যেখানে আমরা নিজেদের জীবন অতিবাহিত করছি, আর যেটা নিজেদের চোখ, কান ইত্যাদি অনুভূতি শক্তি দ্বারা অনুভব করছি, এটা যেমন এক বাস্তব সত্য,

তেমনিভাবে আখেরাত— যার সংবাদ আল্লাহ্র সকল নবীরাই দিয়েছেন সেটাও এক নিশ্চিত ও বাস্তব সত্য। আমরা যে দুনিয়ায় থাকাবস্থায় সেটা দেখতে পাচ্ছি না এবং অনুভব করতে পারছি না, এটা ঠিক তেমনই, যেমন মাতৃগর্ভে থাকাকালীন আমরা এ দুনিয়াকে দেখতে পাইনি এবং এর কোন কিছুই অনুভব করতে পারিনি। তারপর যেভাবে আমরা এখানে এসে দুনিয়াকে দেখে নিয়েছি এবং আসমান যমীনের ঐসব লক্ষ লক্ষ জিনিস আমাদের চোখের সামনে এসে গিয়েছে, যেগুলোর কল্পনাও আমরা মাতৃগর্ভে থাকার সময় করতে পারতাম না। ঠিক তেমনিভাবে মৃত্যুর পর আখেরাত জগতে গিয়ে আমরা জান্নাত ও জাহান্নাম এবং ঐ জগতের সকল বস্তু দেখে নিতে পারব, যেগুলোর সংবাদ আল্লাহ্র নবীগণ এবং আল্লাহ্র কিতাবসমূহ দিয়েছে। সারকথা, আমাদের এ দুনিয়া যেমন এক বাস্তব সত্য, তদ্রূপ মৃত্যুর পর আখেরাতও আসন্ন এক বাস্তব জগত। আমাদের এর উপর ঈমান রয়েছে এবং কুরআন-হাদীস ও যুক্তির আলোকে এ ব্যাপারে আমাদের পূর্ণ আস্থা ও দ্বিধাহীন বিশ্বাস রয়েছে।

(২) দুনিয়ার ব্যাপারে আমাদের বিশ্বাস যে, এটা এবং এর সমুদয় জিনিস অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল। কিন্তু আখেরাত এর ব্যতিক্রম। কেননা, আখেরাত অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। সেখানে পৌঁছার পর মানুষও চিরন্তন জীবনের অধিকারী হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে সেখানে আল্লাহ্র ভাগ্যবান ও পুণ্যবান বান্দাদেরকে যেসব নেয়ামত দান করা হবে, এগুলোর ধারাও চিরকাল অব্যাহত থাকবে, কখনো বন্ধ হবে না। এটাকেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে "এ দানের ধারাবাহিকতা কখনো ছিন্ন হওয়ার নয়।"

অনুরূপভাবে যেসব হতভাগাদের উপর— তাদের অবাধ্যতা, কুফর ও অহংকারের কারণে আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ পড়বে, তাদের দুঃখ-কষ্ট ও আযাবের ধারাও কখনো বন্ধ হবে না। যেমন, জাহান্নামীদের সম্পর্কে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বলা হয়েছে ঃ "তারা জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।" "তারা জাহান্নাম থেকে বের হয়ে আসতে পারবে না।" "জাহান্নামীদের মৃত্যুও আসবে না যে, মরে গিয়েও আযাব থেকে বেঁচে যাবে, আর তাদের শাস্তি হ্রাসও করা হবে না।"

আমরা আল্লাহ্র কিতাব ও নবীগণ কর্তৃক বর্ণিত এ বাস্তবতার উপরও বিশ্বাস রাখি যে, দুনিয়ার নেয়ামত ও আনন্দ-উপভোগের তুলনায় আখেরাতের আনন্দ ও নেয়ামতসমূহ অনেকগুণে উৎকৃষ্ট; বরং আখেরাতের সুখ ও নেয়ামতই প্রকৃত সুখ ও নেয়ামত। এর সাথে দুনিয়ার জিনিসের তুলনাই হয় না। তদ্রূপভাবে দুনিয়ার কোন কঠিনতর কষ্ট এবং বিরাট দুঃখেরও জাহান্নামের লঘুতর কোন শাস্তির সাথেও তুলনা হয় না।

একথা স্পষ্ট যে, এসব বিষয়ের দাবী এটাই হওয়া উচিত, মানুষের চিন্তা ও চেষ্টা-সাধনার কেন্দ্রবিন্দু হবে আখেরাত। দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক কেবল এতটুকুই থাকবে, যতটুকু না হলেই নয়।

(৩) কিন্তু মানুষের সাধারণ অবস্থা এই যে, দুনিয়া যেহেতু সর্বদা তাদের চোখের সামনে, আর আখেরাত সম্পূর্ণ অদৃশ্য ও চোখের অন্তরালে, এ জন্য এসব বাস্তবতায় বিশ্বাসী মানুষের উপরও অনেক সময় দুনিয়ার চিন্তা ও এর সন্ধান প্রবল হয়ে থাকে। এটা যেন মানুষের এক ধরনের সহজাত দুর্বলতা। এ ক্ষেত্রে তাদের অবস্থা ঐ ছোট্ট শিশুদের মত, যারা বাল্যকালে তাদের খেলাধুলা ও খেলার সামগ্রী নিয়েই ব্যস্ত থাকে, ভবিষ্যত জীবনকে সুন্দর ও উন্নত করতে সহায়ক শিক্ষা ও জীবন গঠনের কর্মসূচী তাদের জন্য সবচেয়ে অনাকর্ষণীয়; বরং চরম

কঠিন মনে হয়। যাদের পিতা-মাতা তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ঐ জীবন উন্নতকারী বিষয়সমূহের দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করে তুলতে পারে, তারাই সুন্দর জীবনের অধিকারী হয়ে আদর্শ মানুষ হতে পারে এবং সম্মান ও সুখের জীবন লাভ করতে পারে।

(৪) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত নবী-রাসূল এবং তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের দ্বারা সর্বযুগেই মানুষের এ ভ্রান্তি ও দুর্বলতার সংশোধনের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে ও আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার যে অবস্থান এবং দুনিয়ার তুলনায় আখেরাতের যে মর্যাদা তা স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে এ ক্ষেত্রে ঐ শিশুসুলভ ভুলই পরিলক্ষিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ তোমাদের অবস্থা এই যে, তোমরা (আখেরাতের তুলনায়) দুনিয়ার জীবনকেই প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছ, অথচ আখেরাত (দুনিয়ার তুলনায় বহুগুণ) উত্তম ও স্থায়ী। এ কথাটি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও বলা হয়েছে, অর্থাৎ ইবরাহীম ও মূসা (আঃ)-এর সহীফাসমূহে।

(৫) কুরআন পাক যেহেতু পৃথিবীর জন্য সর্বশেষ হেদায়াতনামা, এ জন্য এর মধ্যে আরো সবিশেষ জোর দিয়ে এবং অধিক গুরুত্বের সাথে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শিরোনামে এ দুনিয়ার অসারতা ও অস্থায়িত্বকে এবং আখেরাতের গুরুত্ব ও মর্যাদাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন, কোথাও বলা হয়েছে ঃ "আপনি বলে দিন যে, দুনিয়ার উপকরণ তো খুবই সামান্য। আর পরকালই হচ্ছে উত্তম, পরহেযগারদের জন্য।" (সূরা নিসা) অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ "দুনিয়ার এ জীবন তো কেবল (কয়েক দিনের) ক্রীড়া-কৌতুক। আর পরকালের আবাসই হচ্ছে উত্তম, পরহেযগারদের জন্য। তোমরা কি এ বিষয়টি বুঝ না?" (সূরা আন'আম)

অন্যত্র এরশাদ হয়েছে ঃ "এ দুনিয়ার জীবন (এবং এখানকার উপকরণ) তো কেবল কয়েক দিনের ভোগের বস্তু। আর আখেরাতই হচ্ছে স্থায়ী আবাস।" (সূরা মু'মিন)

আরেক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ "আখেরাতে (অপরাধীদের জন্য) রয়েছে কঠিন শাস্তি। আর (যারা ক্ষমার যোগ্য, তাদের জন্য) রয়েছে ক্ষমা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি। আর এ দুনিয়ার জীবন তো হচ্ছে কেবল প্রতারণার সামগ্রী।" (সূরা হাদীদ)

(৬) সারকথা, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আগত নবী-রাসূলগণ এবং তাঁর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাবসমূহ মানুষের হেদায়াত ও পথপ্রদর্শনের জন্য এবং আখেরাতের অনন্ত অসীমকালের জীবনে তাদেরকে চরম সাফল্যের স্তরে পৌঁছানোর জন্য যে কয়টি বিষয়ের উপর বেশী জোর দিয়েছে, এগুলোর মধ্যে একটি বিষয় এও যে, মানুষ যেন দুনিয়াকে খুবই তুচ্ছ ও মূল্যহীন মনে করে, তারা যেন এর প্রতি মন না লাগায় এবং এটাকে নিজেদের উদ্দেশ্য ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু মনে না করে; বরং তারা যেন আখেরাতকে নিজেদের মনযিলে মকসূদ এবং স্থায়ী আবাস বলে বিশ্বাস করে সেখানের সফলতা অর্জনের চিন্তাকে নিজেদের পার্থিব সকল চিন্তার উপর প্রাধান্য দেয়। অতএব, মানুষের সৌভাগ্য এবং আখেরাতে তার সফলতা লাভের জন্য এটা যেন শর্ত যে, দুনিয়া তার দৃষ্টিতে তুচ্ছ ও মূল্যহীন হবে এবং তার মনোযোগ আখেরাতের দিকে থাকবে, আর তার অন্তরের ধ্বনি হবে এই ঃ হে আল্লাহ! জীবন তো কেবল আখেরাতের জীবনই।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ভাষণ-বক্তৃতা এবং মজলিসী আলোচনাসমূহ দ্বারাও এর শিক্ষাদান করতেন এবং ঈমানদারদের অন্তরে নিজের বাস্তব আমল ও অবস্থা দ্বারাও এরই চিত্র অংকন করতেন। সারকথা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের যেসব হাদীস এখানে আনা হবে— যেগুলোর মধ্যে দুনিয়ার তুচ্ছতা ও এর নিন্দাবাদ বর্ণনা করা হয়েছে, এগুলোর মর্ম ও উদ্দেশ্য এ আলোকেই বুঝতে হবে।

(৭) এ কথাটিও স্মরণ রাখতে হবে যে, কুরআন হাদীসে যে দুনিয়াদারীর নিন্দাবাদ করা হয়েছে, সেটা হচ্ছে আখেরাতের বিপরীত দুনিয়া। তাই দুনিয়ার কাজের যে ব্যস্ততা এবং দুনিয়া থেকে যে উপকার লাভ আখেরাত-চিন্তার অধীনে হবে এবং আখেরাতের পথ যার দ্বারা বিঘ্নিত না হবে, সেটা নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ নয়; বরং সেটা তো হবে জান্নাত পর্যন্ত পৌছার সোপান।

এ ভূমিকামূলক বিষয়টি মনের কোণে উপস্থিত রেখে এখন এ সংক্রান্ত হাদীসগুলো পাঠ করুন ঃ

আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার অবস্থান

(২৫) عَنْ مُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مِثْلَ مَا يَجْعَلُ اَحَدُكُمْ اِصْبَعَهٗ فِى الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ * (رواه مسلم)

২৫। মুস্তাওরেদ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্র কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত কেবল এতটুকুই, যেমন, তোমাদের কেউ নিজেদের আঙ্গুল সাগরে চুবিয়ে দিল। এবার সে দেখুক, এ আঙ্গুল কতটুকু পানি নিয়ে ফিরে আসে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, দুনিয়া আখেরাতের তুলনায় এতটুকুই তুচ্ছ ও নগণ্য, যেমন সাগরের পানির তুলনায় আঙ্গুলে লাগা সামান্য পানি। তদুপরি এ উদাহরণটিও কেবল বুঝানোর জন্য দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় বাস্তব দৃষ্টিতে আখেরাতের সাথে দুনিয়ার এ তুলনাও হয় না। কেননা, দুনিয়া এবং দুনিয়ার সবকিছুই সসীম ও ক্ষয়শীল, আর আখেরাত ও আখেরাতের সবকিছুই অসীম ও অক্ষয়। এ দিকে গণিতের স্বীকৃত সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, সসীম ও ক্ষয়শীল বস্তুর সাথে অসীম ও অক্ষয় জিনিসের কোন তুলনাই হয় না। বাস্তবতা যখন এই, তাই ঐ ব্যক্তি খুবই ভাগ্যাহত এবং চরম ক্ষতিগ্রস্ত, যে দুনিয়াকে লাভ করার জন্য তো খুবই চেষ্টা-সাধনা করে, কিন্তু আখেরাতের প্রস্তুতির বেলায় নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হয়ে বসে থাকে।

(٢٦) عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِجَدْيٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهٗ بِدِرْهَمٍ ؟ فَقَالُوْا مَا نُحِبُّ اَنَّهٗ لَنَا بِشَيْءٍ قَالَ فَوَاللّٰهِ لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ هٰذَا عَلَيْكُمْ * (رواه مسلم)

২৬। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কানহীন মৃত ছাগলছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেটা রাস্তায় মৃত অবস্থায় পড়া ছিল। তিনি তাঁর সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এ ছাগলছানাটি কেবল এক দেরহামের বিনিময়ে ক্রয় করা পছন্দ করবে ? তাঁরা উত্তরে বললেন, আমরা তো এটা কোন মূল্যের বিনিময়েই কিনতে রাজী নই। এবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

আল্লাহ্‌র কসম! তোমাদের নিকট এ ছাগলছানাটি যতটুকু তুচ্ছ ও মূল্যহীন, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এ দুনিয়াটা এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ ও মূল্যহীন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র অন্তরে উম্মতের হেদায়াত ও তাদের জীবন গড়ার যে অতুলনীয় আবেগ দান করেছিলেন, এ হাদীস দ্বারা এর কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। তিনি পথ চলছেন, একটি মৃত ছাগলছানার প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল, ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে পাশ কেটে চলে যাওয়ার পরিবর্তে সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এ অবস্থা ও দৃশ্য থেকে এক বিরাট সবক দিচ্ছেন এবং তাদেরকে বলছেন যে, এ মৃত ছাগলছানাটি তোমাদের কাছে যতটুকু তুচ্ছ ও মূল্যহীন, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দুনিয়া ততটুকুই তুচ্ছ ও মূল্যহীন। তাই নিজেদের চাওয়া-পাওয়া ও চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু এটাকে বানাতে যেয়ো না; বরং তোমরা আখেরাতন্বেষী হয়ে যাও।

(২৭) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً * (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

২৭। হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে যদি দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার সমানও হত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে এখান থেকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেন না। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ ও রাসূলকে অস্বীকারকারী কাফেরেরা দুনিয়া থেকে যা কিছু পাচ্ছে, (আর দেখা যায় যে, তারা খুব ভালই পেয়ে যাচ্ছে।) এর কারণ এটাই যে, আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়াটা খুবই তুচ্ছ ও মূল্যহীন। যদি এর কিছুটা মূল্যও থাকত, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিদ্রোহীদেরকে পানির একটি ফোঁটাও দিতেন না। যেমন, আখেরাত— আল্লাহ্‌র কাছে যার মূল্য রয়েছে, সেখানে আল্লাহ্‌র কোন দুশমনকে এক ফোঁটা শীতল ও সুস্বাদু পানিও দেওয়া হবে না।

দুনিয়া মু'মিনের কারাগার ও কাফেরের বেহেশত

(২৮) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ * (رواه مسلم)

২৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়া হচ্ছে মু'মিনের কারাগার, আর কাফেরের জান্নাত। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কারাগারে বন্দী জীবনের একটি বিরাট বৈশিষ্ট্য এই যে, এ জীবনে কেউ স্বাধীন থাকে না; বরং প্রতিটি বিষয়ে সে অন্যদের হুকুম পালনে বাধ্য থাকে। যখন খাবার দেওয়া হয়, তখন যাই দেওয়া হয়, তাই খেয়ে নেয়, যা পান করতে দেওয়া হয়, তাই পান করে নেয়, যেখানে বসার হুকুম দেওয়া হয়, সেখানেই বসে যায় এবং যেখানে দাঁড়াতে বলা হয়, সেখানেই দাঁড়িয়ে যায়। মোটকথা, কারাগারে নিজের মর্জি ও ইচ্ছার কোন দখল থাকে না; বরং ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় প্রতিটি কাজে অন্যদের নির্দেশ পালন করে যেতে হয়। অনুরূপভাবে কারাগারের

আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে কোন বন্দী মন লাগাতে যায় না এবং এটাকে নিজের বাড়ী মনে করে না; বরং সর্বদা সে এখান থেকে বেরিয়ে আসার চিন্তায় এবং এর প্রত্যাশায় থাকে।

পক্ষান্তরে জান্নাতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সেখানে জান্নাতীদের জন্য কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকবে না, সেখানে প্রত্যেক জান্নাতী নিজের মর্জি ও ইচ্ছা অনুযায়ী জীবন কাটাবে, তার সকল চাহিদা ও কামনা-বাসনা পূরণ করা হবে। তাছাড়া লক্ষ লক্ষ বছর পার হয়ে গেলেও কোন জান্নাতীর মন জান্নাত এবং জান্নাতের নেয়ামতসমূহ থেকে নিরানন্দ ও বিরক্ত হবে না এবং কারো অন্তরে জান্নাত থেকে বের হয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হবে না। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ জান্নাতে এমন সবকিছুই রয়েছে, যা তোমাদের মন চায় এবং তোমাদের নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। আর তোমরা সেখানে চিরকাল থাকবে। (সূরা যুখরুফ) সূরা কাহ্‌ফে এরশাদ হয়েছে ঃ জান্নাতীরা জান্নাত থেকেই স্থানান্তরিত হতে চাইবে না।

তাই এ অধমের মতে এ হাদীসে ঈমানদারদেরকে বিশেষ সবক এ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন দুনিয়াতে আইন ও বিধান পালনের মাধ্যমে ঐ কারাগারবাসীদের মত জীবন কাটায় এবং দুনিয়ার প্রতি মন না লাগায়। এ বাস্তবতাকে যেন তারা মনে রাখে যে, দুনিয়াকে জান্নাত মনে করা, এর প্রতি মন লাগানো এবং এর আরাম-আয়েশকে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া—এটা হচ্ছে কাফেরদের রীতি-নীতি। তাই এ হাদীসটি যেন একটি আয়না, যার মধ্যে প্রত্যেক মু'মিনই নিজের চেহারা দেখে নিতে পারে। অর্থাৎ, তার অন্তরের সম্পর্ক যদি দুনিয়ার প্রতি তাই হয়, যা কারাগারের প্রতি কোন কয়েদীর হয়ে থাকে, তাহলে সে পূর্ণ মু'মিন। আর সে যদি এ দুনিয়ার প্রতি এমনভাবে মন লাগিয়ে ফেলে থাকে যে, এটাকেই নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নিয়েছে, তাহলে এ হাদীস বলে দেয় যে, তার এ অবস্থাটি একটি কাফেরসুলভ অবস্থা।

ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার মোহ ছেড়ে চিরস্থায়ী আখেরাতের অন্বেষী হওয়া উচিত

(٢٩) عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحَبَّ دُنْيَاهُ اَضَرَّ بِاٰخِرَتِهٖ وَمَنْ اَحَبَّ اٰخِرَتَهٗ اَضَرَّ بِدُنْيَاهُ فَاٰثِرُوْا مَا يَبْقٰى عَلٰى مَا يَفْنٰى * (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

২৯। হযরত আবূ মূসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের প্রেমপাত্র ও ইপ্সিত লক্ষ্য বানিয়ে নেবে, সে অবশ্যই নিজের আখেরাতের ক্ষতি করবে। আর যে ব্যক্তি আখেরাতকে নিজের প্রেমপাত্র ও লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেবে, সে নিজের দুনিয়ার ক্ষতি করবেই। অতএব, (যখন দুনিয়া ও আখেরাতের মধ্য থেকে একটিকে প্রেমপাত্র বানিয়ে নিলে অন্যটির ক্ষতি অনিবার্য, তাই জ্ঞান ও বিবেকের দাবী এটাই যে,) তোমরা ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পরিবর্তে চিরস্থায়ী আখেরাতকে অবলম্বন কর এবং এটাকেই প্রাধান্য দাও। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ একথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি দুনিয়াকে নিজের প্রেমপাত্র ও লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নেবে, তার আসল চিন্তা-সাধনা দুনিয়ার জন্যই হবে, আর আখেরাতের বিষয়টাকে সে হয়তো

সম্পূর্ণ পশ্চাতে ফেলে রাখবে অথবা এর জন্য খুব কমই চেষ্টা-সাধনা করবে। আর এর অনিবার্য ফল হবে আখেরাতে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আখেরাতকে নিজের প্রেমপাত্র ও লক্ষ্যবস্তু স্থির করে নেবে, তার আসল চেষ্টা-সাধনা আখেরাতের জন্যই হবে এবং সে একজন দুনিয়াপূজারীর ন্যায় চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে পারবে না। যার ফল এই হবে যে, সে দুনিয়া বেশী সঞ্চয় করতে পারবে না। তাই ঈমানদারের জন্য উচিত, সে যেন নিজের ভালবাসা ও চাওয়া পাওয়ার জন্য আখেরাতকেই নির্বাচন করে, যা চিরস্থায়ী, আর দুনিয়া তো মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক ছাড়া এ দুনিয়া অভিশপ্ত

(٣٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ مَلْعُوْنٌ مَا فِيْهَا اِلَّا ذِكْرُ اللّٰهِ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمٌ * (رواه الترمذى وابن ماجه)

৩০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! দুনিয়া এবং এর মধ্যস্থিত সবকিছুই অভিশপ্ত, তবে আল্লাহ্‌র স্মরণ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ এবং আলেম ও এলেম অন্বেষণকারীরা এর ব্যতিক্রম। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্ থেকে উদাসীনতা সৃষ্টিকারী এই যে দুনিয়া, যার অন্বেষণে এবং যাকে পাওয়ার জন্য অনেক নির্বোধ মানুষ আল্লাহ্‌কে এবং আখেরাতকে ভুলে যায়, এটা তার সত্তা ও পরিণাম বিবেচনায় এতই হীন ও মৃত যে, আল্লাহ্‌র অসীম রহমতেও এর জন্য কোন স্থান নেই। তবে এ দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র স্মরণ এবং এর সাথে যেসব জিনিসের সম্পর্ক রয়েছে, বিশেষ করে এলমে-দ্বীনের বাহক ও এর শিক্ষার্থীগণ, তাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত রয়েছে।

সারকথা এই যে, এ দুনিয়াতে কেবল ঐসব জিনিস ও ঐসব আমলই আল্লাহ্‌র রহমতের যোগ্য, আল্লাহ্ তা'আলা এবং দ্বীনের সাথে যেগুলোর সম্পর্ক থাকে। চাই এ সম্পর্ক সরাসরি হোক অথবা কোন মাধ্যমে। আর যেসব জিনিস ও যেসব আমল ও কর্মকান্ড আল্লাহ্ তা'আলা থেকে এবং দ্বীন থেকে, সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন হয়ে থাকে, (প্রকৃতপক্ষে দুনিয়া এগুলোরই নাম) সেগুলো সবই আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে এবং অভিশাপযোগ্য। অতএব, মানুষের জীবন যদি আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে, তাঁর সম্পর্ক থেকে, দ্বীনের এলেম থেকে এবং এর শিক্ষা ও চর্চা থেকে শূন্য থাকে, তাহলে সে রহমতের হকদার নয়; বরং অভিশাপের যোগ্য।

দুনিয়া-অভিলাষী হয়ে কেউ গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না

(٣١) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مِنْ اَحَدٍ يَمْشِىْ عَلَى الْمَاءِ اِلَّا ابْتَلَّتْ قَدَمَاهُ ؟ قَالُوْا لَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ كَذٰلِكَ صَاحِبُ الدُّنْيَا لَايَسْلَمُ مِنَ الذُّنُوْبِ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৩১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এমন কেউ আছে কি, যে পানির উপর দিয়ে হেঁটে যায়, অথচ তার পা ভিজে না ? সাহাবায়ে কেরাম উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন তো হতে পারে না। তিনি তখন বললেন ঃ এমনিভাবেই দুনিয়া অভিলাষী কেউ গুনাহ্ থেকে বাঁচতে পারে না। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়া অভিলাষী দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়াকেই নিজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানিয়ে নিয়ে এতেই ব্যস্ত হয়ে যায়। আর এমন ব্যক্তি গুনাহ্ থেকে বেঁচে থাকবে কি করে ? তবে বান্দার অবস্থা যদি এই হয় যে, তার লক্ষ্যবস্তু থাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখেরাত, আর দুনিয়ার ব্যস্ততাকেও সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও আখেরাতের সফলতার উপায় বানিয়ে নেয়, তাহলে তাকে দুনিয়া অভিলাষী বলা হবে না। সে বাহ্যত দুনিয়ার কাজে ব্যস্ত থেকেও গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে। এ বিষয়টি সামনের কোন কোন হাদীসে স্পষ্টভাবেই এসে যাবে।

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয়পাত্রদেরকে দুনিয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখেন

(٣٢) عَنْ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَحَبَّ اللّٰهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ اَحَدُكُمْ يَحْمِيْ سَقِيْمَهُ الْمَاءَ * (رواه احمد والترمذى)

৩২। হযরত কাতাদা ইবনে নু'মান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালবাসেন, তখন তিনি তাকে দুনিয়া থেকে এভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেমন, তোমাদের কেউ তার রোগীকে পানি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। (যখন পানি দ্বারা তার ক্ষতি হয়।) —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ উপরে যেমন বলা হয়েছে যে, দুনিয়া আসলে সেটাই, যা আল্লাহ্ থেকে বান্দাকে উদাসীন করে দেয় এবং যাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লে আখেরাতের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাদেরকে ভালবাসেন এবং নিজের বিশেষ অনুগ্রহ দ্বারা যাদেরকে ধন্য করতে চান, তাদেরকে এ মৃত দুনিয়া থেকে এভাবে বাঁচিয়ে রাখেন, যেভাবে আমরা আমাদের রোগীদেরকে পানি থেকে দূরে রাখি।

নিজেকে একজন মুসাফির এবং এ দুনিয়াকে একটি পান্থশালা মনে করবে

(٣٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِىَّ فَقَالَ كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ * (رواه البخارى)

৩৩। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার দুই কাঁধে হাত রেখে বললেন ঃ দুনিয়াতে এমনভাবে থাক যে, তুমি যেন একজন প্রবাসী অথবা পথচারী মুসাফির। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, যেভাবে কোন মুসাফির ভিনদেশকে এবং চলার পথকে নিজের আসল দেশ মনে করে না এবং সেখানে নিজের জন্য কোন দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থাপনা অবলম্বন করে না, এভাবেই একজন মু'মিনের উচিত, সে যেন এ দুনিয়াকে নিজের আসল আবাস মনে না করে এবং এখানের জন্য এমন চিন্তা ও পরিকল্পনা না করে যে, মনে হয় এখানেই সে চিরদিন থাকবে। সে বরং এ দুনিয়াকে ভিনদেশ ও একটি পান্থশালা মনে করবে।

বাস্তব কথা এই যে, নবী-রাসূলগণ মানুষকে যেমন মানুষ বানাতে চান এবং নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা তাদের যে চরিত্র সৃষ্টি করতে চান, এর ভিত্তিমূল এটাই যে, মানুষ দুনিয়ার এ জীবনকে সম্পূর্ণ অস্থায়ী ও কয়েক দিনের মুসাফিরী জীবন মনে করবে এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনকেই প্রকৃত ও আসল জীবন বলে বিশ্বাস করে এর চিন্তা ও প্রস্তুতিতে এমনভাবে লেগে থাকবে যে, সেই জীবন যেন তাঁর চোখের সামনে এবং সে সেই জগতেই রয়েছে। যারা এ অবস্থাটি নিজেদের জীবনে যতটুকু সৃষ্টি করতে পেরেছে, তাদের জীবন ও চরিত্র ততটুকুই নবী-রাসূলদের শিক্ষা ও অভিপ্রায় অনুযায়ী গড়ে উঠেছে। আর যারা নিজেদের মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি, তাদের জীবনও সেভাবে গড়ে উঠেনি। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ভাষণ ও বক্তব্যে এ বিষয়টির উপর খুব বেশী জোর দিতেন।

দুনিয়া ও আখেরাতের উপর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর একটি ভাষণ

(٣٤) عَنْ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَقَالَ فِىْ خُطْبَتِهِ اَلَا اِنَّ الدُّنْيَا عَرَضٌ حَاضِرٌ يَأْكُلُ مِنْهُ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ اَلَا وَاِنَّ الْاٰخِرَةَ اَجَلٌ صَادِقٌ وَّيَقْضِىْ فِيْهَا مَلِكٌ قَادِرٌ اَلَا وَاِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهٗ بِحَذَافِيْرِهٖ فِى الْجَنَّةِ اَلَا وَاِنَّ الشَّرَّ كُلَّهٗ بِحَذَافِيْرِهٖ فِى النَّارِ اَلَا فَاعْمَلُوْا وَاَنْتُمْ مِنَ اللّٰهِ عَلٰى حَذَرٍ وَاعْلَمُوْا اَنَّكُمْ مُعْرَضُوْنَ عَلٰى اَعْمَالِكُمْ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ * (رواه الشافعى)

৩৪। হযরত আমর ইবনুল আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন একটি ভাষণ দিলেন। সে ভাষণে তিনি বললেন ঃ তোমরা শুনে রাখ, এ দুনিয়া হচ্ছে একটা উপস্থিত অস্থায়ী পণ্য। এতে প্রত্যেক পুণ্যবান ও পাপাচারীর অংশ রয়েছে। তাই পুণ্যবান ও পাপী সবাই এখান থেকে আহার পায়। পক্ষান্তরে আখেরাত হচ্ছে নির্ধারিত সময়ে আগত এক বাস্তব সত্য। আর সেখানে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান বাদশাহ (আল্লাহ্)। মনে রেখো, সকল কল্যাণ ও সুখের ঠিকানা হচ্ছে জান্নাত, আর সকল অকল্যাণ ও দুঃখ রয়েছে জাহান্নামে। অতএব, তোমরা অন্তরে আল্লাহ্র ভয় রেখে আমল করে যাও। তোমরা বিশ্বাস কর যে, তোমাদের আমলসহ তোমাদেরকে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করা হবে। তাই যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করবে, সে তা দেখতে পাবে। আর যে ব্যক্তি অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে। —মুসনাদে শাফেয়ী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য ও বিভিন্ন ধরনের পাপাচারের মূল ও ভিত্তি এই যে, সে আল্লাহ্র বিধি-বিধান ও আখেরাতের পরিণতি থেকে নিশ্চিন্ত এবং উদাসীন থেকে জীবন কাটিয়ে দেয় এবং নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণ ও এ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাদ উপভোগকে নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তু স্থির করে নেয়। আর এটা এ কারণে হয় যে, দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে সেটা চোখের সামনে রয়েছে, পক্ষান্তরে আল্লাহ্ এবং আখেরাত চোখের অন্তরালে। এ জন্য মানুষকে এ ধ্বংস থেকে রক্ষা করার পথ এটাই যে, তাদের সামনে দুনিয়ার অসারতা ও

মূল্যহীনতাকে এবং আখেরাতের গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে হবে এবং কেয়ামতে আল্লাহ্‌র দরবারে উপস্থিতি, নিজেদের কর্মকাণ্ডের প্রতিদান ও শাস্তি এবং জান্নাত ও জাহান্নামের সুখ ও দুঃখের বিশ্বাস তাদের অন্তরে বদ্ধমূল করার চেষ্টা ও প্রয়াস চালাতে হবে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ভাষণের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু এটাই। এ কথা আগেও বলা হয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকাংশ ভাষণ ও বক্তব্যে এ মৌলিক বিষয়টিই স্থান পেত।

বিঃ দ্রঃ এ বিষয়টি খুবই উদ্বেগজনক যে, দ্বীনী দাওয়াত ও ওয়ায-নছীহতে দুনিয়ার অস্থায়িত্ব ও অসারতা এবং আখেরাতের গুরুত্বের বর্ণনা এবং জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা যেভাবে, যে ঈমান ও ইয়াকীনের সাথে এবং যেরূপ শক্তিশালী উপস্থাপনায় পেশ করা উচিত ছিল, আমাদের এ যুগে এর রেওয়াজ খুবই কম পরিলক্ষিত হয়; বরং মনে হয় যে, এর প্রচলন একেবারেই নেই। এমনকি দ্বীনের প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রেও ঐ ধরনের কথা-বার্তা বলার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে, যে ধরনের বক্তব্য জড়বাদী আন্দোলন ও পার্থিব সংগঠনসমূহের প্রতি আহ্বান এবং এর প্রচারের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দুনিয়ার সাথে না জড়িয়ে আখেরাতের অভিলাষী হয়ে থাকা চাই

(٣٥) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَتَخَوَّفُ عَلٰى اُمَّتِى الْهَوٰى وَطُوْلُ الْاَمَلِ فَاَمَّا الْهَوٰى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ وَاَمَّا طُوْلُ الْاَمَلِ فَيُنْسِى الْاٰخِرَةَ وَهٰذَا الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ وَهٰذِهِ الْاٰخِرَةُ مُرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَنُوْنَ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَاتَكُوْنُوْا مِنْ بَنِى الدُّنْيَا فَافْعَلُوْا فَاِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِىْ دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَابَ وَاَنْتُمْ غَدًا فِىْ دَارِ الْاٰخِرَةِ وَلَا عَمَلَ *

(رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৩৫। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার উম্মতের উপর যে জিনিসটির সবচেয়ে বেশী ভয় করি সেটা হচ্ছে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও দীর্ঘ আশা। বস্তুতঃ প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে সত্য ও বাস্তবতা গ্রহণ করা থেকে ফিরিয়ে রাখে, আর দীর্ঘ আশা মানুষকে আখেরাতের কথা ভুলিয়ে দেয়। এই যে দুনিয়া এটা অবিরাম গতিতে চলছে আর চলছে। (কোথাও এর বিরাম ও স্থিতি নেই।) অপর দিকে আখেরাত সামনের দিকে আসছে, আর অব্যাহত গতিতেই আসছে। আর এ দু'টিরই সন্তান রয়েছে। (অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে, যারা দুনিয়াকে এমনভাবে জড়িয়ে আছে, যেমন, সন্তান নিজের মাকে জড়িয়ে ধরে রাখে। আর তাদের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছে, যারা দুনিয়ার পরিবর্তে আখেরাতকে জড়িয়ে রয়েছে।) তাই তোমরা যদি দুনিয়ার সন্তান না হয়ে থাকতে পার, তাহলে তাই কর (এবং দুনিয়াকে আমলের ক্ষেত্র মনে কর।) তোমরা বর্তমানে কর্মক্ষেত্রে রয়েছ, এখানে কোন হিসাব নেই। কিন্তু আগামী কাল তোমরা আখেরাতের বাড়ীতে চলে যাবে, আর সেখানে কোন কাজ থাকবে না। (বরং এখানে

কৃত আমলসমূহের হিসাব নেওয়া হবে এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে।) —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে নিজ উম্মতের বেলায় দু'টি বড় রোগের ভয় ও আশংকা প্রকাশ করেছেন এবং উম্মতকে এগুলো থেকে ভীতি প্রদর্শন করে সতর্ক করেছেন। এর একটি হচ্ছে প্রবৃত্তির দাসত্ব আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে দীর্ঘ আশা। চিন্তা করে দেখলে স্পষ্টভাবে জানা যাবে যে, এ দুটি ব্যাধিই উম্মতের এক বিরাট অংশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যাদের মধ্যে চিন্তা ও মতাদর্শগত ভ্রান্তি দেখা যায়, তারা প্রবৃত্তির দাসত্বের ব্যাধিতে আক্রান্ত। আর যাদের আমল ও কর্ম খারাপ তারা দীর্ঘ আশা ও দুনিয়াপ্রীতির রোগে আক্রান্ত এবং আখেরাতের চিন্তা ও প্রস্তুতি গ্রহণে উদাসীন। এগুলোর চিকিৎসা তাই, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসের শেষাংশে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ, মানুষের অন্তরে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হতে হবে যে, দুনিয়ার এ জীবন ক্ষণস্থায়ী— মাত্র কয়েক দিনের। আর আখেরাতের জীবনই হচ্ছে প্রকৃত ও স্থায়ী জীবন এবং আখেরাতই আমাদের আসল ঠিকানা। এ বিশ্বাস যখন অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন আমাদের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি উভয়টির সংশোধনই সহজ হয়ে যাবে।

সম্পদের প্রাচুর্যের আশংকা এবং রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সতর্কবাণী

(٣٦) عَنْ عَمْرِوبْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَاللّٰهِ لَا الْفَقْرَ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلٰكِنْ اَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ * (رواه البخارى ومسلم)

৩৬। 'আমর ইবনে আউফ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাদের উপর অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের ভয় করি না; কিন্তু আমি তোমাদের বেলায় এ আশংকা অবশ্যই করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়াকে প্রশস্ত করে দেওয়া হবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছিল। তারপর তোমরা এটা লাভ করার জন্য এমন প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে, যেমন প্রতিযোগিতায় তারা অবতীর্ণ হয়েছিল। ফলে এ দুনিয়া তোমাদেরকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে পূর্ববর্তী কোন কোন সম্প্রদায় ও উম্মতের ব্যাপারে এ অভিজ্ঞতা ছিল যে, তাদের কাছে যখন দুনিয়ার সম্পদের প্রাচুর্য আসল, তখন তাদের মধ্যে পার্থিব লালসা এবং সম্পদের আকাঙ্ক্ষা আরো বেড়ে গেল, তারা দুনিয়া-পাগল হয়ে উঠল এবং জীবনের আসল উদ্দেশ্যই ভুলে গেল। তারপর এ কারণে তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ এবং পরস্পর শত্রুতাও সৃষ্টি হয়ে গেল এবং শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়াপ্রীতি তাদেরকে ধ্বংস করে দিল।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মনে নিজের উম্মতের বেলায় এরই ভয় ছিল বেশী। তাই এ হাদীসে তিনি নিজের উম্মতের প্রতি স্নেহ ও দয়া প্রদর্শন করে এ আশংকার কথা ব্যক্ত

করে বলেছেন যে, তোমাদের উপর আমি দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের বেশী ভয় করি না; বরং এর বিপরীত তোমাদের মধ্যে সম্পদের প্রাচুর্য এসে গেলে তোমরা দুনিয়া-পূজায় ব্যস্ত হয়ে গিয়ে নিজেদের ধ্বংস ডেকে আন কিনা, এরই বেশী আশংকা করছি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে এ চাকচিক্যময় ফেতনার ভয়াবহতা থেকে উম্মতকে সতর্ক করা, যাতে এমন সময় এসে গেলে তারা এর মন্দ প্রভাব থেকে নিজেদের আত্মরক্ষার চিন্তা করতে পারে।

এ উম্মতের বিশেষ পরীক্ষার বস্তু হচ্ছে সম্পদ

(৩৭) عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ اُمَّتِي الْمَالُ * (رواه الترمذى)

৩৭। কা'ব ইবনে ইয়ায (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একটা বিশেষ পরীক্ষার বস্তু থাকে, আর আমার উম্মতের বিশেষ পরীক্ষার বস্তু হচ্ছে সম্পদ। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, আমার নবুওয়তের যুগে (যা এখন থেকে কেয়ামতকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে।) ধন-সম্পদের এমন গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং এর লালসা এত বৃদ্ধি পাবে যে, এটাই এ উম্মতের জন্য বিরাট ফেতনা হয়ে দাঁড়াবে। (কুরআন মজীদেও সম্পদকে ফেতনা বলা হয়েছে।)

বাস্তব সত্যও এই যে, নবীযুগ থেকে শুরু করে আমাদের এ যুগ পর্যন্ত ইতিহাসের প্রতি যে-ই দৃষ্টি দেবে সে-ই স্পষ্টভাবেই অনুভব করতে পারবে যে, অর্থ-কড়ির বিষয়টির গুরুত্ব ও সম্পদের মোহ সর্বদা বেড়েই গিয়েছে এবং বর্তমানেও বেড়েই চলছে। তাই নিঃসন্দেহে এটাই এ যুগের সবচেয়ে বড় ফেতনা, যে ফেতনা অসংখ্য মানুষকে আল্লাহ্‌র নাফরমানির পথে নামিয়ে দিয়ে তাদেরকে প্রকৃত সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে; বরং বর্তমানে অবস্থা এই যে, আল্লাহ্‌বিমুখতা ও খোদাদ্রোহিতার পতাকাধারীরাও সম্পদ ও জীবিকার প্রসঙ্গ সম্বল করেই বিশ্বব্যাপী দাজ্জালী চিন্তাধারার প্রসার ঘটিয়ে যাচ্ছে।

সম্পদ ও সম্মানের মোহ দ্বীনকে ধ্বংস করে দেয়

(৩৮) عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا فِىْ غَنَمٍ بِاَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِيْنِهٖ * (رواه الترمذى والدارمى)

৩৮। কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে একটি ছাগপালের মধ্যে ছেড়ে দিলে এগুলো ছাগপালের জন্য এর চেয়ে বেশী ক্ষতিকর হবে না, যতটুকু ক্ষতিকর হয় মানুষের দ্বীনের জন্য তার সম্পদের মোহ ও সম্মানের লোভ। —তিরমিযী, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, সম্পদের লোভ ও সম্মানের আকাঙ্ক্ষা মানুষের দ্বীনকে এবং আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্ককে এর চাইতেও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে, যেমন কোন ছাগলের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া নেকড়ে ঐ ছাগলগুলোর ক্ষতি করে থাকে।

অর্থ ও সম্মানের মোহ বুড়োকালেও জওয়ান থাকে

(٣٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْرَمُ ابْنُ اٰدَمَ وَيَشِبُّ فِيْهِ اِثْنَانِ اَلْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ * (رواه البخارى ومسلم)

৩৯। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ বুড়ো হয়, (এবং বার্ধক্যের কারণে তার সকল শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল হয়ে যায়,) কিন্তু তার দু'টি স্বভাব আরো জওয়ান ও শক্তিশালী হতে থাকে। একটি হচ্ছে সম্পদের লোভ, আর অপরটি হচ্ছে বেশী দিন বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ সাক্ষী যে, মানুষের সাধারণ অবস্থা এটাই এবং এর কারণও স্পষ্ট। আসল কথা হচ্ছে এই যে, মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে এমন অনেক ভ্রান্ত আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়, যেগুলো পূর্ণ করা তখনই সম্ভব হয়, যখন তার হাতে সম্পদ থাকে এবং জীবন ও শক্তিও অটুট থাকে। এসব আকাঙ্ক্ষার ক্ষতি ও ধ্বংসকারিতা থেকে মানুষকে রক্ষা করা পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারাই সম্ভব হতে পারে। কিন্তু বার্ধক্যের প্রভাবে যখন এ জ্ঞানও ক্ষয়প্রাপ্ত ও দুর্বল হয়ে যায়, তখন এগুলোর উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে জ্ঞানও অপারগ হয়ে বসে। যার ফল এই হয় যে, শেষ জীবনে অনেক আকাঙ্ক্ষা চরম লালসার স্তরে পৌঁছে যায়। ফলে মানুষের অন্তরে সম্পদের লোভের সাথে সাথে দুনিয়ায় বেশী দিন বেঁচে থাকার লোভ ও চাহিদা আরো বৃদ্ধি পায়। জনৈক কবি ঠিকই বলেছেন ঃ অসৎ চরিত্রের ভিত্তি যখন মজবুত হয়ে যায়, তখন এটা উৎপাটন করার শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। তবে এ অবস্থাটি হচ্ছে সাধারণ মানুষের। আল্লাহ্র যেসব বান্দা এ দুনিয়া এবং দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ এবং এর পরিণতি বুঝে নিয়েছেন এবং যারা নিজেদের নফসের পরিশুদ্ধি করে নিয়েছেন, তাদের বিষয়টি স্বতন্ত্র, তারা এসবের উর্ধ্বে।

(٤٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيْرِ شَابًّا فِىْ اِثْنَيْنِ فِىْ حُبِّ الدُّنْيَا وَطُوْلِ الْاَمَلِ * (رواه البخارى ومسلم)

৪০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ বুড়ো মানুষের অন্তর দুটি জিনিসের ব্যাপারে সর্বদা জওয়ান থাকে। একটি হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা, আর অপরটি হচ্ছে দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরের হাদীসের ব্যাখ্যায়ও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণ মানুষের অবস্থা এটাই হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহ্র যেসব বান্দা নিজের পরিচয় এবং আল্লাহ্র পরিচয় লাভ করতে পারে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান ও বিশ্বাস অর্জন করে নিতে পারে, তাদের অবস্থা এই হয় যে, দুনিয়ার ভালবাসার স্থলে আল্লাহ্র ভালবাসা এবং এ অস্থায়ী দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের নেয়ামতের আকাঙ্ক্ষা ও এর বাসনা বুড়ো বয়সেও তাদের অন্তরে বৃদ্ধি ও উন্নতি লাভ করতে থাকে। তাদের জীবনের অনাগত প্রতিটি দিন বিগত দিনের তুলনায় এ দিক দিয়েও উন্নতির দিন হয়ে থাকে।

সম্পদ বৃদ্ধির লোভ কোন পর্যায়ে গিয়েও শেষ হয় না

(٤١) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كَانَ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغٰى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ اٰدَمَ اِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللهُ عَلٰى مَنْ تَابَ * (رواه البخاری ومسلم)

৪১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের কাছে যদি সম্পদে ভরা দু'টি উপত্যকাও থাকে, তবুও সে তৃতীয় আরেকটি কামনা করবে। বস্তুতঃ আদম-সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কোন কিছুই ভরতে পারবে না। তবে আল্লাহ্ ঐ বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করেন, যে তাঁর প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, ধন-সম্পদের অধিক লোভ যেন সাধারণ মানুষের প্রকৃতিগত জিনিস। যদি সম্পদ দ্বারা তাদের ঘর-বাড়ী ভরেও থাকে এবং ময়দানের পর ময়দানও যদি ধন-সম্পদে উপচে পড়ে, তবুও তাদের মন পরিতৃপ্ত হয় না; বরং এর আরো আধিক্যই তারা কামনা করে এবং জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত তাদের লোভ-লালসার এ অবস্থাই থাকে। কেবল কবরে গিয়েই তাদের সম্পদের এ মোহ ও ক্ষুধার নিবৃত্তি এবং সঞ্চয়ের এ নেশার পরিসমাপ্তি ঘটে।

তবে আল্লাহ্র যে সকল বান্দা দুনিয়া এবং দুনিয়ার সম্পদের পরিবর্তে নিজের মনের ঝোঁক আল্লাহ্র প্রতি করে নেয় এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাদের প্রতি আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে এ দুনিয়াতেই মনের প্রশান্তি এবং অন্তরের পরিতৃপ্তি দান করেন। ফলে এ দুনিয়াতেও তাদের জীবন বেশ আনন্দে ও প্রশান্তিতে কেটে যায়।

আখেরাত অন্বেষীর অন্তর প্রশান্ত এবং দুনিয়া অন্বেষীর অন্তর অশান্ত থাকে

(٤٢) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الْاٰخِرَةِ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِىْ قَلْبِهٖ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَاَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِىَ رَاغِمَةٌ وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ طَلَبَ الدُّنْيَا جَعَلَ اللهُ الْفَقْرَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَشَتَّتَ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَلَا يَاْتِيْهِ مِنْهَا اِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ * (رواه الترمذی ورواه احمد والدارمی)

৪২। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির নিয়্যত ও উদ্দেশ্য আখেরাত অন্বেষণ হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে প্রশান্তি ও মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষীতার ভাব সৃষ্টি করে দেন, তার বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূর করে দেন এবং দুনিয়া তার কাছে অপমানিত হয়ে এসে ধরা দেয়। আর যে ব্যক্তির (চেষ্টা সাধনার) উদ্দেশ্য দুনিয়া অর্জন হয়ে থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দুই চোখের মাঝে (কপালে) দারিদ্র্য ও পরমুখাপেক্ষিতার চিহ্ন সৃষ্টি করে দেন, তার অবস্থা বিক্ষিপ্ত করে দেন, (যার ফলে অন্তরের প্রশান্তি থেকে সে বঞ্চিত থাকে।) এবং (সকল চেষ্টা-সাধনার পরও) এ দুনিয়া থেকে সে কেবল ততটুকুই লাভ করে, যা তার ভাগ্যে পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, যে বান্দা আখেরাতের উপর বিশ্বাস রেখে আখেরাতের সফলতাকেই নিজের আসল উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয়, তার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার আচরণ এ হয়

যে, দুনিয়ার ব্যাপারে তাকে অল্পেতুষ্টি দান করে তার অন্তরকে প্রশান্ত ও মনকে ব্যাকুলতা থেকে মুক্ত রাখেন। আর দুনিয়া থেকে তার ভাগ্যে যতটুকু নির্ধারিত থাকে, ততটুকু অংশ কোন না কোন পথ ধরে নিজেই তার কাছে এসে যায়। অপর দিকে যে ব্যক্তি দুনিয়াকেই নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষার বস্তু বানিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর দারিদ্র্য ও অস্থিরতার এমন অবস্থা চাপিয়ে দেন যে, দর্শকদের দৃষ্টিতে তার মুখমন্ডলে ও কপালে এর ছাপ ফুটে থাকে। আর দুনিয়ার অন্বেষণে তার রক্ত ও ঘাম এক করে দেওয়ার পরও দুনিয়া থেকে সে এতটুকুই পায়, যা পূর্বেই তার ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল।

অতএব, ঘটনা ও বাস্তবতা যেহেতু এই, তাই বান্দার উচিত, সে যেন আখেরাতকেই নিজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করে নেয়, আর দুনিয়াকে কেবল একটি অস্থায়ী ও সাময়িক প্রয়োজন মনে করে এর জন্য শুধু এতটুকুই চিন্তা করে, যতটুকু চিন্তা কোন অস্থায়ী ও সাময়িক জিনিসের জন্য করা হয়ে থাকে।

ধন-সম্পদে মানুষের প্রকৃত অংশ কতটুকু

(٤٣) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ الْعَبْدُ مَالِىْ مَالِىْ وَاِنَّ مَالَهُ مِنْ مَّالِهِ ثَلٰثٌ مَا اَكَلَ فَاَفْنٰى اَوْ لَبِسَ فَاَبْلٰى اَوْ اَعْطٰى فَاقْتَنٰى وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ * (رواه مسلم)

৪৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ বলে, আমার মাল, আমার সম্পদ। অথচ তার সম্পদের মধ্যে বাস্তবে যা তার, সেটা কেবল এ তিনটি খাত ঃ (১) সে যা খেয়ে নিল এবং শেষ করে দিল, (২) যা পরিধান করে পুরাতন করে ফেলল, (৩) যা আল্লাহ্র পথে ব্যয় করে দিল এবং নিজের আখেরাতের জন্য সঞ্চিত রাখল। এর বাইরে যা রয়েছে সেটা সে অন্য মানুষের জন্য রেখে নিজে একদিন বিদায় হয়ে যাবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, মানুষের উপার্জিত ও সঞ্চিত সম্পদে তার আসল অংশ কেবল এতটুকুই, যা সে নিজের খাওয়া-পরার প্রয়োজনে এখানে খরচ করে নিল অথবা আল্লাহ্র পথে বিলিয়ে দিয়ে আখেরাতের জন্য আল্লাহ্র কাছে সঞ্চয় করে রাখল। এর বাইরে যা কিছু আছে সেটা আসলে তার নয়; বরং তার উত্তরাধিকারীদের, যাদের জন্য সে এটা রেখে যাবে।

(٤٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَّالِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا مِنَّا اَحَدٌ اِلَّا مَالُهُ اَحَبُّ اِلَيْهِ مِنْ مَّالِ وَارِثِهِ قَالَ فَاِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالَ وَارِثِهِ مَا اَخَّرَ * (رواه البخارى)

৪৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, তার কাছে নিজের সম্পদের চেয়ে

তার ওয়ারিসের সম্পদ অধিক প্রিয় ? (অর্থাৎ, নিজের হাতে সম্পদ আসার চেয়ে নিজের ওয়ারিসদের হাতে সম্পদ আসা যার কাছে অধিকতর প্রিয় ।) লোকেরা বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমাদের সবার কাছেই তো ওয়ারিসের সম্পদের চেয়ে নিজের সম্পদই অধিক প্রিয় । তিনি বললেন ঃ ব্যাপার যখন তাই, তাহলে জেনে নেওয়া উচিত যে, মানুষের সম্পদ কেবল তাই, যা সে আগে পাঠিয়ে দিয়েছে । আর যে পরিমাণ সে পরে কাজে আসবে বলে রেখে দিয়েছে, সেটা তার নয়; বরং তার উত্তরাধিকারীদের । (তাই বুদ্ধিমান মানুষের জন্য উচিত, ওয়ারিসদের জন্য রেখে যাওয়ার চেয়ে নিজের আখেরাতের পাথেয় সংরক্ষণ করার ব্যাপারে বেশী চিন্তা করা । এর পদ্ধতি এটাই যে, সম্পদ পুঞ্জীভূত করে ঘরে রেখে দেওয়ার পরিবর্তে কল্যাণ খাতে কিছু ব্যয়ও করে যাবে ।) —বুখারী

(٤٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهٖ قَالَ اِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ قَالَتِ الْمَلٰئِكَةُ مَاقَدَّمَ وَقَالَ بَنُوْ اٰدَمَ مَا خَلَّفَ *

(رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৪৫ । হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ যখন মৃত ব্যক্তি মারা যায়, তখন ফেরেশ্তারা বলে এবং জিজ্ঞাসা করে, সে নিজের জন্য অগ্রিম কি পাঠিয়েছে ? (অর্থাৎ, কি নেক আমল করেছে এবং নিজের আখেরাতের জীবনের জন্য আল্লাহ্র কোষাগারে কি পাথেয় জমা করেছে ?) অপর দিকে সাধারণ মানুষ পরস্পর জিজ্ঞাসা করে, সে কতটুকু সম্পদ রেখে গিয়েছে ? —বায়হাকী

সম্পদপূজারী বান্দা আল্লাহ্র রহমত থেকে বঞ্চিত

(٤٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لُعِنَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ وَلُعِنَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ *(رواه الترمذى)

৪৬ । হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ দীনারের গোলাম আল্লাহ্র রহ্মত থেকে বঞ্চিত হোক, দেরহামের গোলাম আল্লাহ্র রহ্মত থেকে বঞ্চিত হোক । —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ যেসব লোক অর্থ-সম্পদ ও দীনার-দেরহামের পূজারী এবং যারা ধন-সম্পদকেই নিজের খোদা ও প্রিয়পাত্র বানিয়ে নিয়েছে, এ হাদীসে তাদের প্রতি অসন্তুষ্টির ঘোষণা এবং তাদের বেলায় বদদো'আ করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র রহ্মত থেকে বঞ্চিত ও দূরে থাকুক ।

অর্থ-সম্পদের পূজা ও গোলামীর অর্থ এই যে, মানুষ এর চাহিদা ও অন্বেষণে এমন ব্যস্ত হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র বিধি-বিধান ও হালাল-হারামের সীমার প্রতিও লক্ষ্য থাকে'না ।

হুযূর (সাঃ)-এর বাণী ঃ আমাকে ব্যবসা ও অর্থ সঞ্চয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়নি

(٤٧) عَنْ جُبَيْرِبْنِ نُفَيْرٍ مُرْسَلًا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ اَجْمَعَ الْمَالَ وَاَكُوْنَ مِنَ التَّاجِرِيْنَ وَلٰكِنْ اُوْحِىَ اِلَىَّ اَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ * (رواه فى شرح السنة)

৪৭। হযরত জুবাইর ইবনে নুফাইর (রহঃ) থেকে মুরসাল পদ্ধতিতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে ওহীর মাধ্যমে এ নির্দেশ দেওয়া হয়নি যে, আমি যেন অর্থ-সম্পদ জমা করি এবং ব্যবসায়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকি; বরং আমাকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, আমি যেন আমার প্রতিপালকের সপ্রশংস তসবীহ পাঠ করি ও সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকি এবং আমৃত্যু তাঁর এবাদত করে যাই। —শরহুস সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ শরীঅতের নীতি ও বিধানের ব্যাপারে যাদের কিছুটা জ্ঞান আছে, তারা জানে যে, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং এর মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা কোন নাজায়েয বিষয় নয় এবং শরীঅতের বিধি-বিধানের একটা বিরাট অংশ ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি আর্থিক লেনদেনের সাথেও সংশ্লিষ্ট; বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং ঐসব ব্যবসায়ীদের বিরাট ফযীলত ও মর্যাদার কথা বর্ণনা করেছেন, যারা আমানতদারী, সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে বিশেষ অবস্থান ও মর্যাদা ছিল এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দ্বারা যে কাজ নিতে চেয়েছিলেন, এতে ব্যবসার মত কোন বৈধ অর্থকরী পেশায়ও তাঁর জড়িত হওয়ার অবকাশ ছিল না। সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে অল্পেতুষ্টি এবং তাওয়াক্কুলের বিরাট সম্পদ দান করে এ চিন্তা থেকে মুক্তও করে দিয়েছিলেন।

তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসের মর্ম এটাই যে, আমাকে তো ঐসব কাজেই নিয়োজিত থাকতে হবে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যেগুলোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমার কাজ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থ সঞ্চয় করা নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যেও যারা নিজেদের জন্য খাঁটি তাওয়াক্কুলের জীবন পছন্দ করে এবং এ পথের কঠিন পরীক্ষা ও বিপদের উপর ধৈর্য ধারণ করার সাহস রাখে, এর সাথে আল্লাহ্ তা'আলার উপর তাওয়াক্কুলের সম্পদও যদি তারা লাভ করে থাকে, তাহলে তাদের জন্যও নিঃসন্দেহে এটাই উত্তম। কিন্তু যাদের অবস্থা এমন নয়, তাদের জন্য অর্থ উপার্জনের কোন বৈধ পেশা অবলম্বন করা, বিশেষ করে আমাদের এ যুগে খুবই জরুরী।

আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সম্পদ ও প্রাচুর্যের প্রস্তাব সত্ত্বেও হুযূর (সাঃ) দারিদ্র্যকেই বরণ করে নিলেন

(٤٨) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَىَّ رَبِّىْ لِيَجْعَلَ لِىْ بَطْحَاءَ مَكَّةَ ذَهَبًا فَقُلْتُ لاَ يَا رَبِّ وَلٰكِنْ اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجُوْعُ يَوْمًا فَاِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ اِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَاِذَا شَبِعْتُ حَمِدْتُكَ وَشَكَرْتُكَ * (رواه احمد والترمذى)

৪৮। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার কাছে এ প্রস্তাব রাখলেন যে, তিনি আমার জন্য মক্কার প্রান্তরকে সোনা বানিয়ে দেবেন। (অর্থাৎ, তুমি যদি সম্পদশালী হতে চাও, তাহলে আমি মক্কার প্রান্তরকে সোনা দিয়ে ভরে দেব।) আমি বললাম, হে আমার রব! আমি এটা চাই না; বরং আমি এক দিন পেট ভরে আহার করব, আর এক দিন উপোস করব। যখন আমার ক্ষুধা

লাগবে, তখন আপনাকে স্মরণ করব এবং কান্নাকাটি করব, আর যখন পেট ভরে খাব, তখন আপনার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করব। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভাব-অনটনের যে জীবন কাটিয়েছেন এটা তিনি নিজেই পছন্দ করে নিয়েছিলেন এবং নিজের প্রতিপালকের কাছ থেকে তিনি এটা চেয়ে নিয়েছিলেন। তাই এটা দারিদ্র্য নয়; বরং দুনিয়ার প্রতি ইচ্ছাকৃত নির্লিপ্ততা।

(হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে পৃথক কিছু হাদীস একটু পরেই পৃথক শিরোনামে আনা হবে।)

সবচেয়ে বড় ঈর্ষণীয় ব্যক্তি

(٤٩) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَغْبَطُ اَوْلِيَائِيْ عِنْدِىْ لَمُؤْمِنٌ خَفِيْفُ الْحَاذِ ذُوْ حَظٍّ مِنَ الصَّلٰوةِ اَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهٖ وَاَطَاعَهٗ فِى السِّرِّ وَكَانَ غَامِضًا فِى النَّاسِ لَايُشَارُ اِلَيْهِ بِالْاَصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهٗ كَفَافًا فَصَبَرَ عَلٰى ذٰلِكَ ثُمَّ نَقَدَ بِيَدِهٖ فَقَالَ عُجِّلَتْ مَنِيَّتُهٗ قَلَّتْ بَوَاكِيْهِ قَلَّ تُرَاثُهٗ *

(رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

৪৯। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমার বন্ধুদের মধ্যে আমার কাছে সবচেয়ে ঈর্ষণীয় ব্যক্তি ঐ মু'মিন বান্দা, যার বোঝা খুবই হাল্কা, (অর্থাৎ, দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ ও সন্তানাদি কম,) নামাযে যার বিরাট অংশ রয়েছে, আপন প্রতিপালকের এবাদত সুন্দরভাবে এবং এহসান সহকারে করে যায়, গোপনেও আল্লাহ্র আনুগত্য করে যায় এবং মানুষের কাছে অপরিচিত হয়ে থাকতে চায়। তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয় না। তার রিযিকও প্রয়োজন পরিমাণ এবং এতেই সে সন্তুষ্ট। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত দ্বারা তুড়ি মেরে বললেন ঃ এ অবস্থায় হঠাৎ তার মৃত্যু এসে গেল। তার জন্য ক্রন্দনকারীণীও কম দেখা গেল এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদও সামান্যই পাওয়া গেল। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর মর্ম এই যে, যদিও আমার বন্ধুদের এবং আল্লাহ্র প্রিয়পাত্রদের অবস্থা ও রং বিভিন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঈর্ষণীয় জীবনের অধিকারী হচ্ছে ঐসব ঈমানদার বান্দারা, যাদের অবস্থা এই যে, তাদের দুনিয়ার জীবন-উপকরণ এবং সম্পদ ও পোষ্য কম, কিন্তু নামায ও অন্যান্য এবাদতে তাদের অংশ উল্লেখযোগ্য। এতদসত্ত্বেও তারা এমন অপরিচিত ও অখ্যাত যে, তাদের চলাফেরার সময় কেউ তাদের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে একথা বলে না যে, ইনি অমুক বুযুর্গ বা অমুক সাহেব। তাদের জীবিকা কেবল জীবন ধারণের মত, কিন্তু তারা এতে অন্তর থেকেই সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। যখন মৃত্যুর সময় এসে গেল, তখন একেবারে সহজে বিদায়। তাদের পশ্চাতে না থাকে প্রচুর সম্পদ, না থাকে আসবাবপত্র, বাড়ী-ঘর ও বাগান-খামার বন্টনের ঝামেলা, আর না দেখা যায় তাদের উপর ক্রন্দনকারীণী মহিলাদের ভীড়।

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র এসব বান্দাদের জীবন খুবই ঈর্ষণীয়। আর আল্লাহ্র শোকর যে, এ ধরনের জীবনের অধিকারী মানুষ থেকে আমাদের এ পৃথিবী এখনও খালি নয়।

সম্পদাকাঙ্ক্ষী স্ত্রীকে আবুদ্দারদা (রাঃ) যে উত্তর দিয়েছিলেন

(٥٠) عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ قُلْتُ لِاَبِي الدَّرْدَاءِ مَالَكَ لَا تَطْلُبُ كَمَا يَطْلُبُ فُلَانٌ فَقَالَ اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَمَامَكُمْ عَقَبَةً كَئُوْدًا لَا يَجُوْزُهَا الْمُثْقَلُوْنَ فَاُحِبُّ اَنْ اَتَخَفَّفَ لِتِلْكَ الْعَقَبَةِ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৫০। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ)-এর স্ত্রী উম্মে দারদা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবুদ্দারদাকে বললাম, কি ব্যাপার, আপনি অর্থ ও পদ কামনা করেন না, যেরূপ অমুক অমুক করে থাকে? আবুদ্দারদা তখন বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের সামনে একটি কঠিন গিরিপথ রয়েছে, যা অতিরিক্ত ভারবাহীরা সহজে অতিক্রম করতে পারবে না। তাই আমি এ গিরিপথ সহজে অতিক্রম করার জন্য হাল্কা-পাতলা থাকাটাই পছন্দ করি। (এ জন্যই আমি অর্থ ও পদের আকাঙ্ক্ষা করি না।) —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ পর্যায়ে এবং তাঁর পরে খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ-সম্পদ আসত এবং সাহায্যপ্রার্থী ও অভাবীদের মধ্যে তা বন্টন করে দেওয়া হত। অনুরূপভাবে অনেক মানুষকে বিশেষ কাজ ও পদে নিয়োগ দান করা হত এবং তাদেরকে এসব দায়িত্ব পালনের বিনিময়ে ভাতাও দেওয়া হত। এর ফলে তাদের সংসার চালানো সহজ হয়ে যেত। কিন্তু কোন কোন সাহাবী ঐ সময়েও দারিদ্র্যের জীবনকেই নিজেদের জন্য পছন্দ করতেন, যাদের মধ্যে আবুদ্দারদাও ছিলেন একজন। তিনি আখেরাতের হিসাব-নিকাশ এবং হাশরের ময়দানের কঠিন অবস্থা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এটাই পছন্দ করতেন যে, দুনিয়া থেকে যথাসম্ভব কম ও সামান্য অংশ গ্রহণ করাই ভাল এবং কোন রকমে জীবন কাটিয়ে দিতে পারলেই হল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলে দিয়েছিলেন যে, আখেরাতের কঠিন ঘাঁটি ও গিরিপথ তারাই সহজে অতিক্রম করে যেতে পারবে, যারা দুনিয়ার জীবনে হাল্কা-পাতলা থাকে। আর যেসব মানুষ দুনিয়াতে নিজেদের উপর বেশী বোঝা চাপিয়ে নেবে, তারা সহজে ঐ ঘাঁটি ও গিরিপথ পার হয়ে যেতে পারবে না।

মৃত্যু এবং দারিদ্র্যে কল্যাণের দিক

(٥١) عَنْ مَحْمُوْدِبْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اثْنَانِ يَكْرَهُهُمَا ابْنُ اٰدَمَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَالْمَوْتُ خَيْرٌ لِّلْمُؤْمِنِ مِنَ الْفِتْنَةِ وَيَكْرَهُ قِلَّةَ الْمَالِ وَقِلَّةُ الْمَالِ اَقَلُّ لِلْحِسَابِ * (رواه احمد)

৫১। মাহমূদ ইবনে লবীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি জিনিস মানুষ অপছন্দ করে, (অথচ এগুলোর মধ্যে তার জন্য প্রভূত কল্যাণ রয়েছে।) (১) মানুষ মৃত্যুকে অপছন্দ করে, অথচ মু'মিনের জন্য ফেতনায় নিপতিত হওয়ার

চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়। (২) সে সম্পদের স্বল্পতা ও অপর্যাপ্ততা অপছন্দ করে, অথচ সম্পদের স্বল্পতা আখেরাতের হিসাব-নিকাশকে সংক্ষিপ্ত ও হাল্কা করে দেয়। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ বাস্তবতা এটাই যে, প্রত্যেক মানুষ মৃত্যু নিয়ে এবং দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন নিয়ে উৎকণ্ঠিত থাকে এবং এসব থেকে বাঁচতে চায়। অথচ মৃত্যু এ দৃষ্টিতে বিরাট নেয়ামত যে, মৃত্যুর পর মানুষ দ্বীনবিধ্বংসী ফেতনাসমূহ থেকে নিরাপদ হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অর্থ-সম্পদের স্বল্পতাও এ দৃষ্টিতে বড় নেয়ামত যে, সহায়-সম্বলহীন ও গরীব লোকদেরকে আখেরাতে খুব সংক্ষিপ্ত হিসাব দিতে হবে এবং তারা হিসাব-নিকাশের কঠিন পর্যায় থেকে খুব দ্রুত এবং সহজে পার পেয়ে যাবে।

মানুষ যখন অভাব-অনটনের সম্মুখীন হয়ে যায় অথবা কোন ঘনিষ্ঠ আপনজনের মৃত্যুর আঘাত তাকে ব্যথিত করে, তখন সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরনের হাদীস দ্বারা অন্তরে বিরাট সান্ত্বনা ও স্বস্তি লাভ করতে পারে।

সওয়াল-বিমুখ পোষ্যধারী ও গরীব বান্দা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র

(৫২) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَعَفِّفَ اَبَا الْعِيَالِ * (رواه ابن ماجه)

৫২। ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ঐ মু'মিন বান্দাকে খুব ভালবাসেন, যে দরিদ্র, সাত্ত্বিক ও আত্মমর্যাদাশীল, (অর্থাৎ, অবৈধ পন্থায় পয়সা উপার্জন করা এবং অন্যের কাছে নিজের প্রয়োজনের কথা ব্যক্ত করা থেকে বেঁচে থাকে,) এবং পরিবারের বোঝা বহনকারী। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি দারিদ্র্য ও অভাব-অনটন সত্ত্বেও হারাম এবং সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে এবং নিজের অভাব ও কষ্টের কথা কারো কাছে প্রকাশও করে না, সে বড়ই মহৎপ্রাণ ও আল্লাহ্র একান্ত প্রিয় বান্দা।

আল্লাহ্র যেসব বান্দা এ দুনিয়াতে অভাব-অনটন ও আর্থিক কষ্টে নিপতিত, তারা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব হাদীস থেকে সান্ত্বনা ও শিক্ষা লাভ করত এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে আপন প্রিয়তম বান্দা (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মত যে দরিদ্রতা ও অভাবের জীবন দান করেছেন, এটাকে যদি তারা নিজেদের জন্য নেয়ামত মনে করে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিত, তাহলে দারিদ্র্য ও অভাব-অনটনের এ কষ্টই তাদের জন্য শান্তি ও সুখের উপকরণ হয়ে যেত।

যে ব্যক্তি নিজের ক্ষুধা ও অভাবের কথা মানুষ থেকে গোপন রাখে

(৫৩) عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَاعَ اَوْ احْتَاجَ فَكَتَمَهُ النَّاسَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اَنْ يَّرْزُقَهُ رِزْقَ سَنَةٍ مِّنْ حَلَالٍ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৫৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ক্ষুধার শিকার হয়ে যায় অথবা অন্য কোন অভাবে পড়ে যায়

এবং মানুষ থেকে এটা গোপন রাখে (অর্থাৎ, মানুষের কাছে এটা প্রকাশ করে তাদের কাছে হাত বাড়ায় না,) আল্লাহ্ তা'আলা আপন জিম্মায় তাকে এক বছরের হালাল রিযিক দান করে থাকেন। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ 'আল্লাহ্র জিম্মায়' কথাটির মর্ম এই যে, তিনি আপন দয়া ও অনুগ্রহে এ নীতি নির্ধারণ করে নিয়েছেন। আল্লাহ্র যে কোন বান্দা আল্লাহ্র এ প্রতিশ্রুতির উপর এবং তাঁর অসীম দয়ার উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা সহকারে এর পরীক্ষা করবে, ইনশাআল্লাহ্ সে নিজ চোখে এর বাস্তবতা ও প্রতিফলন দেখতে পাবে।

যুহ্দ তথা দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততা ও এর পুরস্কার

যুহ্দ শব্দের আভিধানিক অর্থ কোন জিনিসের প্রতি অনাসক্ত হওয়া। আর দ্বীনের বিশেষ পরিভাষায় আখেরাতের খাতিরে দুনিয়ার স্বাদ-আনন্দের বস্তুসমূহ থেকে অনাসক্ত হয়ে যাওয়া এবং ভোগ-বিলাসের জীবন বর্জন করাকে যুহ্দ বলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের বাস্তব কর্ম দ্বারা এবং বিভিন্ন বক্তব্য ও বাণী দ্বারাও নিজ উম্মতকে যুহ্দ অবলম্বনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন এবং এর পার্থিব ও অপার্থিব অনেক পুরস্কার ও সুফল বর্ণনা করেছেন। নিম্নে এ ধরনের কিছু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

দুনিয়াবিমুখ হলে আল্লাহ্ এবং মানুষের ভালবাসার পাত্র হওয়া যায়

(٥٤) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ دُلَّنِيْ عَلٰى عَمَلٍ اِذَا اَنَا عَمِلْتُهُ اَحَبَّنِيَ اللّٰهُ وَاَحَبَّنِيَ النَّاسُ قَالَ اِزْهَدْ فِى الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللّٰهُ وَازْهَدْ فِيْ مَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ *

(رواه الترمذى وابن ماجه)

৫৪। হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন কোন কাজের কথা বলে দিন, যা করলে আল্লাহ্ও আমাকে ভালবাসবেন এবং মানুষও আমাকে ভালবাসবে। তিনি উত্তরে বললেন ঃ তুমি দুনিয়াবিমুখ হয়ে যাও, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসবেন। আর মানুষের কাছে যে জিনিস রয়েছে, (অর্থাৎ, সম্পদ ও পদমর্যাদা) এগুলো থেকেও মুখ ফিরিয়ে নাও, মানুষ তোমাকে ভালবাসবে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ এটা বাস্তব সত্য যে, দুনিয়ার ভালবাসা ও এর চাহিদাই মানুষকে দিয়ে এমন সব কর্ম করিয়ে থাকে, যার দরুন সে আল্লাহ্র ভালবাসার যোগ্য থাকে না। এ জন্য আল্লাহ্র ভালবাসা লাভের পথ এটাই যে, মানুষের অন্তরে দুনিয়ার চাহিদা ও এর আকর্ষণ থাকবে না। যখন দুনিয়ার ভালবাসা অন্তর থেকে বের হয়ে যাবে, তখন এ অন্তরে আল্লাহ্র ভালবাসা স্থান লাভ করবে। তারপর আল্লাহ্র আনুগত্য এমন নির্ভেজাল পর্যায়ে পৌঁছে যাবে যে, সেই বান্দা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হয়ে যাবে।

অনুরূপভাবে যখন কোন বান্দা সম্পর্কে মানুষ সাধারণভাবে এ কথা জেনে নেবে যে, এ লোকটা আমাদের কোন জিনিসে ভাগ বসাতে চায় না। অর্থাৎ, সে অর্থ-সম্পদেরও আকাঙ্ক্ষী নয় এবং কোন পদের জন্যও লালায়িত নয়, তখন মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাকে ভালবাসবে।

শিক্ষা ঃ যুহ্দ তথা দুনিয়ার প্রতি অনীহার ব্যাপারে এ কথাটি মনে রাখতে হবে যে, যার জন্য দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও আনন্দ লাভের সুযোগই নেই এবং এ অপারগতার কারণে সে দুনিয়াতে আয়েসী জীবন যাপন করে না, (যুহ্দের মন-মানসিকতা না থাকলে কেবল অপারগতার দরুন তাকে যাহেদ বলা হবে না।) এমতাবস্থায় সে যাহেদ নয়। দুনিয়াবিমুখ যাহেদ হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার সামনে দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের উপকরণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সে এগুলোর প্রতি মন লাগায় না এবং বিলাসী জীবন যাপন করে না।

এক ব্যক্তি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারককে 'যাহেদ' বলে সম্বোধন করলে তিনি বলেছিলেন ঃ যাহেদ তো ছিলেন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আযীয। কেননা, যুগের খলীফা হওয়ার কারণে যেন দুনিয়া তাঁর পদতলে ছুটে এসেছিল; কিন্তু তিনি সেখান থেকে কোন অংশ নিলেন না; বরং এর প্রতি বিমুখ হয়েই রইলেন।

দুনিয়াবিমুখ লোকদের সাহচর্য অবলম্বন কর

(٥٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبِىْ خَلاَّدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَأَيْتُمُ الْعَبْدَ يُعْطٰى زُهْدًا فِى الدُّنْيَا وَ قِلَّةَ مَنْطِقٍ فَاقْتَرِبُوْا مِنْهُ فَاِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةَ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৫৫। হযরত আবূ হুরায়রা ও আবূ খাল্লাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন এমন বান্দাকে দেখবে, যে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত ও মিতভাষী, তখন তোমরা তার সান্নিধ্য অবলম্বন কর। কেননা, তাকে হেকমত তথা বিশেষ প্রজ্ঞা দান করা হয়েছে। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ এখানে হেকমত বা বিশেষ প্রজ্ঞা দানের অর্থ এই যে, সে বাস্তবতাকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করে এবং তার মুখ দিয়ে ঐসব কথাই বের হয়, যা সঠিক ও উপকারী। এজন্য তার সাহচর্য মানুষের জীবনে বিরাট প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। কুরআন করীমে হেকমত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ যাকে হেকমত দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণ প্রাপ্ত হয়।

আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যাহেদ বান্দাদের নগদ পুরস্কার

(٥٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَازَهِدَ عَبْدٌ فِى الدُّنْيَا اِلَّا اَنْبَتَ اللّٰهُ الْحِكْمَةَ فِىْ قَلْبِهٖ وَاَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهٗ وَبَصَّرَهٗ عَيْبَ الدُّنْيَا وَدَاءَهَا وَدَوَاءَهَا وَاَخْرَجَهٗ مِنْهَا سَالِمًا اِلٰى دَارِ السَّلاَمِ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৫৬। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন বান্দা দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত হয়ে থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তার অন্তরে হেকমত ও সূক্ষ্মজ্ঞান উৎপন্ন করে দেন এবং তার মুখ দিয়ে এটা প্রকাশ করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তার চোখের সামনে দুনিয়ার দোষ-ত্রুটি, এর রোগ-ব্যাধি এবং এগুলো থেকে উত্তরণের পথ তুলে ধরেন। আর তাকে দুনিয়া থেকে নিরাপদে বের করে জান্নাতে নিয়ে যান। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বের হাদীস দ্বারাও জানা গিয়েছিল যে, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি যুহ্দ অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তাকে হেকমত ও তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়। হযরত আবূ যর গেফারীর এ হাদীস দ্বারা ঐ হাদীসের আরো বিস্তারিত মর্ম ও ব্যাখ্যা জানা গেল।

এ হাদীসে "আল্লাহ্ তার অন্তরে হেকমত উৎপন্ন করে দেন" বলার পর যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে, সেটা যেন এ হেকমতেরই বিস্তারিত ব্যাখ্যা। মর্ম এই যে, কৃচ্ছ্রতা অবলম্বনকারী ও দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্ত লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ দুনিয়াতেই নগদ প্রতিদান এই দেওয়া হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরে হেকমত ও মা'রেফাতের বীজ ঢেলে দেন, যা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহে অংকুরিত হয়ে দিন দিন বিকশিত হতে থাকে। তারপর এর ফল এ হয় যে, তাদের মুখ দিয়ে হেকমতেরই ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয় এবং দুনিয়ার রোগ-ব্যাধি ও দোষ-ত্রুটি তারা যেন নিজের চোখে দেখতে থাকে। তারপর এগুলোর নিরাময় ও চিকিৎসার ব্যাপারেও তারা দূরদর্শিতা লাভে ধন্য হয়। তাদের দ্বিতীয় পুরস্কার এই লাভ হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে ঈমান ও তাক্ওয়ার নিরাপত্তার সাথে এ দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেন এবং এ ক্ষণস্থায়ী জগত থেকে চিরস্থায়ী জগত তথা শান্তির আবাস জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেন।

আল্লাহ্র প্রিয়পাত্ররা ভোগ-বিলাসের জীবন কাটায় না

(٥٧) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ بِهِ اِلَى الْيَمَنِ قَالَ اِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَاِنَّ عِبَادَ اللّٰهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ * (رواه احمد)

৫৭। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে ইয়ামন পাঠিয়েছিলেন, তখন বলেছিলেন ঃ হে মো'আয! ভোগ-বিলাসপূর্ণ জীবন থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, আল্লাহ্র খাঁটি বান্দারা আরামপ্রিয় এবং ভোগ-বিলাসী হয় না। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ দুনিয়াতে আরাম ও সাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করা যদিও হারাম ও নাজায়েয নয়; কিন্তু আল্লাহ্র খাছ বান্দাদের মর্যাদার দাবী এটাই যে, তারা দুনিয়াতে বিলাসী জীবন যাপন করবে না।

ইসলামের জন্য কারো অন্তর খুলে গেলে তার জীবনে দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি এবং আখেরাতের চিন্তা এসে যায়

(٥٨) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ النُّوْرَ اِذَا دَخَلَ الصَّدْرَ انْفَسَحَ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِتِلْكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهٖ قَالَ نَعَمْ اَلتَّجَافِيْ مِنْ دَارِ الْغُرُوْرِ وَالْاِنَابَةُ اِلٰى دَارِ الْخُلُوْدِ وَالْاِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُوْلِهٖ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন যার মর্ম এই ঃ আল্লাহ্ যাকে হেদায়াত ও পথপ্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আয়াতটি তেলাওয়াত

করার পর এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বললেন ঃ ঈমানের নূর কারো অন্তরে প্রবেশ করলে এ অন্তর প্রশস্ত হয়ে যায়। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কোন লক্ষণ আছে কি, যার দ্বারা এটা বুঝা যায় ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, এর লক্ষণ হচ্ছে, প্রতারণার বাসস্থান (অর্থাৎ, দুনিয়ার আনন্দ কোলাহল) থেকে মন উঠে যাওয়া, আখেরাতের চিরস্থায়ী বাসস্থানের প্রতি অনুরাগী হওয়া এবং মৃত্যুর পূর্বেই এর প্রস্তুতিতে লেগে যাওয়া। (অর্থাৎ, তওবা-এস্তেগফার, গুনাহ্ বর্জন এবং এবাদতের আধিক্যের মাধ্যমে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা।) —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর যে বান্দাকে বন্দেগীর বিশেষ স্তরে উন্নীত করে ধন্য করতে চান, তার অন্তরে একটা বিশেষ নূর এবং আল্লাহ্মুখী আবেগ সৃষ্টি করে দেন, যার দ্বারা তার অন্তর খাঁটি বান্দাসুলভ জীবন গ্রহণের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে তার জীবনে দুনিয়াবিমুখতা, আখেরাত-চিন্তা, আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত এবং জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা ও এর প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। এসব লক্ষণাদি দ্বারা এ বিষয়টি জেনে নেওয়া যায় যে, এ বান্দার ভাগ্যে ঐ বিশেষ নূর জুটে গিয়েছে এবং ঐশী প্রেরণা তার অন্তরে স্থান করে নিয়েছে।

এ উম্মতের সফলতা ও কল্যাণের মূল হচ্ছে ইয়াকীন ও দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি

(٥٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَوَّلُ صَلَاحِ هٰذِهِ الْاُمَّةِ الْيَقِيْنُ وَالزُّهْدُ وَاَوَّلُ فَسَادِهَا الْبُخْلُ وَالْاَمَلُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৫৯। হযরত 'আমর ইবনে শু'আইব সূত্রে তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এ উম্মতের কল্যাণের মূল হচ্ছে আল্লাহ্র প্রতি ইয়াকীন ও দুনিয়ার প্রতি অনীহা। আর তাদের অনিষ্টের মূল হচ্ছে কৃপণতা ও দীর্ঘ আশা। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, এ উম্মতের কল্যাণ, সাফল্য ও সার্বিক উন্নতির মূলভিত্তি ছিল তাদের দু'টি গুণ ও বৈশিষ্ট্য ঃ (১) আল্লাহ্র প্রতি ইয়াকীন, (২) যুহ্দ ও দুনিয়ার প্রতি নিরাসক্তি। আর যখন এ উম্মতের মধ্যে অধঃপতন শুরু হবে, তখন তাদের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম এ দু'টি গুণ ও বৈশিষ্ট্য বিদায় নিয়ে যাবে এবং এর বিপরীত দু'টি বস্তু অর্থাৎ, কৃপণতা ও দুনিয়ায় বেশী দিন থাকার আকাঙ্ক্ষা এসে যাবে। তারপর সব ধরনের অনিষ্ট ও মন্দের অব্যাহত ধারা শুরু হয়ে যাবে এবং উম্মত দিন দিন অধঃপতনের দিকেই এগিয়ে যাবে।

হাদীস ব্যাখ্যাতাগণ লিখেছেন যে, এ হাদীসে উল্লেখিত ইয়াকীন শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ বাস্তবতার ইয়াকীন ও বিশ্বাস, এ দুনিয়াতে যা কিছু কারো ভাগ্যে জুটে থাকে অথবা ভাল-মন্দ যে কোন অবস্থা কারো উপর এসে থাকে, সেটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এবং তাঁরই ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তে এসে থাকে।

অনুরূপভাবে যুহ্দের অর্থও আগেই বলা হয়েছে যে, এর মর্ম হচ্ছে দুনিয়ার প্রতি মন না লাগানো এবং এর ক্ষণস্থায়ী সুখ-সম্ভোগকে নিজের লক্ষ্য স্থির করে না নেওয়া। এ ইয়াকীন ও যুহ্দের অনিবার্য ফল এই হয় যে, এ দু'টি জিনিস লাভ হওয়ার পর মানুষ আল্লাহ্র পথে এবং যে কোন সুমহান উদ্দেশ্যে নিজের জীবন ও সম্পদ বিলিয়ে দিতে মোটেই কার্পণ্য করে না। অর্থাৎ,

ইয়াকীন ও যুহ্দের অধিকারী মানুষের জন্য কোন মহৎ উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ্‌র পথে অপরিমেয় অর্থ সম্পদ ব্যয় করা এবং যে কোন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। আর এটাই হচ্ছে মু'মিনের সকল উন্নতি ও সাফল্যের চাবিকাঠি।

পক্ষান্তরে মু'মিন যখন এসব বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী থেকে শূন্য হয়ে যায় অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র উপর ইয়াকীন রাখার স্থলে যখন তার সম্পদের উপর ইয়াকীন এসে যায় এবং সে বুঝতে শুরু করে যে, সম্পদ যদি আমার হাতে থাকে, তাহলে আমার জীবন সুখময় হবে আর সম্পদ না থাকলে আমি কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হব, তাহলে অবশ্যই তার মধ্যে কৃপণতা এসে যাবে। এমনিভাবে যখন যুহ্দের গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে অনুপস্থিত থাকবে এবং দুনিয়াই তার লক্ষ্য ও কামনার বস্তুতে পরিণত হয়ে যাবে, তখন এ দুনিয়ায় যতদূর সম্ভব বেশী দিন থাকার আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই তার অন্তরে সৃষ্টি হয়ে যাবে, যাকে হাদীসে "আমাল" তথা দীর্ঘ জীবনের আশা বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর একথা স্পষ্ট যে, কৃপণতা ও দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর মু'মিন তার অবস্থান ও মর্যাদার আসন থেকে অধঃপতনের দিকেই আসতে থাকবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং এতে উম্মতের জন্য বিশেষ পথনির্দেশ এই রয়েছে যে, উম্মতের কল্যাণ ও সফলতার জন্য একান্ত জরুরী বিষয় হচ্ছে, তাদের মধ্যে ইয়াকীন ও যুহ্দের গুণ ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির এবং এই সব ঈমানী গুণাবলীর সংরক্ষণের চিন্তা-ভাবনা এবং চেষ্টা-সাধনা পূর্ণ মাত্রায় করে যেতে হবে এবং কৃপণতা ও দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষার মত ঈমান-বিরোধী বিষয় থেকে নিজেদের অন্তরকে হেফাযত করতে হবে। কেননা, উম্মতের কল্যাণ ও সাফল্য এর সাথে জড়িত।

প্রকৃত যুহ্দ কি ?

(٦٠) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلزَّهَادَةُ فِى الدُّنْيَا لَيْسَتْ بِتَحْرِيْمِ الْحَلَالِ وَلَا بِاِضَاعَةِ الْمَالِ وَلٰكِنَّ الزَّهَادَةَ فِى الدُّنْيَا اَنْ لَا تَكُوْنَ بِمَا فِىْ يَدَيْكَ اَوْثَقَ مِمَّا فِىْ يَدَىِ اللّٰهِ وَاَنْ تَكُوْنَ فِىْ ثَوَابِ الْمُصِيْبَةِ اِذَا اَنْتَ اُصِبْتَ بِهَا اَرْغَبَ فِيْهَا لَوْ اَنَّهَا اُبْقِيَتْ لَكَ * (رواه الترمذى وابن ماجه)

৬০। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততার অর্থ হালালকে নিজের উপর হারাম করে নেওয়া অথবা সম্পদ বিনষ্ট করে দেওয়ার নাম নয়; বরং যুহ্দ ও দুনিয়ার প্রতি নির্লিপ্ততার আসল মাপকাঠি ও এর দাবী হচ্ছে এই যে, তোমার নিজের হাতে যা রয়েছে, এর চেয়ে তোমার বেশী নির্ভরশীলতা থাকবে ঐ জিনিসের উপর, যা আল্লাহ্‌র হাতে রয়েছে। আর যখন তোমার উপর কোন বিপদ-মুসীবত এসে যায়, তখন সে বিপদ তোমার উপর না আসার আকাঙ্ক্ষার পরকালীন বিনিময় ও বিপদের প্রতিদানের প্রত্যাশা তোমার নিকট অধিক প্রিয় হয়ে যাওয়া। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ অনেক মানুষ অজ্ঞতার কারণে যুহ্দ ও দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তির অর্থ এই মনে করে যে, মানুষ দুনিয়ার সকল নেয়ামত, আরাম ও স্বাদ উপভোগকে নিজের উপর হারাম করে

নেবে। অর্থাৎ, মানুষ যেন সুস্বাদু খাবার না খায়, ঠান্ডা পানি পান না করে, ভাল কাপড় পরিধান না করে এবং কখনো নরম বিছানায় না ঘুমায়। আর কোন স্থান থেকে যদি কিছু এসে যায়, তাহলে সেটাও যেন নিজের কাছে না রাখে, বরং দ্রুত সেটা অন্য কোথাও দিয়ে ফেলে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীস দ্বারা ঐ ভ্রান্ত ধারণারই অপনোদন করেছেন যে, যুহ্‌দের অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের যেসব নেয়ামতের ব্যবহার বান্দাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন, মানুষ সেগুলো নিজেদের উপর হারাম করে নেবে, টাকা-পয়সা হাতে আসলে সেগুলো নষ্ট করে ফেলবে; বরং যুহ্‌দের আসল মাপকাঠি ও এর দাবী হচ্ছে এই যে, যা কিছু এ দুনিয়ায় নিজের হাতে রয়েছে, সেটাকে ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী মনে করে এর উপর ভরসা ও নির্ভর করবে না। অপর দিকে আল্লাহ্ তা'আলার অফুরন্ত গায়েবী ভান্ডার ও তাঁর অনুগ্রহের উপর অধিক নির্ভর ও ভরসা রাখবে।

যুহ্‌দের দ্বিতীয় মাপকাঠি ও এর লক্ষণ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলার হুকুমে যখন বান্দার উপর কোন দুঃখ ও মুসীবত এসে যায়, তখন এর পরকালীন প্রতিদান ও সওয়াবের আকাঙ্ক্ষা তার অন্তরে এ মুসীবত না আসার আকাঙ্ক্ষার চেয়ে বেশী থাকবে। অর্থাৎ, বিপদের সময় তার অন্তর একথা বলবে না যে, হায়! এ দুঃখ-মুসীবত যদি আমার উপর না আসত; বরং এ স্থলে তার অন্তরের অনুভূতি এ থাকবে যে, আখেরাতে আমি এ দুঃখ-মুসীবতের প্রতিদান পেয়ে যাব এবং ইন্‌শাআল্লাহ্ এ দুঃখ না আসার চেয়ে আসাটাই আমার জন্য হাজার গুণ উত্তম প্রতীয়মান হবে। আর কথাটি খুবই স্পষ্ট যে, মানুষের মধ্যে এ অবস্থাটি তখনই সৃষ্টি হতে পারে, যখন তার কাছে দুনিয়ার শান্তির চেয়ে আখেরাতের শান্তির চিন্তা বেশী থাকে। বস্তুত এটাই হচ্ছে যুহ্‌দের মূল ভিত্তি।

এ হাদীস দ্বারা কেউ যেন ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয় যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদেরকে এ দুনিয়াতে সুখ-শান্তির স্থলে কষ্ট ও বিপদের আকাঙ্ক্ষা এবং আল্লাহ্ তা'আলার নিকট এর জন্য দো'আ করতে হবে। অন্যান্য হাদীসে এ থেকে স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং অনেক বিশুদ্ধ রেওয়ায়াতে একথা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সর্বদা খুব তাকীদের সাথে নির্দেশ দিতেন যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে শান্তি ও কল্যাণের দো'আ করতে থাক। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রীতি ও অভ্যাসও এই ছিল।

অতএব, হযরত আবূ যর (রাঃ)-এর উপরের এ হাদীসের উদ্দেশ্য কখনো এটা নয় যে, বান্দা এ দুনিয়াতে বিপদ ও কষ্টের জন্য দো'আ করবে; বরং এর মর্ম ও দাবী কেবল এই যে, আল্লাহ্‌র হুকুমে যখন বান্দার উপর কোন বিপদ ও কষ্ট এসে যায়, তখন মু'মিনের শান এবং যুহ্‌দের দাবী এটাই যে, এ দুঃখ-মুসীবতের যে প্রতিদান ও সওয়াব আখেরাতে লাভ হবে, সেই প্রতিদান তার কাছে দুঃখ না আসার চেয়ে অধিক কাম্য ও প্রিয় হবে। এ দু'টি বিষয়ের পার্থক্য ভালভাবে বুঝে নেওয়া চাই।

✪✪✪

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর যুহ্দ

নিজের এবং আপনজনদের জন্য রাসূলুল্লাহ (সাঃ)
দারিদ্র্যকেই পছন্দ করতেন

(٦١) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاحْشُرْنِيْ فِيْ زُمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ * (رواه الترمذى والبيهقى فى شعب الايمان و رواه ابن ماجه عن ابى سعيد)

৬১। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দো'আ করতেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাকে মিসকীন অবস্থায় দুনিয়াতে বাঁচিয়ে রাখ, মিসকীন অবস্থায়ই মৃত্যুদান কর এবং মিসকীনদের দলে আমার হাশর কর। —তিরমিযী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে এ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব পেশ করা হয়েছিল যে, আপনি যদি চান, তাহলে মক্কার প্রান্তরকে আপনার জন্য সোনা দিয়ে ভরে দেব। তিনি তখন নিবেদন করেছিলেন যে, হে আমার প্রতিপালক! না, এটা আমি চাই না; বরং আমি তো এমন দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন চাই যে, একদিন আহার করব, আর একদিন অনাহারে থাকব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা-ভাবনা করেই নিজের জন্য দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন পছন্দ করেছিলেন এবং এটাই তাঁর বাস্তবদর্শী পবিত্র অন্তরের কামনা ছিল। আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সুউচ্চ অবস্থান ও পদমর্যাদা ছিল এবং যে মহান কাজ ও গুরুদায়িত্ব তাঁর সাথে সম্পৃক্ত ছিল, এর জন্য এ দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনই অধিক উপযোগী ও উত্তম ছিল।

আল্লাহ্ তা'আলা যদি অল্পেতুষ্টি, স্থৈর্য, সন্তোষ ও আত্ম নিবেদনের মত গুণাবলী দান করেন, তাহলে সাধারণ বান্দাদের জন্যও দ্বীনী ও পরকালীন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রাচুর্যময় জীবনের চাইতে দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনই উত্তম।

(٦٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اٰلِ مُحَمَّدٍ قُوْتًا وَّفِىْ رِوَايَةٍ كَفَافًا * (رواه البخارى ومسلم)

৬২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে দো'আ করলেন যে, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মদ-পরিবারকে কেবল প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকাই দান কর। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এখানে "প্রয়োজন পরিমাণ" জীবিকার দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, জীবিকা এতটুকু হোক; যার দ্বারা সংসারজীবন চলতে পারে। এমন অস্বচ্ছলতা নয় যে, ক্ষুধা ও অস্থিরতার কারণে নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজ-কর্মই আঞ্জাম দেওয়া যায় না এবং কারো সামনে সওয়াল ও ভিক্ষার হাত প্রসারিত করতে হয়। আর এমন স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্যও নয় যে, আগামী দিনের জন্যও সম্পদ জমিয়ে রাখা যায়। হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহ সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারাটি জীবন এভাবেই কেটেছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় তাঁর পরিবার-পরিজন কখনো একাধারে দু'দিন তৃপ্ত হয়ে খাননি

(٦٣) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا شَبِعَ اٰلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتّٰى قُبِضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * (رواه البخاری ومسلم)

৬৩। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজন যবের রুটি দিয়েও একাধারে দু'দিন পেট ভরেননি। আর এভাবেই তাঁকে দুনিয়া থেকে উঠিয়ে নেওয়া হয়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সারা জীবনেও এমনটি হয়নি যে, তাঁর পরিবার-পরিজন একাধারে দু'দিন অতি সাধারণ যবের রুটিও পেট ভরে খেয়েছেন, একদিন তৃপ্ত হয়ে খেয়ে থাকলে আরেক দিন উপোস রয়েছেন।

(٦٤) عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّهٗ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ شَاةٌ مَّصْلِيَّةٌ فَدَعَوْهُ فَاَبٰى اَنْ يَّاْكُلَ وَقَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيْرِ * (رواه البخاری)

৬৪। সাঈদ মাকবারী সূত্রে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, (যারা খাবারে ব্যস্ত ছিল এবং) তাদের সামনে একটি ভুনা ছাগল রাখা ছিল। তারা আবূ হুরায়রা (রাঃ)কে খাবারে শরীক হতে অনুরোধ করল, কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন এবং বললেন, (আমার জন্য এ খাবারে কি মজা থাকতে পারে, যেখানে আমি জানি যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দুনিয়া থেকে এ অবস্থায় বিদায় নিয়েছেন যে, যবের রুটি দিয়েও তিনি পেট পুরে খাননি। —বুখারী

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দুনিয়াতে যে কষ্ট স্বীকার করেছেন, তা অন্য কেউ করেনি

(٦٥) عَنْ اَنَسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ اُخِفْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُخَافُ اَحَدٌ وَلَقَدْ اُوْذِيْتُ فِى اللّٰهِ وَمَا يُؤْذٰى اَحَدٌ وَلَقَدْ اَتَتْ عَلَىَّ ثَلٰثُوْنَ مِنْ بَيْنِ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ وَمَالِىْ وَلِبِلَالٍ طَعَامٌ يَاْكُلُهٗ ذُوْ كَبِدٍ اِلَّا شَىْءٌ يُوَارِيْهِ اِبْطُ بِلَالٍ * (رواه الترمذی)

৬৫। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্‌র পথে আমাকে এত ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে যে, অন্য কাউকেই এতটুকু ভয় দেখানো হয়নি। আল্লাহ্‌র পথে আমাকে এমন নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে যে, অন্য কাউকে এতটুকু নির্যাতনের শিকার হতে হয়নি। আমার জীবনে এমন সময়ও অতিক্রান্ত হয়েছে যে, ত্রিশ দিন পর্যন্ত আমার ও বিলালের জন্য এমন কোন খাদ্য-সামগ্রী ছিল না, যা কোন প্রাণী আহার হিসাবে গ্রহণ করতে পারে, কেবল ঐ বস্তুটি ছাড়া, (যৎসামান্য খাদ্যবস্তু) যা বিলাল নিজের বগল-তলে চাপা দিয়ে রেখেছিল। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজের এ আত্মকাহিনী শুনিয়েছেন যে, দ্বীনের দাওয়াত ও আল্লাহ্‌র পয়গাম পৌঁছানোর ক্ষেত্রে আমাকে এমন এমন বিপদ ও কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে, শত্রুরা আমাকে এমন ভয়-ভীতি প্রদর্শন করেছে যে, আমি ছাড়া অন্য কেউ এ ভয় ও হুমকির সম্মুখীন হয়নি। আর আমি যখন তাদের হুমকি-ধমকিতে প্রভাবান্বিত হইনি; বরং দ্বীনের দাওয়াত দিতেই থাকলাম, তখন এ যালেমরা আমাকে এমন নির্যাতন করেছে এবং এমন কষ্ট দিয়েছে যে, আমি ছাড়া অন্য কেউই এ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়নি। আমি ক্ষুধার জ্বালাও এতটুকু সহ্য করেছি যে, একবার সারা মাসের ত্রিশ দিনই এ অবস্থায় কেটেছে যে, খাবার কোন জিনিসই ছিল না। কেবল বিলালের নিকট রক্ষিত যৎসামান্য খাদ্যের উপরই পুরা মাস আমাকে ও বিলালকে নির্ভর করতে হয়েছে।

দুই দুই মাস পর্যন্ত হুযূর (সাঃ)-এর চুলায় আগুন জ্বলত না

(٦٦) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ لِعُرْوَةَ ابْنَ اُخْتِيْ اِنْ كُنَّا لَنَنْظُرُ اِلَى الْهِلَالِ ثَلٰثَةَ اَهِلَّةٍ فِيْ شَهْرَيْنِ وَمَا اُوْقِدَتْ فِيْ اَبْيَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَارٌ فَقُلْتُ مَا كَانَ يُعَيِّشُكُمْ قَالَتْ اَلْاَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ اِلَّا اَنَّهُ قَدْ كَانَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِيْرَانٌ مِنَ الْاَنْصَارِ كَانَ لَهُمْ مَنَائِحُ وَكَانُوْا يَمْنَحُوْنَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسْقِيْنَاهُ * (رواه البخارى ومسلم)

৬৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি একবার উরওয়া ইবনে যুবায়েরকে বলেছিলেন ঃ ওহে আমার বোনের ছেলে! আমরা (নবী-পরিবারের লোকেরা এভাবে জীবন কাটাতাম যে,) কখনো কখনো একাধারে তিনটি চাঁদ দেখতাম, (অর্থাৎ, পূর্ণ দু'টি মাস অতিবাহিত হয়ে যেত,) অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরে চুলা জ্বলত না। উরওয়া বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে আপনাদেরকে কোন্ জিনিস বাঁচিয়ে রাখত? আয়েশা উত্তর দিলেন ঃ কেবল খেজুর এবং পানি। (এ দু'টির উপরই আমরা জীবন ধারণ করতাম।) তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কতিপয় আনসারী প্রতিবেশী ছিল, আর তাদের কাছে কিছু দুধেল পশু ছিল। তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু দুধ দিত, আর তিনি আমাদেরকেও সেখান থেকে পান করতে দিতেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, অভাব-অনটন ও দৈন্য এ পর্যায়ের ছিল যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের উপর দু' দু' মাস এমনভাবে অতিক্রান্ত হয়ে যেত যে, কোন

ধরনের সব্জি, এমনকি আগুনে সিদ্ধ করতে হয় এমন কোন জিনিসও ঘরে থাকত না। এ কারণে চুলা জ্বালানোর সুযোগই আসত না। কেবল খেজুর ও পানির উপর দিন কেটে যেত, অথবা প্রতিবেশীদের কোন বাড়ী থেকে দুধ হাদিয়া আসলে তা দিয়েই খাওয়ার কাজ সারতে হত।

নবী-পরিবারের একাধারে উপোস যাপন

(٦٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبِيْتُ اللَّيَالِىَ الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا هُوَ وَاَهْلُهُ لَايَجِدُوْنَ عَشَاءً وَاِنَّمَا كَانَ عَشَاءُهُمْ خُبْزُ الشَّعِيْرِ * (رواه الترمذى)

৬৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার একাধারে কয়েক রাত উপোস করেই কাটিয়ে দিতেন। কেননা, রাতে খাওয়ার মত কিছু তাঁদের থাকত না। আর (যখন রাতে খাবার খেতেন, তখন) তাঁদের সাধারণ খাবার হত যবের রুটি। —তিরমিযী

ইন্তিকালের সময় রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর লৌহবর্মটি এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক ছিল

(٦٨) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيٍّ بِثَلٰثِيْنَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ * (رواه البخارى)

৬৮। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন যে, তাঁর লৌহবর্মটি ত্রিশ সা' যবের বিনিময়ে এক ইয়াহুদীর কাছে বন্ধক রাখা ছিল। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের অধিকাংশ আলেমদের অনুসন্ধান ও মত এই যে, এক সা' প্রায় সাড়ে তিন সেরের সমান হয়। এ হিসাবে ত্রিশ সা' যব হয় প্রায় আড়াই মন।

হাদীসটির মর্ম এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনের একেবারে শেষ দিনগুলোতেও (যখন প্রায় সারা আরবের তিনি শাসকও ছিলেন) তাঁর পরিবারের জীবিকার এ অবস্থা ছিল যে, মদীনার এক ইয়াহুদীর নিকট তিনি নিজের মূল্যবান লৌহবর্মটি বন্ধক রেখে ত্রিশ সা' যব ধার নিয়েছিলেন।

মুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে এক ইয়াহুদীর নিকট থেকে কর্জ গ্রহণ করার কারণ

মদীনার মুসলমানদের মধ্যেও এমন একাধিক ব্যক্তি ছিলেন, যাদের নিকট থেকে এ ধরনের সামান্য ধার-কর্জ সবসময়ই নেওয়া যেত। এতদসত্ত্বেও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বাদ দিয়ে এক ইয়াহুদীর নিকট থেকে কেন এ কর্জ গ্রহণ করেলন ? এ প্রশ্নের কয়েকটি উত্তর হতে পারে ঃ (১) তিনি চাইতেন না যে, নিজের ভক্তদের মধ্য থেকে কেউ এ অবস্থা ও এ ধরনের প্রয়োজনের কথা জেনে নিক। কেননা, এমতাবস্থায় তারা কর্জ দেওয়ার স্থলে হাদিয়া ইত্যাদি দিয়ে তাঁর খেদমত করার চেষ্টা করত এবং এতে তাদের উপর এক ধরনের বোঝা ও চাপ এসে পড়ত। তাছাড়া এ অবস্থায় তাদের নিকট কর্জ চাওয়াতে এক ধরনের চাহিদা প্রকাশ ও প্রচ্ছন্ন আবেদন হয়ে যেত। (২) সম্ভবত দ্বিতীয় বড় কারণটি এ ছিল যে, তিনি এ সন্দেহ ও ধারণা সৃষ্টি হওয়া থেকে বেঁচে থাকতে চাইতেন যে, তাঁর মাধ্যমে

মু'মিনরা যে ঈমানের সম্পদ লাভ করেছে, এর বিনিময়ে তিনি দুনিয়ার সামান্যতম ও তুচ্ছাতিতুচ্ছ উপকার তথা স্বার্থও তাদের নিকট থেকে লাভ করতে চান। এ জন্য অপারগতা এবং চরম প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তিনি ধার কর্জও ভিন্ন সমাজের নিকট থেকে গ্রহণ করতে চাইতেন। (৩) সম্ভবত তৃতীয় কারণ এ ছিল যে, অমুসলিমদের সাথে লেন-দেন ও আদান-প্রদানের সম্পর্ক রাখলে হযরতের নিকট তাদের আসা-যাওয়া এবং মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টি হত। এতে এ রাস্তা খুলে যেত যে, তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং তাঁর চরিত্র-মাধুর্য দেখার এবং পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ লাভ করবে এবং ঈমান ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের সম্পদ লাভে তারাও ধন্য হবে।

এটা শুধু অনুমাননির্ভর কথা নয়; বরং বাস্তবেও এমন ফল প্রকাশ পেয়েছে। মেশকাত শরীফে ইমাম বায়হাকীর 'দালায়েলুন নবুওয়াত' গ্রন্থের বরাতে মদীনার এক ধনাঢ্য ইয়াহুদীর এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নিকট থেকে কিছু কর্জ গ্রহণ করেছিলেন। একবার সে তার পাওনার তাগাদা দিতে আসল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি আজ শূন্যহাত। এ জন্য তোমার ঋণ পরিশোধে আমি অপারগ। ইয়াহুদী বলল, আমি তো আজ না নিয়ে যাব না। এ বলে সে সেখানে বসে পড়ল আর এভাবেই সারা দিন চলে গেল এবং রাতও কেটে গেল। এর মধ্যে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ইয়াহুদীর উপস্থিতিতেই যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায আদায় করলেন, কিন্তু সে নিজের স্থান থেকে সরল না। কোন কোন সাহাবীর কাছে তার এ আচরণ খুবই খারাপ লাগল। তাই তাদের কেউ কেউ তাকে চলে যাওয়ার জন্য চাপ দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিষয়টি জানতে পারলেন, তখন বললেন ঃ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আমার প্রতি এ নির্দেশ রয়েছে যে, কোন চুক্তিবদ্ধ ব্যক্তির উপরে যুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়ি যেন না হয়। একথা শুনে ঐ সাহাবীগণ চুপ হয়ে গেলেন।

কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঐ ইয়াহুদী বলল ঃ আসলে আমি টাকার তাগাদা দেওয়ার জন্য আসিনি। আমি বরং দেখতে চেয়েছিলাম যে, তওরাতে আখেরী নবীর যেসব গুণাবলী ও লক্ষণাদি বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো আপনার মধ্যে আছে কিনা ? এখন আমি বাস্তবে তা দেখে নিয়েছি এবং আমার বিশ্বাস হয়ে গিয়েছে যে, আপনিই সেই প্রতিশ্রুত নবী। তারপর সে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে মুসলমান হয়ে গেল এবং নিজের সাকুল্য সম্পদ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে সমর্পণ করে দিয়ে বলল ঃ আমার সকল সম্পদ আপনার খেদমতে হাজির। এখন আপনি এর ব্যাপারে আল্লাহ্ নির্দেশিত পথে যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং যেখানে ইচ্ছা তা ব্যয় করতে পারেন। —মেশকাত শরীফ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর চরিত্র ও গুণাবলী অধ্যায়

প্রাচুর্যের জন্য দো'আ করার আবদার জানালে হযরত ওমরকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে উত্তর দিয়েছিলেন

(٦٩) عَنْ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلٰى رِمَالِ حَصِيْرٍ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ اَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ مُتَّكِئًا عَلٰى وِسَادَةٍ مِنْ اَدَمٍ حَشْوُهَا لِيْفٌ قُلْتُ يَا

رَسُوْلَ اللّٰهِ اُدْعُ اللّٰهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلٰى اُمَّتِكَ فَاِنَّ فَارِسَ وَالرُّوْمَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ فَقَالَ اَوَ فِيْ هٰذَا اَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ اُولٰئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِيْ رِوَايَةٍ اَمَا تَرْضٰى اَنْ تَكُوْنَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْاٰخِرَةُ * (رواه البخارى ومسلم)

৬৯। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে দেখলাম যে, তিনি খেজুর পাতার তৈরী একটি চাটাইয়ের উপর শুয়ে আছেন। তাঁর শরীর ও চাটাইয়ের মাঝে কোন বিছানাও ছিল না। ফলে এ চাটাই তাঁর দেহের পার্শ্বদেশে গভীর দাগের সৃষ্টি করে। এ সময় তিনি খেজুর গাছের আঁশ ভর্তি একটি চামড়ার বালিশে হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন। এ অবস্থা দেখে আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন, তিনি যেন আপনার উম্মতকে সচ্ছলতা দান করেন। কেননা, পারস্য ও রোমবাসীদেরকেও আল্লাহ্ তা'আলা সচ্ছলতা দিয়েছেন, অথচ তারা আল্লাহ্র এবাদতই করে না। তাঁর একথা শুনে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে খাত্তাব-পুত্র! তুমিও এ ধারণায় পড়ে আছ ? এরা তো ঐ সম্প্রদায়, (যাদেরকে খোদাবিমুখতা ও কুফরী জীবন যাপনের কারণে আখেরাতের নেয়ামতসমূহ থেকে বঞ্চিত করে দেওয়া হয়েছে, এজন্য) তাদের ভোগের উপকরণসমূহ এ দুনিয়াতেই নগদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি বললেন ঃ হে ওমর! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়ার সুখভোগ থাকুক, আর আমাদের জন্য থাকুক আখেরাতের শান্তি ? —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দারিদ্র্যপূর্ণ জীবন ও এর বিভিন্ন কষ্ট দেখে হযরত ওমর (রাঃ)-এর অন্তর খুবই ব্যথিত হল এবং এ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হল যে, আল্লাহ্ তা'আলা যদি ততটুকু সচ্ছলতা দান করতেন, যাতে নিজের চোখে এ কষ্ট দেখতে না হত। হযরত ওমর যেহেতু জানতেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের জন্য সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের দো'আ করবেন না। এজন্য তিনি নিবেদন করলেন যে, হুযূর! নিজের উম্মতের সচ্ছলতা ও প্রাচুর্যের জন্য দো'আ করুন। সাথে সাথে হযরত ওমর এ ধারণাও প্রকাশ করে দিলেন যে, দুনিয়ার এ সচ্ছলতা ও সম্পদ যখন এমন মামুলী ও সাধারণ জিনিস যে, আল্লাহ্ তা'আলা রোম ও পারস্যবাসীদের মত কাফের সম্প্রদায়কেও এটা দিয়ে রেখেছেন, তাহলে আপনার দো'আর বরকতে আপনার উম্মতকে কেন দেওয়া হবে না ?

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ আব্দার শুনে সতর্কীকরণের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত বিস্ময়ের সাথে বললেন ঃ হে খাত্তাবের পুত্র! তুমিও এখনও বাস্তবতা উপলব্ধি না করার এ স্তরে রয়ে গিয়েছ যে, এমন কথা বলছ! রোম ও পারস্যবাসীদের এসব সম্প্রদায় যারা ঈমান ও আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে বঞ্চিত, তাদের ব্যাপার তো হচ্ছে এই যে, আখেরাতের ঐ জীবনে যা আসল ও প্রকৃত জীবন, সেখানে তারা কিছুই পাবে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে যে সুখ-সম্ভোগ দিতে চেয়েছিলেন তা এ দুনিয়াতেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের আরাম-আয়েশ ও প্রাচুর্য দেখে এর জন্য লালায়িত হওয়া এবং লোভ করা বাস্তবতা উপলব্ধি না করারই নামান্তর। তোমার চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা কেবল আখেরাতের জন্য হওয়া চাই, যেখানে

চিরকাল থাকতে হবে। এ দুনিয়া তো মাত্র কয়েক দিনের মুসাফিরখানা। এখানের দুঃখ-কষ্টই কি আর আরাম-আয়েশই বা কি!

দুনিয়া এক মুসাফিরখানা

(٧٠) عَنْ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ عَلٰى حَصِيْرٍ فَقَامَ وَقَدْ اَثَّرَ فِىْ جَسَدِهٖ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمَرْتَنَا اَنْ نَبْسُطَ لَكَ وَنَعْمَلَ فَقَالَ مَالِىْ وَلِلدُّنْيَا وَمَا اَنَا وَالدُّنْيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا * (رواه احمد والترمذى وابن ماجه)

৭০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন খেজুরপাতার চাটাইয়ের উপর শুয়েছিলেন। তিনি যখন শয়ন থেকে উঠলেন, তখন তাঁর দেহ মুবারকে ঐ চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেল। এ অবস্থা দেখে ইবনে মাসউদ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অনুমতি দিলেই আমরা আপনার জন্য একটা বিছানার ব্যবস্থা এবং একটা কিছু তৈরী করে দিতাম। তিনি উত্তরে বললেন ঃ দুনিয়ার সাথে আমার কি সম্পর্ক এবং দুনিয়া থেকে আমি কিইবা গ্রহণ করব। এ দুনিয়ার সাথে আমার সম্পর্ক কেবল এতটুকুই, যেমন কোন পথিক কোন গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। তারপর এটা ছেড়ে দিয়ে নিজের গন্তব্যে রওয়ানা হয়ে গেল। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের সারসংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, কোন পথিক মুসাফির যেমন কোন গাছের ছায়ায় অল্প সময়ের অবস্থানের জন্য আরাম-আয়েশের আয়োজন করে না এবং গন্তব্যে পৌঁছার চিন্তা ছাড়া তার অন্য কোন চিন্তাই থাকে না, ঠিক এটাই হচ্ছে আমার অবস্থা। আর বাস্তব সত্যও এটাই যে, দুনিয়া এবং আখেরাতের প্রকৃত স্বরূপ যার সামনে উন্মোচিত হয়ে যায়, তার অবস্থা এর বাইরে আর কিছু হতেই পারে না। তার পক্ষে দুনিয়ার সুখ-শান্তির জন্য বিরাট বিরাট আয়োজনের চিন্তা করা এবং এর জন্য নিজের সময় ও মেধা ব্যয় করা ঠিক এমনই নির্বুদ্ধিতার কাজ হবে, যেমন বৃক্ষের ছায়ায় কিছু সময় অবস্থানের জন্য কোন পথিক মুসাফিরের বিরাট বিরাট আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া।

তাক্ওয়া ও পবিত্রতার সাথে যদি সম্পদ অর্জিত হয়, তাহ্লে এটাও আল্লাহ্র নেয়ামত বিশেষ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে সম্পদের নিন্দাবাদ এবং দারিদ্র্য ও যুহ্দের ফযীলত সম্পর্কে যেসব হাদীস উল্লেখিত হয়েছে, সেখানে যদিও বিভিন্ন স্থানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সম্পদ সেই কেবল আশংকার কারণ, যা মানুষকে আল্লাহ্ থেকে উদাসীন ও আখেরাত থেকে বেপরোয়া করে দেয়। কিন্তু যদি এমন না হয়; বরং বান্দা যদি আল্লাহ্র তওফীকে সম্পদের দ্বারাও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এবং জান্নাত উপার্জন করে, তাহলে এমন সম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার বিরাট নেয়ামত। সামনের হাদীসগুলোতে এ বিষয়টিই স্পষ্ট এবং পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

(٧١) عَنْ رَجُلٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنَّا فِىْ مَجْلِسٍ فَطَلَعَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلٰى رَأْسِهٖ اَثَرُ مَاءٍ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَرَاكَ طَيِّبَ النَّفْسِ قَالَ

أَجَلْ قَالَ ثُمَّ خَاضَ الْقَوْمُ فِيْ ذِكْرِ الْغِنٰى فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَابَأْسَ بِالْغِنٰى لِمَنِ اتَّقَى اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقٰى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنٰى وَطِيْبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيْمِ * (رواه احمد)

৭১। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা কয়েকজন লোক এক মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে তাশরীফ আনলেন। তাঁর মাথায় তখন পানির চিহ্ন ছিল। (অর্থাৎ, মনে হচ্ছিল যে, তিনি এমাত্র গোসল করে এসেছেন।) আমরা বললাম, আপনাকে খুব প্রফুল্ল দেখছি। তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ঠিকই। তারপর মজলিসের লোকেরা ধন-সম্পদ ও সচ্ছলতার আলোচনা শুরু করল (যে, এটা ভাল না মন্দ এবং দ্বীন ও আখেরাতের পক্ষে ক্ষতিকর না উপকারী।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ্কে ভয় করে চলে, তার জন্য সম্পদশালী হওয়াতে কোন দোষ নেই। আর মুত্তাকী বান্দার জন্য সুস্থতা সম্পদশালী হওয়ার চাইতে অনেক উত্তম এবং মানসিক প্রশান্তি আল্লাহ্ তা'আলার একটি নেয়ামত বিশেষ।(যার শুকরিয়া আদায় করা অপরিহার্য।) —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, বিত্তবান ও সম্পদশালী হওয়া যদি তাক্ওয়ার সাথে হয়, অর্থাৎ আল্লাহ্র ভয়, আখেরাতের চিন্তা এবং শরীঅতের বিধি-বিধানের পাবন্দী যদি থাকে, তাহলে এতে দ্বীনের কোন আশংকা ও ক্ষতি নেই; বরং আল্লাহ্ তা'আলা যদি তওফীক দান করেন, তাহলে এ ধন-সম্পদই দ্বীনের বিরাট উন্নতি এবং জান্নাতের উঁচু স্তরে পৌঁছার মাধ্যমও হতে পারে।

হযরত ওসমান (রাঃ)-এর মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটা বিরাট দখল, তাঁর এ অর্থ সম্পদেরই রয়েছে, যা তিনি আল্লাহ্র পথে অকাতরে এবং মুক্তহস্তে খরচ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসব ক্ষেত্রেই তাঁর বেলায় বিরাট বিরাট সুসংবাদ শুনিয়েছিলেন। তবে এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সম্পদ ও প্রাচুর্যের সাথে তাক্ওয়া অর্থাৎ আল্লাহভীতি, পরকাল-চিন্তা এবং শরীঅতের অনুসরণের তওফীক খুব কম মানুষের ভাগ্যেই জুটে থাকে। কেননা, সম্পদের নেশায় অধিকাংশ মানুষই বিপথগামী হয়ে যায়। জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি যথার্থই বলেছেন ঃ সম্পদ ও প্রাচুর্যের নাগাল পেয়েও যদি তুমি নেশাগ্রস্ত না হয়ে থাক, তাহলেই তুমি মহাপুরুষ।

(৭২) عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ * (رواه مسلم)

৭২। হযরত সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা মুত্তাকী সম্পদশালী নিভৃতচারী বান্দাকে ভালবাসেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এখানে "নিভৃতচারী" দ্বারা উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ সাধারণভাবে তার এ অবস্থা বুঝতেই পারে না যে, সম্পদ ও বিত্তের মালিক হওয়ার সাথে তাক্ওয়া ও খোদাভীতিতেও তার বিরাট স্থান রয়েছে। বস্তুতঃ যে বান্দার মধ্যে এ তিনটি গুণের সমন্বয় ঘটে, তার উপর আল্লাহ্

তা'আলার বিরাট অনুগ্রহ থাকে এবং সে আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে।

ভাল উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করার ফযীলত

(৭৩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً اِسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَسَعْيًا عَلٰى اَهْلِهٖ وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهٖ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَوَجْهُهٗ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلاَلاً مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ *

(رواه البيهقى فى شعب الايمان وابو نعيم فى الحلية)

৭৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে এবং এ উদ্দেশ্যে দুনিয়ার সম্পদ লাভ করতে চায় যে, তার যেন কারো কাছে হাত পাততে না হয় এবং সে যেন পরিবার-পরিজনের জীবিকা ও আরামের ব্যবস্থা করতে পারে এবং প্রতিবেশীদের প্রতিও সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারে, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল থাকবে। আর যে ব্যক্তি হালাল উপায়েই এ উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে যে, সে খুব সম্পদশালী হবে, নিজের মর্যাদা ও গৌরব প্রদর্শন করবে এবং লোক দেখানোর জন্য দান-খয়রাত করবে, কেয়ামতের দিন সে এ অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট। —বায়হাকী, আবূ নুআইম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটি দ্বারা জানা গেল যে, ভাল উদ্দেশ্যে বৈধ পন্থায় দুনিয়ার সম্পদ উপার্জন করা কেবল জায়েযই নয়; বরং এটা এমন বিরাট পুণ্য কাজ যে, কেয়ামতের দিন এমন ব্যক্তি যখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে হাজির হবে, তখন তার উপর আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ অনুগ্রহের চিহ্ন ফুটে উঠবে। যার ফলে তার চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় হয়ে থাকবে। কিন্তু সম্পদ উপার্জনের উদ্দেশ্য যদি কেবল সম্পদশালী হওয়া, দুনিয়ার প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করা এবং লোক দেখানোর জন্য বিরাট বিরাট কাজ করা হয়, তাহলে এ সম্পদ উপার্জন হালাল পন্থায় হলেও এটা এমন গুনাহ্ যে, কেয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তির উপর আল্লাহ্ তা'আলার চরম ক্রোধ থাকবে। আর নাজায়েয ও হারাম পন্থায় হলে তো আর বিপদের সীমাই থাকবে না।

(৭৪) عَنْ اَبِىْ كَبْشَةَ الْاَنْمَارِىْ اَنَّهٗ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ثَلٰثٌ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَاُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ فَاَمَّا الَّذِىْ اُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَاِنَّهٗ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا اِلاَّ زَادَهُ اللّٰهُ بِهَا عِزًّا وَلاَ فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ اِلاَّ فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهَا بَابَ فَقْرٍ وَاَمَّا الَّذِىْ اُحَدِّثُكُمْ فَاحْفَظُوْهُ فَقَالَ اِنَّمَا الدُّنْيَا لِاَرْبَعَةِ نَفَرٍ عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالاً وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِىْ فِيْهِ رَبَّهٗ وَيَصِلُ رَحِمَهٗ وَيَعْمَلُ لِلّٰهِ فِيْهِ بِحَقِّهٖ فَهٰذَا بِاَفْضَلِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً فَهُوَ

صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَاَجْرُهُمَا سَوَاءٌ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِيْ مَالِهٖ لِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهٗ وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهٗ وَلَا يَعْمَلُ فِيْهِ بِحَقٍّ فَهٰذَا بِاَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِيَّتُهٗ وَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ * (رواه الترمذى)

৭৪। আবূ কাবশা আনমারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ তিনটি বিষয় এমন আছে যে, এগুলোর (সত্যতার) উপর আমি কসম খেতে পারি। আর এগুলো ছাড়া আরো একটি কথা তোমাদেরকে বলতে চাই, তোমরা সেটা স্মরণ রেখো। যে তিনটি বিষয় আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, এগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, দান-খয়রাত দ্বারা কোন বান্দার সম্পদ হ্রাস পায় না। (অর্থাৎ, আল্লাহ্র পথে সম্পদ ব্যয় করার কারণে কেউ কোন দিন গরীব ও নিঃস্ব হয়ে যায় না; বরং তার সম্পদে আরো বরকত হয় এবং যার পথে সে দান-খয়রাত করে, সেই মহান সত্তা তাঁর গুপ্ত ভান্ডার থেকে তাকে আরো বেশী দিয়ে থাকেন।) দ্বিতীয়, বিষয়টি হচ্ছে এই যে, কোন বান্দা অত্যাচারিত হয়ে যদি এর উপর সবর করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন। (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা এ বিধান নির্ধারণ করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ্র কোন বান্দার উপর অন্যায়ভাবে জুলুম-নির্যাতন করা হয় আর সে সবর করে যায়, তখন আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে দুনিয়াতেও তার সম্মান ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।) তৃতীয় বিষয়টি এই যে, কোন বান্দা যখন ভিক্ষা বৃত্তির দ্বার উন্মুক্ত করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর অভাবের দরজা খুলে দেন। (অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করার পেশা অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা অনুযায়ী দারিদ্র্য ও অভাব তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। এ তিনটি বিষয় যেন আল্লাহ্র এমন অনড় সিদ্ধান্ত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি এগুলোর উপর কসম খেতে পারি।)

আর এছাড়াও যে কথাটি আমি বলতে চাই এবং যা মনে রাখা তোমাদের কর্তব্য, সেটি হচ্ছে এই যে, দুনিয়া চার ধরনের মানুষের জন্য, (অর্থাৎ, এ দুনিয়াতে চার ধরনের মানুষ রয়েছে।) (১) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সঠিক জীবন-পদ্ধতির এলেমও দান করেছেন। ফলে সে এ মাল-সম্পদ ব্যবহার ও খরচ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ্কে ভয় করে, এর দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এটা যথাযথ কাজে লাগায়। এ বান্দা হচ্ছে সর্বোত্তম পর্যায়ভুক্ত। (২) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সঠিক এলেম তো দান করেছেন; কিন্তু তাকে ধন-সম্পদ দান করেন নাই। তবে তার নিয়্যত খাঁটি ও বিশুদ্ধ। সে বলে যে, আমাকে যদি সম্পদ দেওয়া হত, তাহলে আমি অমুকের মতই সেটা কাজে লাগাতাম। (এবং প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত কল্যাণ খাতে সেটা ব্যয় করতাম।) বস্তুতঃ এ দু'জনের পুণ্য ও প্রতিদান সমান। (অর্থাৎ, দ্বিতীয় ব্যক্তি তার ভাল নিয়্যতের গুণে প্রথম ব্যক্তির সমান সওয়াবের অধিকারী হয়ে যাবে।) (৩) ঐ বান্দা যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সেটা ব্যয় করার সঠিক জ্ঞান ও এলেম

তাকে দান করেন নাই। ফলে এলেম না থাকার দরুন সে এ সম্পদ যথেচ্ছা ব্যবহার করে, সে এ ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় করে না, এর দ্বারা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে না এবং সম্পদ যেভাবে ব্যয় করা উচিত ছিল সেভাবে ব্যয় করে না। এ ব্যক্তি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট পর্যায়ের। (৪) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা ধন-সম্পদও দেননি এবং সঠিক জ্ঞান ও এলেমও দান করেননি। তার অবস্থা এই যে, সে বলে ঃ আমার যদি মাল-সম্পদ হয়, তাহলে আমিও অমুক (ভোগবিলাসী ও অপচয়কারী) ব্যক্তির মত কাজ করব। এটাই থাকে তার নিয়্যত। তাই এ উভয় ব্যক্তির গুনাহ্ও সমান। (অর্থাৎ, চতুর্থ ব্যক্তি তার খারাপ নিয়্যতের কারণে সেই গুনাহ্ ও শাস্তি পাবে, যা তৃতীয় ব্যক্তি তার কর্মের বিনিময়ে পেয়ে থাকে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্মার্থের কিছুটা ব্যাখ্যা অনুবাদের সাথে (বন্ধনীর মধ্যে) করে দেওয়া হয়েছে। তবে এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন মন্দ কাজের নিয়্যতের কারণে যে শাস্তি আরোপিত হয় এবং যা মন্দ করার মতই গুনাহ্, সেটা হচ্ছে দৃঢ় সংকল্পের পর্যায়। অর্থাৎ, বান্দার পক্ষ থেকে যদি এ গুনাহটি করে ফেলার দৃঢ়সংকল্প থাকে, চাই কোন অপারগতার কারণে তা করতে না পারুক। অতএব, কোন গুনাহের ইচ্ছা যদি এ পর্যায়ের হয়, তাহলে এটা বাস্তবে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার মতই পাপ হবে এবং বান্দা এ কারণে শাস্তির উপযুক্ত সাব্যস্ত হবে।

পাপাচারপূর্ণ জীবনের সাথে যদি দুনিয়াতে নেয়ামত লাভ হয়,
তাহলে এটাকে "এস্তেদরাজ" মনে করতে হবে

(৭৫) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ يُعْطِي الْعَبْدَ عَلَى مَعَاصِيْهِ مَا يُحِبُّ فَاِنَّمَا هُوَ اِسْتِدْرَاجٌ ثُمَّ تَلَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَسُوْا مَا ذُكِّرُوْا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ط حَتّٰى اِذَا فَرِحُوْا بِمَآ اُوْتُوْآ اَخَذْنٰهُمْ بَغْتَةً فَاِذَا هُمْ مُّبْلِسُوْنَ *

(رواه احمد)

৭৫। হযরত উক্‌বা ইবনে 'আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা দেখবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা কোন বান্দাকে তার পাপাচার ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও তার কাঙ্ক্ষিত নেয়ামতসমূহ (অর্থ-সম্পদ, আরাম-আয়েশ ও সম্মান ইত্যাদি) দিয়ে যাচ্ছেন, তখন তোমরা বুঝে নিয়ো যে, এটা তার বেলায় এস্তেদরাজ ও এক ধরনের অবকাশ। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন পাকের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ হচ্ছে ঃ অতঃপর তারা যখন ঐ উপদেশ ভুলে গেল, যা তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল, তখন আমি তাদের সামনে সব ধরনের নেয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত করে দিলাম। এমনকি তারা যখন এসব নেয়ামত পেয়ে খুবই গর্বিত ও আনন্দিত হয়ে পড়ল, তখন আমি অকস্মাৎ তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন তারা নিরাশ হয়ে গেল। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ এ দুনিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলার যেসব নিয়ম-নীতি চলছে এবং যেই নীতি মোতাবেক তিনি ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের সাথে আচরণ করে থাকেন, এগুলোর মধ্যে

"এস্তেদরাজ" ও একটি অন্যতম নীতি। এস্তেদরাজের অর্থ এই যে, যখন আল্লাহ্‌র কোন অবাধ্য ও বিদ্রোহী বান্দা অথবা গোষ্ঠী পাপাচার ও অবাধ্যতায় সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং আখেরাত ও আল্লাহ্‌র বিধান থেকে সম্পূর্ণ বেপরোয়া ও উদাসীন হয়ে জীবন কাটাতে শুরু করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে কখনো কখনো এমনও করেন যে, তার রশি আরো লম্বা করে দেন। তার উপর কিছুকালের জন্য নেয়ামতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, যাতে সে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে এ অবাধ্যতায় আরো অগ্রসর হয়ে যায় এবং বিরাট শাস্তির উপযুক্ত হয়ে যায়। দ্বীনী বিশেষ পরিভাষায় আল্লাহ্ তা'আলার এ আচরণকে "এস্তেদরাজ" বলা হয়।

অতএব, উপরের হাদীসটির মর্ম এই হল যে, যখন তোমরা কোন ব্যক্তি অথবা দলকে এ অবস্থায় দেখবে যে, তারা আল্লাহ্ এবং আখেরাতকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে অপরাধী ও বিদ্রোহীর মত জীবন কাটাচ্ছে এবং এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে বিভিন্ন ধরনের নেয়ামত পেয়ে যাচ্ছে, আর দুনিয়ার মজা ও স্বাদ তারা লুটে নিচ্ছে, তখন কেউ যেন এ ভুল বুঝাবুঝির শিকার না হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের প্রতি খুশী হয়ে নিজের নেয়ামতসমূহ তাদের উপর ছড়িয়ে দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে বরং এটা বুঝতে হবে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের রশি লম্বা করে দিয়ে অবকাশ দিয়ে যাচ্ছেন এবং তাদের শেষ পরিণতি হবে খুবই ভয়াবহ।

কাফের ও পাপাচারীদের সুখভোগ দেখে ঈর্ষান্বিত হতে নেই

(٧٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَغْبِطَنَّ فَاجِرًا بِنَعْمَةٍ فَاِنَّكَ لَا تَدْرِىْ مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهٖ اِنَّ لَهٗ عِنْدَ اللّٰهِ قَاتِلًا لَايَمُوْتُ يَعْنِى النَّارَ * (رواه البغوى فى شرح السنة)

৭৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন পাপাচারী (কাফের অথবা ফাসেকের) কোন নেয়ামত ও সুখ দেখে কখনো ঈর্ষান্বিত হয়ো না। কেননা, তোমরা জান না যে, মৃত্যুর পর সে কি বিপদের সম্মুখীন হবে। আল্লাহ্‌র নিকট (অর্থাৎ, আখেরাতে) তার জন্য এমন এক ঘাতক রয়েছে, যার কখনো মৃত্যু নেই। (আবূ হুরায়রা থেকে এ হাদীসটির বর্ণনাকারী আব্দুল্লাহ ইবনে আবী মারইয়াম বলেন যে,) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে ঘাতক শব্দ দ্বারা জাহান্নামের আগুনকে বুঝিয়েছেন। (অর্থাৎ, ঐ হতভাগা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে। তাই এমন ব্যক্তির উপর ঈর্ষা করা কত বড় নির্বুদ্ধিতা ও পথভ্রষ্টতা!) —শরহুস সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ অনেক সময় এমন হয় যে, আল্লাহ্‌র একজন মু'মিন ও পুণ্যবান বান্দা যে এ কয় দিনের দুনিয়ার পরীক্ষাগারে অভাব ও কষ্টের জীবন কাটায়, সে যখন কোন পাপাচারী ও অবাধ্য মানুষকে দেখে যে, সে অত্যন্ত জাঁকজমক ও প্রাচুর্যের জীবন কাটায়, তখন শয়তান তার অন্তরে বিভিন্ন ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি করে দেয়। আর শয়তান এতটুকু সুযোগ গ্রহণ করতে না পারলে অন্ততঃ তার মনে এ অবস্থার উপর ঈর্ষা সৃষ্টি হয়ে যায়, যা চরম অকৃতজ্ঞতা। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন যে, যেসব মানুষ ঈমান ও পুণ্য কাজের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত এবং আল্লাহ্‌কে ভুলে থাকা ও পাপাচারের কারণে আখেরাতের স্থায়ী জীবনে যারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, এ দুনিয়ায় তাদের কয় দিনের প্রাচুর্যপূর্ণ জীবন ও আরাম-আয়েশ দেখে কোন ঈমানদারের অন্তরে কখনো যেন ঈর্ষাও সৃষ্টি না হয়। কেননা, এ

হতভাগাদের শেষ পরিণতি যা হবে এবং তাদের উপর যে দুঃখ ও দুর্ভোগ আসবে, এটা জানা হয়ে গেলে তাদের এ সুখ ভোগের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ এমন মনে হবে, যেমন ফাঁসির আসামীকে কিছু দিন পূর্ব থেকে বিশেষ সুবিধাদি দেওয়া হয়ে থাকে এবং পানাহারের বেলায় তার খায়েশ ও চাহিদা জেনে নিয়ে যথাসম্ভব এটা পূর্ণ করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা নিজের যেসব বান্দাকে আখেরাতের ঐসব বাস্তবতার পূর্ণ বিশ্বাস দান করেছেন এবং আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নবী-রাসূলগণ যেগুলোর সংবাদ প্রদান করেছেন, তাদের দৃষ্টিতে আল্লাহ্র অবাধ্য ও বিদ্রোহীদের পার্থিব সাচ্ছন্দ্য ও ভোগ-বিলাসের অবস্থা সম্পূর্ণ এটাই। তাই তাদের অন্তরে এদেরকে দেখে ঈর্ষা সৃষ্টি হয় না; বরং তারা আল্লাহ্ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করে যে, তিনি আমাদেরকে ঈমান নসীব করে এ দুর্ভাগাদের খারাপ অবস্থা ও মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন।

এই সংকলক আল্লাহ্র কোন কোন বান্দার এ অবস্থা দেখেছে যে, খোদাবিমুখ দুনিয়া-পূজারীদেরকে দেখে তাদের মুখ দিয়ে আল্লাহ্র শুকরিয়া ও প্রশংসা জ্ঞাপক এ দো'আ বের হয়ে আসে, যে দো'আটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বিপদগ্রস্ত মানুষকে দেখে পাঠ করতেন। যার অর্থ এই ঃ সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাকে ঐ বিপদ থেকে নিরাপদ রেখেছেন, যে বিপদে তুমি আক্রান্ত হয়ে গিয়েছ। আর তিনি আমাকে তাঁর অনেক সৃষ্টির উপর মর্যাদা দান করেছেন।

কারো বাহ্যিক দুরবস্থা ও দারিদ্র্যের কারণে তাকে তুচ্ছ মনে করো না

(٧٧) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا رَأْيُكَ فِيْ هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِ النَّاسِ هٰذَا وَاللّٰهِ حَرِيٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُّنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَفَّعَ قَالَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأْيُكَ فِيْ هٰذَا؟ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ هٰذَا حَرِيٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ لَا يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ لَا يُشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ لَا يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْأِ الْاَرْضِ مِثْلِ هٰذَا * (رواه البخارى ومسلم)

৭৭। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন এক ব্যক্তি (যে সম্ভবতঃ ধনাঢ্য ও সম্ভ্রান্ত ছিল) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করে গেল। তিনি তখন তাঁর পাশে বসা এক লোককে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ অতিক্রমকারী লোকটি সম্পর্কে তোমার কি অভিমত ? সে উত্তর দিল, এ তো বিরাট সম্ভ্রান্ত ও সম্মানী মানুষের একজন। তার অবস্থা তো এই যে, সে যে কোন পরিবারে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার কাছে বিয়ে দেওয়া হবে এবং কোন বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। সাহল (রাঃ) বলেন ঃ এ উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব হয়ে গেলেন এবং কিছুই বললেন না। একটু পরেই আরেক ব্যক্তি এ দিক দিয়ে পথ অতিক্রম করে গেল। এবারও তিনি পাশে বসা লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ ব্যক্তিটির ব্যাপারে তোমার কি

অভিমত ? সে উত্তরে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো দরিদ্র মুসলমানদের একজন। তার অবস্থা তো এ হবে যে, কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তার সাথে বিয়ে দেওয়া হবে না, কোন বিষয়ে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে না এবং কোন কথা বললে এর প্রতি কর্ণপাত করা হবে না। (তার এ উত্তর শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রথমোক্ত লোকটির মত মানুষ দ্বারা গোটা ভূপৃষ্ঠও যদি ভরে যায়, তবুও একা এ দরিদ্র লোকটি তাদের চেয়ে অনেক উত্তম। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের সাধারণ অবস্থা এই যে, দুনিয়ার সম্পদ ও দুনিয়ার বড় লোককেই তারা বড় মনে করে এবং এর দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয়। অপর দিকে আল্লাহ্র যেসব বান্দা এগুলো থেকে রিক্তহস্ত থাকে তারা ঈমান ও নেক আমলের যতই অধিকারী হোক না কেন, দুনিয়াদার লোকেরা তাদেরকে তুচ্ছই মনে করে থাকে। এ হাদীসটি আসলে এ আত্মিক ও মানসিক অবস্থার জন্য চিকিৎসা স্বরূপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যে লোকটি বসা ছিলেন এবং তিনি যাকে লক্ষ্য করে কথা বলেছিলেন, সম্ভবতঃ তার মধ্যেও এ রোগের কিছুটা জীবাণু ছিল। তাই তার অবস্থা সংশোধনের জন্য তিনি এরূপ কথা-বার্তা বলেছিলেন।

হাদীস ব্যখ্যাতাগণ লিখেছেন এবং হাদীসের বাহ্যিক শব্দমালায়ও বুঝা যায় যে, এ দু' পথচারীই মুসলমানই ছিলেন। তবে প্রথম পথচারী দুনিয়ার সম্পদ ও প্রভাবে অগ্রগামী ছিলেন, কিন্তু দ্বীনের ক্ষেত্রে কিছুটা পেছনে। আর দ্বিতীয় পথচারী দুনিয়ার দৃষ্টিতে পেছনে থাকলেও দ্বীন এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগামী ছিলেন। এ পার্থক্যের কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ প্রথমোক্ত ব্যক্তির মত মানুষ যদি এত বিপুল পরিমাণও হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র এ প্রশস্ত ভূখন্ড তাদের দ্বারা ভরে উঠে, তবুও দ্বিতীয় পথচারী আল্লাহ্র গরীব ও সম্পদহীন এ এক বান্দা তাদের সবার চাইতে উত্তম হবে। আল্লাহু আকবার! দ্বীন এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের মর্যাদা ও মাহাত্ম্যের কি গুণ!

(٧٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ بِالْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَاَبَرَّهُ * (رواه مسلم)

৭৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন অনেক মানুষ আছে, যাদের চুল এলোমেলো, চেহারা ধূলিমলিন এবং মানুষের দ্বার থেকে বিতাড়িত, (কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তাদের এ মর্যাদা যে,) তারা যদি আল্লাহ্র নামে কসম খেয়ে কোন কথা বলে ফেলে, তাহলে তিনি অবশ্যই তাদের কসম পূরণ করে দেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের মর্মও এটাই যে, কাউকে তার ময়লা বসন, মলিন দেহ এবং অবিন্যস্ত কেশ দেখে ছোট ও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। কেননা, এদের মধ্যে আল্লাহ্র এমন কিছু বান্দাও থাকে, যারা আল্লাহ্র জন্য নিজেদেরকে মিটিয়ে দিয়ে তাঁর নিকট এমন নৈকট্য ও ভালবাসা অর্জন করে নেয় যে, আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তারা যদি কোন বিষয়ে কসম খেয়ে বসে যে, আল্লাহ্ এমনই করবেন অথবা তিনি এমনটা করবেন না, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কসমের মর্যাদা রক্ষার জন্য এমনটাই করে দেন।

তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, এ হাদীসের উদ্দেশ্য ময়লা বসন, মলিন দেহ ও অপরিচ্ছন্নতার প্রতি উৎসাহ প্রদান নয়, (যেমন অনেকেই মনে করে থাকে।) হাদীস ও সীরাতের প্রচুর বর্ণনা এর সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসতেন এবং অন্যদেরকেও এর প্রতি উৎসাহিত করতেন। এমনকি তিনি যখন কাউকে এ ব্যাপারে উদাসীন দেখতেন, তখন তাকে নিজের অবস্থা সংশোধন করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান হওয়ার নির্দেশ দিতেন। তাই একথা বুঝা ঠিক নয় যে, এ হাদীসের উদ্দেশ্য ও দাবী এই যে, মানুষ যেন অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা হয়ে থাকে; বরং হাদীসের আসল উদ্দেশ্য ও প্রাণবস্তু এটাই যে, আল্লাহ্র কোন বান্দাকে তার ময়লা পোশাক ও মলিন দেহের কারণে তুচ্ছ ও নিজের চেয়ে ছোট মনে করা যাবে না। কেননা, এ অবস্থার অধিকারী মানুষের মধ্যে আল্লাহ্র অনেক বিশেষ বান্দাও থাকে।

অতএব, এ হাদীসে প্রকৃতপক্ষে ঐসব লোকের ধারণা ও অবস্থার সংশোধন করা হয়েছে, যারা আল্লাহ্র গরীব ও দুঃস্থ বান্দাদেরকে হীন ও অকর্মন্য মনে করে এবং তাদেরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। তারা নিজেদের মনের অহংকারের দরুন তাদের সাথে মেলামেশা করতে এবং তাদের কাছে বসতেও চায় না এবং এর মধ্যেই তাদের মর্যাদার সুরক্ষা রয়েছে বলে মনে করে।

অনেক গরীব ও দুঃস্থ এমন রয়েছে, যাদের বরকতে অন্যরা রিযিক পায়

(৭৯) عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ رَاٰى سَعْدٌ اَنَّ لَهُ فَضْلًا عَلٰى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ * (رواه البخارى)

৭৯। মুসআব ইবনে সা'দ (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতা সা'দ (রাঃ)-এর ধারণা ছিল যে, (আল্লাহ্ তা'আলা তাকে যেসব গুণাবলী ও যোগ্যতা দান করেছিলেন, যেমন, বীরত্ব, বদান্যতা, দূরদর্শিতা ইত্যাদি, এগুলোর কারণে) অন্যদের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তার এ ধারণা দূর করার জন্য) বললেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে যে সাহায্য করা হয় এবং যেসব নেয়ামত দান করা হয়, এটা (তোমাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে দেওয়া হয় না; বরং) তোমাদের মধ্যে যেসব দরিদ্র ও দুঃস্থ মানুষ রয়েছে, তাদের খাতিরে এবং তাদের দো'আর বরকতে লাভ হয়। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সা'দ (রাঃ) এর ধারণা ছিল, যেহেতু এর ভিত্তি ছিল এক ধরনের অহমিকার উপর। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিকার ও চিকিৎসার জন্য তাকে বলে দিলেন যে, তুমি যেসব দরিদ্র ও দুঃস্থদেরকে নিজের চেয়ে ছোট মনে কর এবং নিজেকে তাদের চাইতে বড় মনে কর, আসলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরই খাতিরে এবং তাদেরই দো'আর বরকতে তোমাদেরকে ঐসব নেয়ামত দান করে থাকেন, যেগুলো পেয়ে তোমরা এখানে বড় হয়ে আছ। বর্তমানেও আমাদের মত বিদ্যা-বুদ্ধির অধিকারী মানুষ, যাদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা কিছু যোগ্যতা ও জ্ঞান-গরিমা দান করেছেন এবং দ্বীনের কিছুটা

খেদমতের তওফীক দিয়েছেন, সাধারণভাবে তারাও এ ধরনের অহংকারে লিপ্ত। আল্লাহ্র কাছে আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে পানাহ চাই।

ফায়েদা ঃ নাসায়ী শরীফে এ হাদীসের রেওয়ায়তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শব্দমালা এরূপ বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা এ উম্মতকে তাদের দুর্বলদের দো'আ, নামায ও এখলাছের কারণে সাহায্য করেন। এ বিষয়টি প্রকাশ্য যে, এ বর্ণনার শব্দমালা বুখারী শরীফের বর্ণনার শব্দমালার চেয়ে মর্ম প্রকাশে অধিক স্পষ্ট।

নিজের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের লোকদেরকে দেখে শুকরিয়া আদায় করা উচিত

(٨٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَظَرَ اَحَدُكُمْ اِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِى الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى مَنْ هُوَ اَسْفَلُ مِنْهُ * (رواه البخارى ومسلم)

৮০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যখন এমন ব্যক্তিকে দেখে, যে অর্থ-সম্পদ ও দৈহিক গঠনে তার চাইতে অগ্রগামী, (এবং এ কারণে তার অন্তরে লালসা ও অভিযোগ সৃষ্টি হয়,) তাহলে সে যেন এমন কোন বান্দার দিকে তাকায়, যে তার চাইতেও নিম্ন পর্যায়ের। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের একটা সৃষ্টিগত দুর্বলতা এই যে, সে যখন এমন কাউকে দেখে, যে অর্থ-সম্পদ, দুনিয়ার প্রভাব অথবা গঠন ও আকৃতিতে তার চাইতে ভাল অবস্থানে রয়েছে, তখন তার মধ্যে এর লোভ ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয় এবং এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে কেন এমন বানালেন না ? এ হাদীসে এর চিকিৎসা এই বলে দেওয়া হয়েছে যে, সে যেন তখন আল্লাহ্র ঐসব বান্দাদেরকে দেখে এবং তাদের অবস্থার উপর চিন্তা করে, যারা ধন-সম্পদ, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং দৈহিক গঠন ও আকৃতিতে তার চেয়েও নিম্ন পর্যায়ের এবং পশ্চাদপদ। ইনশাআল্লাহ এমন করলে এ রোগের চিকিৎসা হয়ে যাবে।

(٨١) عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَصْلَتَانِ مَنْ كَانَتَا فِيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا مَنْ نَظَرَ فِىْ دِيْنِهٖ اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهٗ فَاقْتَدٰى بِهٖ وَنَظَرَ فِىْ دُنْيَاهُ اِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهٗ فَحَمِدَ اللّٰهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ كَتَبَهُ اللّٰهُ شَاكِرًا صَابِرًا وَمَنْ نَظَرَ فِىْ دِيْنِهٖ اِلَى مَنْ هُوَ دُوْنَهٗ وَنَظَرَ فِىْ دُنْيَاهُ اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَهٗ فَاَسِفَ عَلَى مَافَاتَهٗ مِنْهُ لَمْ يَكْتُبْهُ اللّٰهُ شَاكِرًا وَلَا صَابِرًا * (رواه الترمذى)

৮১। 'আমর ইবনে শু'আইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার মধ্যে দু'টি গুণ থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল লোকদের মধ্যে গণ্য করে নেন। (এ দু'টি গুণের বিবরণ হচ্ছে এই যে,) যে ব্যক্তির অভ্যাস এই হয় যে, সে দ্বীনের ব্যাপারে তো ঐসব লোকের দিকে দৃষ্টি রাখে,

যারা তার চাইতে উচ্চ মানের এবং তাদের অনুসরণও করে। আর দুনিয়ার ব্যাপারে সে তার চেয়ে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখে এবং সে আল্লাহ্র প্রশংসা করে যে, তিনি আমাকে তাদের চেয়ে বেশী মর্যাদা দান করেছেন। এ বান্দাকে আল্লাহ্ তা'আলা কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বলে লিখে দেন। অপর দিকে যার অভ্যাস এই যে, সে দ্বীনের ব্যাপারে সর্বদা তার চাইতে নিম্ন স্তরের লোকদেরকে দেখে এবং দুনিয়ার বেলায় নিজের চাইতে উচ্চ পর্যায়ের লোকদেরকে দেখে আর দুনিয়ার যে সব নেয়ামত থেকে সে বঞ্চিত রয়েছে এগুলোর উপর আক্ষেপ করে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে কৃতজ্ঞ ও ধৈর্যশীল বান্দা হিসাবে গণ্য করেন না। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কৃতজ্ঞতা ও ধৈর্য ঈমান ও আল্লাহ্র সাথে সম্পর্কের এমন দু'টি দিক যে, যার মধ্যে এ দু'টি গুণের সমন্বয় ঘটে, সে যেন পূর্ণ ঈমানের অধিকারী হয়ে যায়। আর এটা লাভ করার উপায় এবং এর মাপকাঠি এ হাদীস দ্বারা এই জানা গেল যে, বান্দা নিজেকে এ বিষয়ে অভ্যস্ত করে নেবে যে, দ্বীনের ব্যাপারে সে সর্বদা আল্লাহ্র ঐসব নেক বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, দ্বীনের ক্ষেত্রে যাদের অবস্থান তার চাইতে উঁচু স্তরে। আর দুনিয়ার ব্যাপারে সে সর্বদা আল্লাহ্ তা'আলার ঐসব দুঃস্থ ও বিপদগ্রস্ত মানুষের প্রতি নজর রাখবে, যারা পার্থিব দৃষ্টিতে নিজের চেয়ে আরো নিম্নস্তরের এবং পশ্চাদপদ। সাথে সাথে এদের তুলনায় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে দুনিয়ার যে সুখ-শান্তি দান করেছেন, সেটাকে কেবল আল্লাহ্র একান্ত অনুগ্রহ মনে করে নিজের এ অনুগ্রহকারী মহান মালিকের শুকরিয়া আদায় করবে।

যদি নেক আমলের তওফীক হয়, তাহলে জীবন বড়ই নেয়ামত

(٨٢) عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَىُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ قَالَ اَىُّ النَّاسِ شَرٌّ ؟ قَالَ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ * (رواه احمد)

৮২। আবূ বাকরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে ? (অর্থাৎ, কোন্ ধরনের মানুষ আখেরাতে সবচেয়ে সফলকাম হবে ?) তিনি উত্তর দিলেন ঃ যার হায়াত দীর্ঘ হয় এবং তার আমলও সুন্দর থাকে। ঐ ব্যক্তিই আবার জিজ্ঞাসা করল, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ব্যক্তি কে ? তিনি বললেন ঃ যার হায়াত দীর্ঘ হয় এবং তার আমল মন্দ থাকে। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ বিষয়টি স্পষ্ট যে, যখন কোন মানুষের জীবন পুণ্যময় জীবন হবে, তখন যত দীর্ঘ হায়াত সে পাবে, ততই দ্বীনী স্তরে সে উন্নতি লাভ করবে। এর বিপরীত যার আমল ও আখলাক আল্লাহ্ থেকে দূরত্ব সৃষ্টিকারী হবে, তার বয়স ও হায়াত যত দীর্ঘ হবে, সে ততই আল্লাহ্র রহমত ও সন্তুষ্টি থেকে দূরে সরে যাবে।

(٨٣) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَالِدٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰخٰى بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَقُتِلَ اَحَدُهُمَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتَ الْاٰخَرُ بَعْدَهُ بِجُمْعَةٍ اَوْ نَحْوِهَا فَصَلَّوْا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُلْتُمْ قَالُوْا دَعَوْنَا اللّٰهَ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَيَرْحَمَهُ وَيُلْحِقَهُ بِصَاحِبِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَيْنَ

صَلَوتُهُ بَعْدَ صَلَوتِهِ وَعَمَلُهُ بَعْدَ عَمَلِهِ اَوْ قَالَ صِيَامُهُ بَعْدَ صِيَامِهِ لَمَا بَيْنَهُمَا اَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ

وَالْاَرْضِ * (رواه ابوداؤد والنسائى)

৮৩। উবায়েদ ইবনে খালেদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করে দিয়েছিলেন। (অর্থাৎ, তখনকার প্রথা হিসাবে তাদের দু'জনকে পরস্পর ভাই ভাই বানিয়ে দিয়েছিলেন।) তারপর এ হল যে, তাদের একজন আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হয়ে গেল। এর এক সপ্তাহ পর অথবা এর কাছাকাছি সময়ে দ্বিতীয় জনও মারা গেল। (অর্থাৎ, তার এন্তেকাল কোন রোগের কারণে বাড়ীতেই হল।) সাহাবাগণ তার জানাযার নামায পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাযা আদায়কারী লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা জানাযার নামাযে কি বলেছ ? (অর্থাৎ, এ মৃত ব্যক্তির জন্য তোমরা কি দো'আ করেছ ?) তারা উত্তরে বললেন, আমরা তার জন্য এ দো'আ করেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাকে মাগফেরাত দান করেন, তাকে দয়া করেন এবং (তার যে সাথী শহীদ হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও সন্তুষ্টির যে মর্তবা লাভ করেছেন, যা শহীদগণ লাভ করে থাকে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অনুগ্রহে তাকে সে স্তরে উন্নীত করেন) তাকে যেন নিজের ঐ সাথীর সাথে মিলিত করেন। (যাতে জান্নাতে তারা উভয়ে সেভাবে থাকে, যেভাবে এ দুনিয়াতে থাকত।)

এ উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে তার ঐ নামায কোথায় গেল, যা তার শহীদ ভাইয়ের নামাযের পর সে আদায় করেছিল ? তার অন্যান্য নেক আমল কোথায় গেল, যা ঐ শহীদের আমলের পর সে করেছিল অথবা তিনি এরূপ বললেন যে, তার ঐ রোযা কোথায় গেল, যা সে শহীদের রোযার পর রেখেছিল ? তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ দু'জনের মর্যাদার ব্যবধান তো এর চাইতেও বেশী, আসমান-যমীনের মধ্যে যতটুকু ব্যবধান ও দূরত্ব রয়েছে। —আবূ দাঊদ, নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথার মর্ম এই ছিল যে, তোমরা পরে মৃত্যুবরণকারী এ লোকটির মর্যাদা প্রথমে শাহাদত বরণকারী ঐ লোকটির চেয়ে কম মনে করেছ। এ জন্য তো তোমরা এ দো'আ করেছ যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেন এ লোকটাকেও ঐ শহীদের মর্যাদায় উন্নীত করে দেন। অথচ পরে মৃত্যুবরণকারী লোকটি শহীদ ব্যক্তির শাহাদতের পরেও যে নামাযগুলো পড়েছে, যে রোযাগুলো রেখেছে এবং অন্যান্য যেসব নেক আমল করেছে, তোমরা জান না যে, এগুলোর কারণে তার মর্যাদা ঐ শহীদ ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছে। এমনকি উভয়ের মর্যাদার ব্যবধান আসমান-যমীনের দূরত্ব ও ব্যবধানের চাইতেও বেশী হয়ে গিয়েছে।

আল্লাহ্‌র পথে জীবন দেওয়া নিঃসন্দেহে একটা বিরাট নেক আমল এবং এর অনেক ফযীলত রয়েছে। কিন্তু নামায, রোযা ইত্যাদি পুণ্য কাজসমূহ যদি এখলাছের সাথে এবং "এহসান" গুণের সাথে হয়, তাহলে এগুলোর দ্বারা যে উন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধি হয়, এরও কোন সীমা পরিসীমা নেই। তাছাড়া পরে মৃত্যুবরণকারী এ লোকটিও যেহেতু আল্লাহ্‌র পথের সৈনিক ছিল এবং সে সর্বদা জেহাদের জন্য প্রস্তুত ছিল, এ জন্য নিজের বিছানায় মৃত্যু আসা সত্ত্বেও সে

নিজের নিয়্যত ও শাহাদতের আকাঙ্ক্ষার দরুন শহীদের মর্যাদা লাভ করে নিয়েছে। তদুপরি পরবর্তী সময়ের নামায, রোযা ইত্যাদি পুণ্য কর্মসমূহ তার মর্যাদা এ পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ের মর্যাদার ব্যবধান আসমান-যমীনের দূরত্বের চেয়েও বেশী বলে মন্তব্য করেছেন।

(٨٤) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ اَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِيْ عُذْرَةَ ثَلٰثَةً اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْلَمُوْا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّكْفِلْنِيْهِمْ؟ قَالَ طَلْحَةُ اَنَا فَكَانُوْا عِنْدَهٗ فَبَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ اَحَدُهُمْ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ بَعَثَ بَعْثًا فَخَرَجَ فِيْهِ الْاٰخَرُ فَاسْتَشْهَدَ ثُمَّ مَاتَ الثَّالِثُ عَلٰى فِرَاشِهٖ قَالَ قَالَ طَلْحَةُ فَرَأَيْتُ هٰؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ فِى الْجَنَّةِ وَرَأَيْتُ الْمَيِّتَ عَلٰى فِرَاشِهٖ اَمَامَهُمْ وَالَّذِىْ اسْتَشْهَدَ اٰخِرًا يَلِيْهِ وَاَوَّلُهُمْ يَلِيْهِ فَدَخَلَنِيْ مِنْ ذٰلِكَ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذٰلِكَ فَقَالَ وَمَا اَنْكَرْتَ مِنْ ذٰلِكَ ؟ لَيْسَ اَحَدٌ اَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ مِنْ مُّؤْمِنٍ يُعَمَّرُ فِى الْاِسْلَامِ لِتَسْبِيْحَةٍ وَتَكْبِيْرَةٍ وَتَهْلِيْلَةٍ * (رواه احمد)

৮৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বনী উযরা গোত্রের তিন ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। (এবং তাঁর খেদমতে অবস্থান করার ইচ্ছা প্রকাশ করল।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবায়ে কেরামকে) বললেন ঃ এ নওমুসলিমদের দেখা-শুনার দায়িত্ব আমার পক্ষ থেকে কে গ্রহণ করবে ? তালহা (রাঃ) বললেন, আমি এদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে রাজী। এভাবে তারা তালহা (রাঃ)-এর কাছে থাকতে লাগল। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক অভিযানে সেনাদল প্রেরণ করলেন। এ সেনাদলে এ তিনজনের একজন বের হয়ে গেল এবং সেখানে শহীদ হয়ে গেল। তারপর তিনি আরেকটি সেনা অভিযান পরিচালনা করলেন এবং এতে দ্বিতীয় আরেকজন বের হয়ে গেল এবং সেও সেখানে গিয়ে শহীদ হয়ে গেল। কিছুদিন পর এদের তৃতীয় জন নিজের বিছানায় (স্বাভাবিক) মৃত্যু বরণ করল। হাদীসের বর্ণনাকারী (আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ) বলেন, তালহা বলেছেন যে, আমি স্বপ্নে এ সাথীত্রয়কে জান্নাতে দেখলাম এবং আমি এ দেখলাম যে, বিছানায় পড়ে স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণকারী লোকটি সবার আগে। তার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে দ্বিতীয় অভিযানে শাহাদত বরণকারী ব্যক্তিটি আর তার কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে প্রথম শহীদ লোকটি। এ স্বপ্ন দেখে আমার মনে সন্দেহ ও খটকা সৃষ্টি হল। (কেননা, আমার ধারণা ছিল যে, শহীদী মৃত্যু লাভকারী এ দু' সাথীর মর্তবা তৃতীয় ব্যক্তির চেয়ে বেশী হবে, যে বিছানায় মারা গিয়েছিল।) তাই আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ স্বপ্ন এবং আমার প্রতিক্রিয়া ও খটকার কথা ব্যক্ত করলাম। তিনি বললেন ঃ এতে তোমার আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ? (তুমি তাদের মর্যাদার যে ক্রমিক মান দেখেছ, সেটাই হওয়া চাই। তৃতীয় ব্যক্তিটি তার দু' সাথীর শাহাদতের পর যে দিনগুলো জীবিত থেকেছে এবং নামায পড়তে থেকেছে ও আল্লাহ্র যিকিরে রত রয়েছে, ওর

বিনিময়ে তারই মর্যাদা সবার চাইতে বেশী হওয়া উচিত। কেননা,) আল্লাহ্র নিকট ঐ মু'মিনের চেয়ে উত্তম আর কেউ নেই, যার ভাগ্যে ঈমান ও ইসলামের সাথে দীর্ঘ হায়াতও জুটে, যার মধ্যে সে আল্লাহ্র তসবীহ, তাকবীর ও তাহলীল (অর্থাৎ, সুবাহানাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) আদায় করে। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ এর পূর্বের হাদীসের ব্যাখ্যায় যা লিখা হয়েছে, এর দ্বারাই এ হাদীসেরও ব্যাখ্যা হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা যদি সঠিক জ্ঞান দান করেন, তাহলে এ উভয় হাদীসেই ঐসব আবেগপরায়ণ ও অতি উৎসাহী লোকদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে, যারা জেহাদ ও শাহাদতের কোন ময়দান ও ক্ষেত্র তাদের সামনে বর্তমান না থাকা সত্ত্বেও জেহাদ ও শাহাদতের কেবল কথা, কল্পনা ও অবাস্তব আকাঙ্ক্ষায় নিজেদের সময় নষ্ট করে থাকে। তারা নামায, রোযা, যিকির, তেলাওয়াতে কুরআন ইত্যাদি পুণ্য কর্মের দ্বারা দ্বীনী উন্নতির যে সুযোগ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে লাভ করে এর কোন কদর ও সদ্ব্যবহার করে না; বরং এগুলো যে অতি সাধারণ ও নগণ্য বিষয় মনে করে এর দ্বারা নিজেদের উপকার সাধন করে না। এমনকি তারা এ পুণ্যকর্মগুলোকে উপহাসের বস্তু বানিয়ে নিজেদের পরকাল বরবাদ করে দেয়। অথচ তারা মনে করে যে, তারা ভাল কাজই করে যাচ্ছে।

উম্মতের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

(৮৫) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ * (رواه احمد والترمذى والدارمى)

৮৫। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তুমি যেখানে যে অবস্থায়ই থাক (নির্জনে হোক অথবা জনসমক্ষে, আরামে হোক অথবা কষ্টে,) আল্লাহ্কে ভয় করে চল, প্রত্যেক মন্দ কাজের পর নেক কাজ করে নাও, এই ভাল ঐ মন্দকে মিটিয়ে দেবে। আর আল্লাহ্র বান্দাদের সাথে উত্তম আচরণ করে যাও। —মুসনাদ আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ তাক্ওয়ার মূল হচ্ছে আল্লাহ্র ভয় এবং তাঁর শাস্তি ও হিসাব গ্রহণের চিন্তা। এটা মানুষের এক আভ্যন্তরীণ অবস্থা। বাহ্যিক জীবনে এ অবস্থার প্রকাশ ও প্রতিফলন এভাবে ঘটে যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশ ও বিধি-বিধানের অনুসরণ করে এবং নিষিদ্ধ কাজ ও গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা করে চলে। কিন্তু মানুষের প্রকৃতি এবং এ দুনিয়ায় তার পরিবেশ এমন যে, এ ভয় ও চিন্তা তথা তাক্ওয়া থাকা সত্ত্বেও তার পক্ষ থেকে ভুল-ভ্রান্তি এবং অন্যায়-অপরাধ সংঘটিত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতিকারের জন্য বলেছেন যে, যখন কোন ভুল-ভ্রান্তি অথবা খারাপ কাজ হয়ে যায়, তখন এর পরেই কোন সৎকর্ম করে নাও। এ সৎকর্মের আলো ঐ মন্দ কাজের অন্ধকারকে দূর করে দেবে। কুরআন পাকেও বলা হয়েছে ঃ পুণ্যকর্ম অবশ্যই পাপকে দূর করে দেয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে হযরত আবূ যরকে তৃতীয় উপদেশটি এ দিয়েছেন যে, মানুষের সাথে তোমার আচরণ যেন সুন্দর ও উত্তম হয়। এতে জানা গেল যে,

তাক্ওয়া ও পুণ্য বৃদ্ধির দ্বারা গুনাহ্ থেকে কলুষমুক্ত হওয়ার পরও কাঙ্ক্ষিত সফলতা ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করাও অত্যন্ত জরুরী।

(٨٦) عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عِظْنِىْ وَاَوْجِزْ فَقَالَ اِذَا قُمْتَ فِىْ صَلٰوتِكَ فَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ وَلَا تُكَلِّمْ بِكَلَامٍ تَعْذَرُ مِنْهُ غَدًا وَاَجْمِعِ الْاَيَاسَ مِمَّا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ * (رواه احمد)

৮৬। হযরত আবূ আইয়ূব আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে নিবেদন করল, আমাকে উপদেশ দিন এবং সংক্ষিপ্ত কথায় উপদেশ দিন, (যাতে সহজে স্মরণ রাখতে পারি।) তিনি উত্তরে বললেন ঃ (একটি বিষয় এই মনে রাখবে যে,) যখন তুমি নামাযে দাঁড়াবে, তখন ঐ ব্যক্তির মত নামায আদায় করবে, যে সবাইকে "আলবেদা" বলে চলে যায়। (অর্থাৎ, দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণকারী কোন মানুষ যেভাবে শেষ নামাযটি আদায় করে, তুমি প্রত্যেক নামাযই সেভাবে আদায় করতে চেষ্টা করবে।) আরেকটি বিষয় এই যে, নিজের মুখ দিয়ে এমন কোন কথা বের করবে না, যার দরুন আগামী দিন তোমাকে জবাবদিহি বা দুঃখ প্রকাশ করতে হয়। (অর্থাৎ, কথা বলার সময় সর্বদা এ দিকে লক্ষ্য রাখবে যে, এমন কোন কথা যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে না আসে, যার জন্য এ দুনিয়াতে কারো সামনে কৈফিয়ত দিতে হয় অথবা আখেরাতে আল্লাহ্র সামনে জবাবদিহি করতে হয়। তৃতীয় বিষয়টি এই মনে রাখবে যে,) মানুষের কাছে এবং তাদের হাতে যা কিছু (অর্থ-সম্পদ) দেখবে, সেগুলো থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ নিরাশ বানিয়ে নাও। (অর্থাৎ, তোমাদের আশা-ভরসার কেন্দ্রবিন্দু যেন একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলাই থাকেন, মানুষের প্রতি যেন তোমাদের দৃষ্টি না যায়।) —মুসনাদে আহমাদ

(٨٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلٰثٌ مُنْجِيَاتٌ وَثَلٰثٌ مُهْلِكَاتٌ فَاَمَّا الْمُنْجِيَاتُ فَتَقْوَى اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِى الرِّضَا وَالسَّخَطِ وَالْقَصْدُ فِى الْغِنَا وَالْفَقْرِ وَاَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوٰى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهٖ وَهِىَ اَشَدُّهُنَّ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৮৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিনটি জিনিস আছে মুক্তি দানকারী, আর তিনটি জিনিস আছে ধ্বংসকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলো হচ্ছে ঃ (১) প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহ্কে ভয় করে চলা, (২) খুশী এবং রাগ উভয় অবস্থায় হক কথা বলা, (৩) সচ্ছলতা এবং অসচ্ছলতায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংসকারী বিষয়গুলো হচ্ছে ঃ (১) ঐ কুপ্রবৃত্তি যার অনুসরণ করা হয়, (২) ঐ কৃপণতা, যার চাহিদার উপর চলা হয়, (৩) মানুষের আত্মম্ভরিতার অভ্যাস। আর এটা হচ্ছে এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো তাঁর মজলিসে উপস্থিত লোকদের বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কখনো এমনি ধরনের অন্য কোন কারণে কোন কোন সময় নিজের বক্তব্য ও বাণীতে কোন বিশেষ নেক আমল ও সুন্দর স্বভাবের গুরুত্ব বিশেষভাবে বর্ণনা করতেন। অনুরূপভাবে কোন কোন মন্দ-আমল ও মন্দ স্বভাবের ঘৃণ্যতা ও ধ্বংসকারিতার উপর বিশেষভাবে জোর দিতেন। (আর একজন শিক্ষক ও দীক্ষাগুরুর রীতি এমনই হওয়া চাই।)

আলোচ্য হাদীসটিও এ ধরনের। এখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর সারমর্ম এটাই যে, যে ব্যক্তি ধ্বংস থেকে বাঁচতে চায় এবং মুক্তি লাভ করতে চায়, সে যেন এ উপদেশগুলো বিশেষভাবে মেনে চলে। প্রকাশ্যে এবং গোপনে সে যেন তাক্ওয়ার মূর্তপ্রতীক হয়ে থাকে। কারো প্রতি সন্তুষ্টি থাকুক অথবা অসন্তুষ্টি, সে যেন সর্বাবস্থায় হক ও ইনসাফের কথা বলে। সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতায় যেন মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। অপর দিকে সে যেন কুপ্রবৃত্তি ও কৃপণতার চাহিদার উপর না চলে এবং আত্মম্ভরিতা ও আত্মগর্বের মত ধ্বংসকারী রোগ থেকে নিজেকে রক্ষা করে চলে।

এখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবতঃ আত্মগর্বকে এ জন্য সবচেয়ে মারাত্মক রোগ বলে অভিহিত করেছেন যে, এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি নিজেকে রোগীই মনে করে না; বরং কেউ উপদেশ দিতে গেলে তাকেই ভুল পথের যাত্রী মনে করে। নিঃসন্দেহে ঐ রোগ খুবই জটিল ও দুরারোগ্য, যাকে রোগী কোন রোগই মনে করে না।

(٨٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرْبَعٌ اِذَا كُنَّ فِيْكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ الدُّنْيَا حِفْظُ اَمَانَةٍ وَصِدْقُ حَدِيْثٍ وَحُسْنُ خَلِيْقَةٍ وَعِفَّةٌ فِىْ طُعْمَةٍ * (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

৮৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি গুণ এমন রয়েছে যে, এগুলো যদি তোমার মধ্যে এসে যায়, তাহলে দুনিয়া ছুটে গেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই ঃ (১) আমানতের হেফাযত, (২) কথার সত্যবাদিতা, (৩) চরিত্রের মাধুর্য এবং (৪) খাবার গ্রহণে সতর্কতা। —মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ সামনে গিয়ে আমানতের বর্ণনায় ইন্শাআল্লাহ্ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে যে, শরীঅতের পরিভাষায় আমানত শব্দটি খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ্ তা'আলার এবং অনুরূপভাবে বান্দাদের সকল হক আদায় এবং সব ধরনের প্রতিজ্ঞা রক্ষা এ আমানতের ব্যাপক অর্থের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, যার মধ্যে আমানতের গুণ থাকবে অর্থাৎ, যার অবস্থা এই হবে যে, সে আল্লাহ্ এবং তাঁর বান্দাদের সকল হক সঠিকভাবে আদায় করে যায় এবং এর সাথে তার মুখও সত্য বলায় অভ্যস্ত, চরিত্র-মাধুর্যও তার মধ্যে বিদ্যমান এবং পানাহারের বেলায়ও সে খুব সতর্ক, (অর্থাৎ, সে কেবল হালালই খায়, পরিমাণ অনুযায়ী আহার করে এবং হারাম ও সন্দেহযুক্ত জিনিস থেকে বেঁচে থাকে।) যার মধ্যে এ চারটি গুণের সমাবেশ ঘটবে, সে মানবতার পূর্ণতা অর্জন করে নিতে পারবে, যা এ দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত স্তর। সাথে সাথে

সে আখেরাতের চিরকালীন জীবনে এমন অগণিত অসংখ্য নেয়ামতের অধিকারী হবে, যার একেকটির মূল্য এ জগত এবং জগতের সবকিছুর চাইতে বেশী। তাই এমন ব্যক্তি যদি দুনিয়াতে রিক্তহস্তও থাকে, তবুও তার কোন দুঃখ এবং আক্ষেপ না হওয়া চাই। কেননা, সে যা অর্জন করেছে, তার সামনে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সকল নেয়ামত ও সম্পদ খুবই তুচ্ছ।

(٨٩) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَخْلَصَ اللّٰهُ قَلْبَهُ لِلْاِيْمَانِ وَجَعَلَ قَلْبَهُ سَلِيْمًا وَّلِسَانَهُ صَادِقًا وَّ نَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَّ خَلِيْقَتَهُ مُسْتَقِيْمَةً وَّجَعَلَ اُذُنَهُ مُسْتَمِعَةً وَّ عَيْنَهُ نَاظِرَةً فَاَمَّا الْاُذُنُ فَقَمِعٌ وَاَمَّا الْعَيْنُ فَمُقِرَّةٌ لِمَا يُوْعِي الْقَلْبُ وَقَدْ اَفْلَحَ مَنْ جَعَلَ قَلْبَهُ وَاعِيًا *

(رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

৮৯। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি সফলকাম হয়েছে, যার অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা ঈমানের জন্য খালেছ করে দিয়েছেন এবং তার হৃদয়কে বিশুদ্ধ ও কলুষমুক্ত বানিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ, তার অন্তরকে এমন পরিচ্ছন্ন ঈমান ও বিশ্বাস দান করেছেন, যেখানে কোন সংশয় ও মুনাফেকীর সংমিশ্রণ ও অবকাশ নেই এবং হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদি আত্মিক রোগ থেকেও তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে দিয়েছেন।) তার রসনাকে সত্যভাষী ও নফ্সকে প্রশান্তিময় করে দিয়েছেন। (অর্থাৎ, তার নফ্সকে এমন করে দিয়েছেন যে, আল্লাহ্র স্মরণে ও তাঁর হুকুম পালনে সে স্বস্তি ও শান্তি লাভ করে।) তার স্বভাবকে সোজা ও সঠিক বানিয়ে দিয়েছেন। (ফলে সে মন্দ কাজের দিকে যায় না।) তার কানকে শ্রবণকারী ও চোখকে দ্রষ্টা বানিয়ে দিয়েছেন। (যার ফলে সে কথা শুনে এবং আল্লাহ্র নিদর্শনাবলী দেখে এবং শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করে।) বস্তুতঃ কান হচ্ছে চুঙ্গির ন্যায়, (অর্থাৎ, কথাবার্তা এ পথ দিয়ে অন্তরে এভাবে প্রবেশ করে, যেভাবে কোন জিনিস চুঙ্গির মাধ্যমে বোতলে প্রবেশ করে।) আর চক্ষু হচ্ছে ঐসব বিষয়ের স্থাপনকারী, যা অন্তর সংরক্ষণ করে। আর অবশ্যই ঐ ব্যক্তি সফলকাম যার অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা সংরক্ষণকারী বানিয়ে দিয়েছেন। —মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষ দিকে কান ও চোখ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, এর দ্বারা মানুষের অস্তিত্ব ও জীবনে কান ও চোখের এ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুরুত্ব প্রকাশ করা উদ্দেশ্য যে, অন্তর— যা মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বাদশাহ্তুল্য— এর মধ্যে যেসব জিনিস পৌঁছে এবং প্রভাব সৃষ্টি করে, সেগুলো সাধারণতঃ কান এবং চোখ দিয়েই প্রবেশ করে। তাই মানুষের সফলতা এবং সৌভাগ্য এর উপর নির্ভরশীল যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কানকে শ্রবণকারী এবং চোখকে দ্রষ্টা বানিয়ে দেবেন। সবশেষে বলা হয়েছে, "ঐ মানুষই সফলকাম, যার অন্তরকে আল্লাহ্ তা'আলা সংরক্ষণকারী বানিয়ে দিয়েছেন।" কথাটির মর্ম এই যে, সাফল্য ও সৌভাগ্য দানকারী যে সব বিষয় চোখ ও কানের মাধ্যমে অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে, এগুলোর দ্বারাও সৌভাগ্যের মনযিল পর্যন্ত পৌঁছা কেবল তখনই সম্ভব, যখন অন্তর এগুলো সংরক্ষণ করে এবং এর দ্বারা সর্বদা কাজ নেয়। তাই মানুষের সাফল্য ও সৌভাগ্যের সর্বশেষ ও সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ শর্ত হচ্ছে এই যে, অন্তর যেন নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে যায়।

কুরআন মজীদেও বিভিন্ন জায়গায় মানুষের এ তিনটি শক্তি তথা, কান, চোখ ও অন্তরের আলোচনা এভাবে করা হয়েছে যে, মনে হয়, মানুষের হেদায়াত ও মুক্তি এ তিনটি জিনিসের স্বাভাবিকত্ব এবং এগুলোর সঠিক প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল।

(٩٠) عَنْ عَمْروبْنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ * (رواه الترمذى)

৯০। 'আমর ইবনে মায়মুন আওদী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন ঃ পাঁচটি অবস্থাকে বিপরীত পাঁচটি অবস্থা আসার আগে অতি মূল্যবান মনে কর এবং এগুলোর সদ্ব্যবহার কর ঃ (১) বার্ধক্য আসার পূর্বে তোমার যৌবনকে। (২) অসুস্থতার পূর্বে তোমার সুস্বাস্থ্যকে। (৩) অভাব-অনটনের পূর্বে তোমার সচ্ছলতাকে। (৪) ব্যস্ততার পূর্বে তোমার অবসর সময়কে। (৫) মৃত্যু এসে যাওয়ার পূর্বে তোমার জীবনকে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, মানুষের অবস্থা সবসময় এক রকম থাকে না। তাই আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাকে আমল করার সুযোগ দান করেন, তখন এটাকে আল্লাহ্ তা'আলার নেয়ামত মনে করে এর কদর করা চাই। এ সময় আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন ও আখেরাতের সাফল্য লাভের জন্য যা করা সম্ভব হয়, তাই করে নেওয়া উচিত। কেননা, ভবিষ্যতে এ সুযোগ থাকবে কিনা, কেউ বলতে পারে না।

যদি যৌবনের শক্তি ও উদ্যম থাকে, তাহলে বার্ধক্যের দুর্বলতা ও অপারগতা আসার পূর্বেই এর দ্বারা কাজ নেবে। কেউ যদি বর্তমানে সুস্থ থাকে, তাহলে অসুস্থতার অপারগতার পূর্বেই এর দ্বারা কাজ নিয়ে নেবে। আল্লাহ্ তা'আলা যদি সচ্ছলতা ও ভাল অবস্থা দিয়ে থাকেন, তাহলে অভাব ও দারিদ্র্য আসার পূর্বেই এর দ্বারা নিজের উপকার সাধন করে নেবে। যদি অবসর সময় থাকে, তাহলে ব্যস্ততা ও অস্থিরতার দিন আসার পূর্বেই এর সঠিক মূল্য দিয়ে কাজ করে নেবে। জীবনের পর মৃত্যু অবশ্যই আসবে, যা মানুষের আমলের সুযোগ খতম করে দেবে এবং তওবা এস্তেগফারের দরজাও বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যবান ও আল্লাহ্ প্রদত্ত নেয়ামত মনে করে এর দ্বারা কাজ নিতে অবহেলা করবে না।

(٩١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَنْتَظِرُ اَحَدُكُمْ اِلَّا غِنىً مُطْغِيًا اَوْ فَقْرًا مُنْسِيًا اَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا اَوْ هَرَمًا مُفَنِّدًا اَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا اَوِالدَّجَّالَ وَالدَّجَّالُ شَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ اَوِالسَّاعَةَ وَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ * (رواه الترمذى والنسائى)

৯১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ তোমরা আমলের জন্য প্রতীক্ষায় রয়েছ ঐ সচ্ছলতার যা মানুষকে অবাধ্যতায় লিপ্ত করে দেয় অথবা অপেক্ষা করছ ঐ দরিদ্রতার যা সবকিছুকে ভুলিয়ে দেয়।

অথবা অপেক্ষা করছ এমন ব্যাধির যা স্বাভাবিক অবস্থায় বিপর্যয় নিয়ে আসে অথবা এমন বার্ধক্যের, যা মানুষকে অবোধ বানিয়ে দেয় অথবা অতর্কিতে আগমনকারী মৃত্যুর। অথবা তোমরা অপেক্ষায় রয়েছ দাজ্জালের, আর দাজ্জাল হচ্ছে প্রতীক্ষিত অদৃশ্য মন্দ বিষয়সমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা মন্দ। অথবা তোমরা অপেক্ষায় রয়েছ কেয়ামতের, অথচ কেয়ামত হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ও তিক্ত বিষয়। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্মবাণী এই যে, যেসব মানুষ সময় ও অবসরকে মূল্য দেয় না এবং এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করে না; বরং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও আখেরাতের কল্যাণের জন্য চেষ্টা-সাধনা থেকে উদাসীন থেকে দেহপূজায় নিজের সময় কাটিয়ে দেয়, তারা যেন এ প্রতীক্ষায় রয়েছে যে, উল্লেখিত বিপদসমূহের মধ্য থেকে কোন বিপদ ও বিপর্যয় যখন তাদের মাথার উপর এসে যাবে, তখন তারা জাগ্রত হবে এবং সে সময় তারা আখেরাতের চিন্তা ও এর প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

(٩٢) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُوْلُ قَدَمَا ابْنِ اٰدَمَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمْرِهٖ فِيْمَا اَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهٖ فِيْمَا اَبْلَاهُ وَعَنْ مَالِهٖ مِنْ اَيْنَ اكْتَسَبَهٗ وَفِيْمَا اَنْفَقَهٗ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ * (رواه الترمذى)

৯২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন (যখন মানুষকে আল্লাহ্‌র দরবারে হিসাব-কিতাবের জন্য উপস্থিত করা হবে, তখন) আদম-সন্তানের পদদ্বয় একটুও নড়তে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার কাছে পাঁচটি বিষয়ের প্রশ্ন করা হবে ঃ (১) তার সম্পূর্ণ জীবন ও বয়স সম্পর্কে যে, সে কোন্ কাজে এটা ব্যয় করেছে। (২) বিশেষ করে তার যৌবন সম্পর্কে যে, কিসব কর্মকান্ডে এটা ক্ষয় করেছে। (৩) তার ধন-সম্পর্কে যে, সে কোত্থেকে এবং কোন্ পন্থায় এটা উপার্জন করেছে এবং (৪) কোন্ কাজে ও কোন্ পথে এটা ব্যয় করেছে। (৫) তার এলেম অনুসারে সে কতটুকু আমল করেছে। —তিরমিযী

ফায়দা ঃ প্রত্যেক মানুষ যেন নিজের জীবন, যৌবন, নিজের উপার্জন ও ব্যয় এবং নিজের এলেম অনুযায়ী আমল সম্পর্কে একটু খতিয়ে দেখে এবং একটু ভেবে নেয় যে, আল্লাহ্‌র দরবারে দাঁড় করিয়ে সমগ্র হাশরবাসীর সামনে যখন আমাকে এসব প্রশ্ন করা হবে, তখন আমার অবস্থা ও পরিণাম কী হবে? আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে বিষয়টি সহজ করে দিন, অন্যথায় পরীক্ষার ধরনটি হবে খুবই কঠিন। সেদিন কেবল ঐসব ভাগ্যবান ব্যক্তিরাই অপমান থেকে বাঁচতে পারবে, যারা ঐ মুহূর্তটি আসার পূর্বেই এবং ঐ পরীক্ষার হলে প্রবেশের পূর্বেই এ দুনিয়াতেই এর পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে যাবে এবং জীবন এভাবে কাটাবে, যাতে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজেদের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে।

(٩٣) عَنْ اَبِىْ جُرَىٍّ جَابِرِبْنِ سُلَيْمٍ قَالَ اَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَرَاَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَاْيِهٖ لَا يَقُوْلُ شَيْئًا اِلَّا صَدَرُوْا عَنْهُ قُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قَالُوْا هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ قُلْتُ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُوْلَ

اللهِ مَرَّتَيْنِ قَالَ لَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ السَّلَامُ تَحِيَّةُ الْمَيِّتِ قُلْ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ قُلْتُ اَنْتَ رَسُوْلُ اللهِ ؟ فَقَالَ اَنَا رَسُوْلُ اللهِ الَّذِيْ اِنْ اَصَابَكَ ضُرٌّ فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ وَاِنْ اَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ فَدَعَوْتَهُ اَنْبَتَهَا لَكَ وَاِذَا كُنْتَ بِاَرْضٍ قَفْرٍ اَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعَوْتَهُ رَدَّهَا عَلَيْكَ قُلْتُ اِعْهَدْ اِلَيَّ قَالَ لَا تَسُبَّنَّ اَحَدًا قَالَ فَمَا سَبَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيْرًا وَلَا شَاةً قَالَ وَلَا تُحَقِّرَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَاَنْ تُكَلِّمَ اَخَاكَ وَاَنْتَ مُنْبَسِطٌ اِلَيْهِ وَجْهُكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنَ الْمَعْرُوْفِ وَارْفَعْ اِزَارَكَ اِلٰى نِصْفِ السَّاقِ فَاِنْ اَبَيْتَ فَاِلَى الْكَعْبَيْنِ وَاِيَّاكَ وَاِسْبَالَ الْاِزَارِ فَاِنَّهَا مِنَ الْمَخِيْلَةِ وَاِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيْلَةَ وَاِنِ امْرُءٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيْكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيْهِ فَاِنَّمَا وَبَالُ ذٰلِكَ عَلَيْهِ * (رواه ابوداؤد)

৯৩। আবূ জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় আসলাম (এবং তখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না।) আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, মানুষ তার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করতে আসে এবং তিনি তাদেরকে যাই বলেন, তারা তাই গ্রহণ করে ফিরে যায়। তিনি যাই বলেন, তারা মনেপ্রাণে তাই স্বীকার করে নেয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইনি কে? লোকেরা বলল, ইনি আল্লাহ্র রাসূল। আমি তখন তাঁর খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, আলাইকাস্সালাম ইয়া রাসূলাল্লাহ। কথাটি আমি দু'বার বললাম। তিনি বললেন ঃ আলাইকাস্সালাম আলাইকাস্সালাম বলো না, এটা হচ্ছে মৃত ব্যক্তিদের সালাম। (অর্থাৎ, জাহেলিয়্যত যুগের লোকেরা এভাবে মুর্দাদেরকে সালাম করত, তাই এর স্থলে) তুমি আস্সালামু আলাইকা বল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি আল্লাহ্র রাসূল? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, আমি ঐ আল্লাহ্র রাসূল, যাঁর শান হচ্ছে এই যে, তোমার জীবনে যদি কোন দুঃখ আসে আর তুমি তাঁকে ডাক, তাহলে তিনি তোমার দুঃখ দূর করে দেবেন। তোমার উপর যদি দুর্ভিক্ষ আপতিত হয়, আর তুমি তাঁর কাছে দো'আ কর, তাহলে তিনি ভূমি থেকে ফসল উৎপন্ন করে দেবেন। আর তুমি যদি কোন মরুপ্রান্তরে থাক, আর তোমার বাহনের পশুটি হারিয়ে যায়, তখন তুমি তাঁর কাছে দো'আ করলে তিনি এটা তোমার কাছে ফিরিয়ে দেবেন। জাবের ইবনে সুলাইম বলেন, আমি নিবেদন করে বললাম, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি কখনো কাউকে গালি দিও না। জাবের বললেন, এরপর আমি জীবনে কাউকে গালি দেইনি— কোন স্বাধীন মানুষকেও না, কোন ক্রীতদাসকেও না, কোন উট-ছাগলকেও না। তিনি আরো বললেন ঃ তুমি কোন ভাল কাজকে ছোট করে দেখবে না। এমনকি এটা যদি তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলার মত সামান্য ব্যাপারও হয়। কেননা, এটাও সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত। তুমি তোমার লুঙ্গি পায়ের গোছার মাঝখান পর্যন্ত উঠিয়ে রাখ, এতটুকু যদি করতে না চাও, তাহলে অন্তত পায়ের গিট পর্যন্ত রাখ। ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরিধান করা থেকে বিরত থাক। কেননা, এটা অহংকারের লক্ষণ, আর আল্লাহ্ অহংকার পছন্দ করেন না। কেউ যদি তোমাকে গালি দেয় অথবা তোমার মধ্যে

বিদ্যমান কোন দোষের কারণে তোমাকে লজ্জা দেয়, তাহলে তুমি তার যে দোষের কথা জান, সেটা উল্লেখ করে তাকে লজ্জা দিও না। এতে তার আচরণের সকল অনিষ্ট তারই উপর বর্তাবে। —আবূ দাঊদ

(٩٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَاْخُذُ عَنِّىْ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ اَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَّعْمَلُ بِهِنَّ ؟ قُلْتُ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِيَدِىْ فَعَدَّ خَمْسًا فَقَالَ اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَّاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَّلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ *

(رواه احمد والترمذى)

৯৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাদেরকে সম্বোধন করে একদিন) বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে আমার নিকট হতে এ কয়টি বিষয় গ্রহণ করবে, অতঃপর নিজে এগুলোর উপর আমল করবে অথবা অন্য আমলকারীদেরকে শিখিয়ে দেবে ? আমি নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রস্তুত আছি। তিনি তখন (স্নেহের পরশ দিয়ে) আমার হাতটি তাঁর হস্ত মুবারকে লুফে নিলেন এবং গুণে গুণে এ পাঁচটি বিষয় বলে দিলেন। তিনি বললেন ঃ (১) আল্লাহ্ যেসব বিষয় হারাম করে দিয়েছেন সেগুলো থেকে বিরত থাক। এতে করে তুমি হবে বড় এবাদতকারী। (আর এই এবাদত অধিক পরিমাণে নফল আদায় করার চাইতে উত্তম।) (২) আল্লাহ্ তোমার কিসমতে যা লিখে দিয়েছেন, এর উপর সন্তুষ্ট থাক। এতে করে তুমি হবে বড় ধনী। (৩) নিজের প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার কর, তাহলে তুমি হবে পূর্ণ ঈমানদার। (৪) নিজের জন্য যা পছন্দ কর, অন্য মানুষের জন্যও তাই পছন্দ কর, তবেই তুমি হবে পূর্ণ মুসলমান। (৫) বেশী হাসবে না। কেননা, অধিক হাসি অন্তরকে মুর্দা বানিয়ে দেয়। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ পাঁচটি কথা বলার ইচ্ছা করেছিলেন, তখন উপস্থিত লোকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য এবং তাদের অন্তরকে সম্পূর্ণ জাগ্রত করার জন্য প্রথমেই বললেন ঃ আমি কয়েকটি বিশেষ কথা বলতে ও শিক্ষা দিতে চাই। তোমাদের মধ্যে কে কে এগুলো শিখতে চায় ? তবে যে এগুলো শিখবে, এর যথার্থ হকও তাকে আদায় করতে হবে। আর এর হক হচ্ছে এই যে, সে নিজেও এগুলোর উপর আমল করবে এবং অন্যদেরকেও বলে দেবে, যাতে তারাও আমল করতে পারে।

এতে একথাও জানা গেল যে, যে ব্যক্তি দ্বীনের কথা শিখে, তার উপর এ সংক্রান্ত দু'টি হক বর্তায়। প্রথম হক ও দাবী এই যে, নিজে এর উপর আমল করবে। দ্বিতীয় দাবী এই যে, অন্যদের কাছেও এটা পৌঁছে দেবে এবং বলে দেবে; বরং নিজে পূর্ণরূপে আমল করতে না পারলেও অন্যদের কাছে পৌঁছানোর ব্যাপারে কোনরূপ দ্বিধা করবে না।

এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পাঁচটি বিষয়ের তা'লীম দিয়েছেন, এগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম বিষয়টি তিনি এই বলেছেন যে, বড় এবাদতকারী হচ্ছে ঐ

ব্যক্তি, যে হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে বেঁচে থাকে। যদিও বেশী নফল নামায না পড়ে, বেশী করে নফল রোযা না রাখে এবং যিকির ও তসবীহে বেশী লিপ্ত না থাকে। দ্বিতীয় কথাটি তিনি এই বলেছেন যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্যলিপিতে যে সন্তুষ্ট হয়ে যায়, সে বড়ই স্বস্তির সাথে এবং চিন্তামুক্ত হয়ে জীবন কাটাতে পারে। তৃতীয় বিষয়টি এই যে, প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য অপরিহার্য শর্ত। চতুর্থ বিষয়টি এই যে, পূর্ণ মুসলমান হওয়ার জন্য এটা খুবই জরুরী যে, মানুষ অন্য মানুষের এতটুকু কল্যাণকামী ও হিতাকাঙ্ক্ষী হবে যে, সে নিজের জন্য যা কামনা করে, অন্যদের জন্যও তাই কামনা করবে। পঞ্চম বিষয়টি এই যে, অধিক হাসি বর্জন করতে হবে। কেননা, এ বদভ্যাস মানুষের অন্তরকে মুর্দা ও অনুভূতিহীন করে দেয়।

আল্লাহ্র তওফীকে তাঁর কোন ভাগ্যবান বান্দা যদি আজও এ পাঁচটি বিষয়ের উপর আমল করে, তাহলে দুনিয়াতেই সে জান্নাতের স্বাদ পেয়ে যাবে। তার জীবন পরিচ্ছন্ন ও প্রশান্তিময় হবে, কাছের ও দূরের সকল মানুষ তাকে ভালবাসবে, তার অন্তর আল্লাহ্র যিকিরে জীবন্ত ও সজীব থাকবে। আর আখেরাতে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের যেসব নেয়ামত সে লাভ করবে, এগুলোর মূল্য ও প্রকৃত স্বাদ তো কেবল সেখানে গিয়েই জানা যাবে।

(٩٥) عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ اَمَرَنِيْ خَلِيْلِيْ بِسَبْعٍ اَمَرَنِيْ بِحُبِّ الْمَسَاكِيْنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ دُوْنِيْ وَلَا اَنْظُرَ اِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقِيْ، وَاَمَرَنِيْ اَنْ اَصِلَ الرَّحْمَ وَاِنْ اَدْبَرَتْ، وَاَمَرَنِيْ اَنْ لَا اَسْأَلَ اَحَدًا شَيْئًا وَّاَمَرَنِيْ اَنْ اَقُوْلَ بِالْحَقِّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا، وَّاَمَرَنِيْ اَنْ لَا اَخَافَ فِي اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وَاَمَرَنِيْ اَنْ اُكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ فَاِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ * (رواه احمد)

৯৫। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার প্রিয়তম বন্ধু (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে সাতটি কাজের বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ (১) তিনি আমাকে গরীব-মিসকীনদেরকে ভালবাসতে এবং তাদের কাছাকাছি থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। (২) তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, দুনিয়াতে আমি যেন ঐসব লোকের প্রতি তাকাই, যারা আমার চেয়ে নিম্নস্তরের, (অর্থাৎ, যাদের অর্থ-সম্পদ আমার চেয়েও কম,) আর আমি যেন তাদের দিকে না তাকাই, যারা আমার চেয়ে উচ্চ পর্যায়ের। (অর্থাৎ, পার্থিব আসবাব-উপকরণ যাদেরকে আমার চেয়ে বেশী দেওয়া হয়েছে।) (৩) তিনি আমাকে আরো নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন আত্মীয়তার হক আদায় করে যাই, যদিও তারা আমার সাথে এর বিপরীত আচরণ করে। (৪) তিনি আমাকে এও নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন কারো কাছে কিছু সওয়াল না করি। (অর্থাৎ, নিজের সকল প্রয়োজনের জন্য কেবল আল্লাহ্র কাছেই হাত তুলি, অন্য কারও দ্বারস্থ যেন না হই।) (৫) তিনি এ নির্দেশও দিয়েছেন যে, আমি যেন সর্বক্ষেত্রে সত্য ও ন্যায় কথা বলি, যদি তা তিক্তও হয়। (৬) তিনি আমাকে একথারও নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন আল্লাহ্র পথে কোন নিন্দুকের নিন্দাবাদের পরওয়া না করি। (অর্থাৎ, দুনিয়ার মানুষ আমাকে মন্দ বললেও আমি যেন সে কথাই বলি এবং সে কাজই করি, যা আল্লাহ্র নির্দেশ এবং যাতে তিনি খুশী।) (৭) তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন "লা-হাওলা

ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" বাক্যটি বেশী করে পাঠ করি। কেননা, এ কথাগুলো আরশের নিচের ভান্ডার থেকে আগত। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা অনুবাদের মাঝেই এসে গিয়েছে। এখানে কেবল এ কথাটি উল্লেখযোগ্য যে, "লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্" বাক্যটির তাৎপর্য কি ? যা বেশী করে পাঠ করতে বলা হয়েছে ? এক হাদীসে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা এবং পুণ্য কাজের শক্তি কেবল আল্লাহ্র তওফীকেই বান্দা লাভ করে থাকে। অর্থাৎ, আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং তাঁর তওফীক যদি যুক্ত না হয়, তাহলে বান্দা না গুনাহ থেকে বাঁচতে পারে, আর না নেক আমল করতে পারে। অতএব, বান্দার উচিত, সে যেন সর্বদা আল্লাহ্র কাছে তওফীক এবং তাঁর অনুগ্রহ কামনা করে। তারপর গুনাহ্ থেকে আত্মরক্ষা এবং নেক আমলের সুযোগ যদি ঘটে, তাহলে সে যেন এটাকে নিজের কৃতিত্ব মনে না করে; বরং একান্তই আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ বলে বিশ্বাস করে।

বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, এ বাক্যটি যে তাৎপর্য প্রকাশ করে, কেউ যদি পূর্ণ ধ্যান ও এর মর্মকে সামনে রেখে বেশী করে এটা ওযীফার মত পাঠ করে, তাহলে এটা তার আত্মশুদ্ধির জন্য মহৌষধ।

তরীকতের পীর-মাশায়েখদের মধ্যে "শাযলিয়্যা" তরীকার বুযুর্গগণ তাদের অনুসারী মুরীদদেরকে এ কালেমারই বেশী করে ওযীফা আদায়ের নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

(٩٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَنِىْ رَبِّىْ بِتِسْعٍ خَشْيَةِ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا، وَالْقَصْدِ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَا وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِىْ، وَاُعْطِىَ مَنْ حَرَمَنِىْ، وَاَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِىْ وَاَنْ يَّكُوْنَ صَمْتِىْ فِكْرًا وَّنُطْقِىْ ذِكْرًا، وَّنَظْرِىْ عِبْرَةً وَّاٰمُرَ بِالْعُرْفِ وَقِيْلَ بِالْمَعْرُوْفِ * (رواه رزين)

৯৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার প্রতিপালক আমাকে এ নয়টি বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ (১) আল্লাহ্কে ভয় করা নির্জনে ও প্রকাশ্যে। (২) সত্য ও ন্যায়ের কথা বলা রাগ ও খুশী উভয় অবস্থায়। (অর্থাৎ, এমন যেন না হয় যে, যখন কারো প্রতি অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ থাকবে, তখন তার অধিকার খর্ব এবং তার প্রতি অবিচার করা হবে। আর যখন কারো প্রতি বন্ধুত্ব ও খাতির থাকবে, তখন তার পক্ষপাতিত্ব করা হবে।) (৩) মধ্যপন্থা অবলম্বন করা, অভাব ও স্বাচ্ছন্দ্য উভয় অবস্থায়। (অর্থাৎ, আল্লাহ্ তা'আলা যখন অভাব-অনটনে ফেলে দেন, তখন অধৈর্য হয়ে অস্থিরতা প্রকাশ করবে না, আর তিনি যখন ভাল অবস্থা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করেন, তখন বান্দা যেন আত্মপরিচয় ভুলে গিয়ে অহংকার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত না হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে ঐ মধ্যপন্থা, যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।) (৪) আমার প্রতিপালক আমাকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন ঐ আত্মীয়ের হকও আদায় করি, যে আমার সাথে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করে। (৫) আমি যেন তাদেরকেও দান করি, যারা আমাকে বঞ্চিত করে। (৬) আমি যেন তাদেরকে

ক্ষমা করি, যারা আমার প্রতি জুলুম করে। (৭) আমার নীরবতা যেন চিন্তায় ব্যয় হয়। (অর্থাৎ, আমি যখন চুপ থাকি, তখন যেন চিন্তা-ভাবনায় মগ্ন থাকি। যেমন, আল্লাহ্র নিদর্শন ও গুণাবলী সম্পর্কে চিন্তা করা, এ ভাবনা অন্তরে জাগ্রত করা যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে কি কি দিয়েছেন এবং তাঁর নির্দেশ আমার প্রতি কি, আর আমি কি করে যাচ্ছি? আমার পরিণতি কি হবে? আল্লাহ্র গাফেল বান্দাদেরকে কিভাবে সুপথে এনে তাঁর সাথে মিলিয়ে দেওয়া যায়? মোটকথা, নীরবতার মধ্যে এ ধরনের চিন্তা-ভাবনা হওয়া চাই।) (৮) আমার কথা-বার্তায় যেন আল্লাহ্র যিকির ও স্মরণ থাকে। (অর্থাৎ, আমি যখনই কিছু বলি এবং যাই বলি, এর সম্পর্ক যেন আল্লাহ্র সাথে থাকে, চাই সেটা আল্লাহ্র প্রশংসা হোক, তাঁর বিধি-বিধানের শিক্ষা ও প্রচারই হোক অথবা আল্লাহ্র আহ্কাম ও সীমারেখার হেফাযত হোক। এসব ক্ষেত্রে যে কথা-বার্তা হবে, সবগুলোই যিকির ও আল্লাহ্র স্মরণের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।) (৯) আমার দৃষ্টি যেন শিক্ষা গ্রহণের দৃষ্টি হয়। (অর্থাৎ, আমি যাই দেখি সেখান থেকে যেন শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করি।) আর আমি যেন সৎ কাজের নির্দেশ দিয়ে যাই। —রযীন

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা অনুবাদের ভিতরই হয়ে গিয়েছে। এখানে কেবল একটি বিষয় উল্লেখ করার মত রয়ে গিয়েছে যে, হাদীসের শেষের অংশটি "আমি যেন সৎ কর্মের আদেশ দিয়ে যাই" ঐ নয়টি বিষয়ের বাইরে। এখানে যেন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার ঐ নয়টি বিশেষ হুকুম বর্ণনা করার পর যা তিনি এ সময় বলতে চেয়েছিলেন— আল্লাহ্ তা'আলার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বর্ণনা করে দিলেন, যার জন্য তিনি রাসূল হিসাবে বিশেষভাবে আদিষ্ট ছিলেন এবং যা তাঁর নবুওয়তের উচ্চ মর্যাদার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দাবী। সেটা হচ্ছে সৎ কাজের আদেশ, যার মধ্যে অসৎ কাজে বাধা প্রদানও অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এটা সৎ কাজের আদেশ দানেরই অপর দিক। এ হাদীসটিতে এবং এর পূর্ববর্তী হাদীসটিতেও দ্বীন ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষা ও আদর্শের বিরাট সমন্বয় রয়েছে। সত্য কথা বলতে গেলে—আল্লাহ্ তা'আলা যদি আমলের তওফীক দেন তাহলে আত্মশুদ্ধি ও সুন্দর জীবন লাভের জন্য এ দু'টি হাদীসই যথেষ্ট।

(٩٧) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ اَوْصَانِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ، قَالَ لاَ تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَاِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، وَلاَ تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَاِنْ اَمَرَاكَ اَنْ تَخْرُجَ مِنْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ، وَلاَ تَتْرُكَنَّ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَاِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلٰوةً مَكْتُوْبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللّٰهِ، وَلاَ تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَاِنَّهٗ رَاْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، وَاِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَاِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللّٰهِ، وَاِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَاِنْ هَلَكَ النَّاسُ، وَاِذَا اَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ وَاَنْتَ فِيْهِمْ فَاثْبُتْ، وَاَنْفِقْ عَلٰى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ وَلاَ تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ اَدَبًا وَاَخِفْهُمْ فِى اللّٰهِ * (رواه احمد)

৯৭। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দশটি বিষয়ের ওসিয়ত করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ (১) আল্লাহ্র সাথে কাউকে শরীক করবে না যদিও তোমাকে হত্যা করে ফেলা হয় অথবা আগুনে পুড়িয়ে

ফেলা হয়। (২) পিতা-মাতার অবাধ্যতা করবে না— যদিও তারা তোমাকে এ হুকুম করে যে, নিজের পরিবার-পরিজন ও মাল-সম্পদ ছেড়ে বেরিয়ে যাও। (৩) কোন সময় একটি ফরয নামাযও ইচ্ছাকৃত ছাড়বে না। কেননা, যে ব্যক্তি একটি নামাযও ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয়, তার জন্য আল্লাহ্র পক্ষ থেকে প্রতিশ্রুতি, দায়িত্ব ও নিরাপত্তা শেষ হয়ে যায়। (৪) কখনো মদ্যপান করবে না। কেননা, মদ্যপান হচ্ছে সকল অশ্লীলতার মূল। (এই জন্যই এটাকে সকল পাপের জননী বলা হয়।) (৫) সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, গুনাহর কারণে আল্লাহ্র ক্রোধ নেমে আসে। (৬) জেহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে না— যদি মানুষের লাশের স্তূপও পড়ে যায়। (৭) তুমি যদি কোন জায়গায় অবস্থান কর আর সেখানে মহামারী ও ব্যাপক মৃত্যু দেখা দেয়, তাহলে তুমি সেখানেই অবস্থানরত থাক। (জান বাঁচানোর জন্য সেখান থেকে পালিয়ে যেয়ো না।) (৮) নিজের পরিবার-পরিজনের উপর সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করে যাও। (কৃপণতাও করবে না যে, টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও তাদের কষ্ট হয়, আর নিজের সামর্থ্যের কথা ভুলে বে-হিসাব খরচও করবে না। (৯) তাদেরকে শিষ্টাচার ও আদব শিক্ষা দেওয়ার জন্য (প্রয়োজনের ক্ষেত্রে) কঠোরতাও প্রদর্শন করবে। (১০) তাদেরকে আল্লাহ্র ভয়ও দেখাবে। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটি নিজ মর্মের দিক দিয়ে খুবই স্পষ্ট। তবুও কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করার মত রয়েছে। শরীঅতের প্রসিদ্ধ মাসআলা এবং কুরআন মজীদেও বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তিকে যদি শিরক ও কুফরীর উপর বাধ্য করা হয় আর সে অনুমান করতে পারে যে, আমি যদি অস্বীকারই করতে থাকি, তাহলে আমাকে হত্যা করে ফেলা হবে। এ ক্ষেত্রে তার জন্য এ অনুমতি রয়েছে যে, সে কেবল মুখে কুফরী কথা উচ্চারণ করে সে সময় নিজের জীবন রক্ষা করে নেবে। কিন্তু ঈমানী দৃঢ়তার দাবী এবং উত্তম এটাই যে, মুখেও কুফরী কথা প্রকাশ করবে না— যদিও জীবন চলে যায়। হযরত মো'আয (রাঃ) যেহেতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উপদেশ দিলেন যে, এমন ক্ষেত্রে তিনি যেন ঈমানী দৃঢ়তার দাবীর উপরই আমল করেন এবং জীবনের কোন পরওয়া না করেন।

অনুরূপভাবে পিতা-মাতার আনুগত্যের ব্যাপারে তিনি যে বলেছেন, "তারা যদি নিজের পরিবার-পরিজন ও নিজের উপার্জিত মাল-সম্পদ ছেড়ে বের হয়ে যেতে বলে, তাহলেও তাদের অবাধ্যতা করবে না", এটাও কেবল উত্তম ও অধিক শোভনীয় কাজের বর্ণনা। আর এর মর্ম হচ্ছে এই যে, সন্তানের উচিত, পিতা-মাতার যে কোন কঠিন নির্দেশ ও অপছন্দনীয় সিদ্ধান্তও মেনে নেওয়া। অন্যথায় আসল মাসআলা তো এই যে, পিতা-মাতার এ ধরনের কঠিন ও অযৌক্তিক দাবী পূরণ করা শরীঅতের দৃষ্টিতে ওয়াজিব নয়। হ্যাঁ, কোন সন্তান যদি স্বেচ্ছায় ও খুশীমনে এমন করে, (আর এতে অন্য কারো হক নষ্ট না হয়,) তাহলে এটা উত্তম ও খুব ভাল কথা।

নামায সম্পর্কে তিনি যে বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত এক ওয়াক্ত ফরয নামায ছেড়ে দিল, তার জন্য আল্লাহ্র কোন প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব রইল না, এটা ঐসব হাদীসের একটি, যার ভিত্তিতে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও অন্যান্য কতিপয় ইমাম নামায পরিত্যাগকারীকে হত্যা করার ফতওয়া দিয়েছেন। এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর মত হচ্ছে এই যে, ইসলামী

শাসন কর্তৃপক্ষ তাকে যে শাস্তি দেওয়া উপযোগী মনে করবে, সেই শাস্তিই প্রয়োগ করবে এবং তাকে বন্দী করে রাখবে। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি ও দায়িত্ব উঠে যাওয়ার একটি পদ্ধতি এটাও হতে পারে। যা হোক, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ইচ্ছাকৃত ফরয নামায পরিত্যাগ করার ইসলামে কোন অবকাশ নেই। আর এ গুনাহ্‌টি যদিও দিব্য কুফরী নয়, কিন্তু কুফরীর কাছাকাছি অবশ্যই।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়তবাণীর শেষাংশের সম্পর্ক হচ্ছে সন্তানদের দেখাশুনা, তাদের শাসন ও শিষ্টাচার শিক্ষাদানের সাথে। এ প্রসঙ্গে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বশেষ ওসিয়ত হচ্ছে এই যে, "তাদেরকে আল্লাহ্‌র ভয় দেখাও।" অর্থাৎ, তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই যে, নিজের পরিবার-পরিজনের অন্তরে আল্লাহ্‌র ভয় জাগ্রত করতে থাক। আর এর জন্য যে চেষ্টা-তদ্‌বীর ও কৌশল অবলম্বন করতে হয়, সেটা যেন আমাদের ফরয দায়িত্ব এবং সে জন্য আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আমাদের জবাবদিহি করতে হবে।

(٩٨) عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ اَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا اِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْكِيْ فَقَالَ مَا يُبْكِيْكَ قَالَ يُبْكِيْنِيْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ وَمَنْ عَادٰى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْاَبْرَارَ الْاَتْقِيَاءَ الْاَخْفِيَاءَ الَّذِيْنَ اِذَا غَابُوْا لَمْ يُتَفَقَّدُوْا وَاِنْ حَضَرُوْا لَمْ يُدْعَوْا وَلَمْ يُقَرَّبُوْا قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدٰى يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ * (رواه ابن ماجه والبيهقى فى شعب الايمان)

৯৮। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি একদিন মসজিদে নববীতে আসলেন। তিনি এসে দেখলেন যে, হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কবরের পাশে বসে কাঁদছেন। ওমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার এ কান্নার কারণ কি ? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে ঐ একটি কথা কাঁদাচ্ছে যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছিলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি ঃ সামান্য রিয়াও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কোন প্রিয়জনের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সে যেন স্বয়ং আল্লাহ্‌কে যুদ্ধের আহ্বান জানায়। নিশ্চয়, আল্লাহ্ তা'আলা ঐসব পুণ্যবান খোদাভীরু বান্দাদের ভালবাসেন, যারা এমন পরিচয়বিমুখ যে, কোন মজলিসে তারা অনুপস্থিত থাকলে তাদেরকে খোঁজা হয় না এবং উপস্থিত থাকলে কেউ তাদেরকে ডেকে কাছে টেনে নেয় না। তাদের অন্তর হচ্ছে হেদায়াতের উজ্জ্বল চেরাগ, তারা গভীর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসে। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ হযরত মো'আয (রাঃ) যে হাদীসটির কথা স্বরণ করে কাঁদছিলেন, এর কয়েকটি অংশ রয়েছে। প্রথম বিষয়টি ছিল এই যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সামান্য রিয়াও শিরকের অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতপক্ষে শুধু এ কথাটিই আল্লাহ্‌র ঐসব বান্দাদেরকে

কাঁদানোর জন্য যথেষ্ট, যাদের অন্তরে আল্লাহ্র ভয় থাকে এবং যারা শিরকের জঘন্যতা ও অনিষ্ট সম্পর্কেও জ্ঞান রাখে। কেননা, সূক্ষ্ম ও গোপন ধরনের শিরক থেকে বেঁচে থাকা তাদের জন্যও খুবই কঠিন হয়ে থাকে, যারা এ থেকে বাঁচার চিন্তা এবং চেষ্টাও করে। অনেক সময় এমন হয় যে, আল্লাহ্র কোন বান্দা নিজের আমলকে রিয়া থেকে মুক্ত রাখার পূর্ণ চেষ্টা করে; কিন্তু পরে সে অনুভব করে যে, রিয়ার কিছু সংমিশ্রণ রয়েই গিয়েছে। আল্লাহ্র যথার্থ পরিচয় লাভকারী বান্দাদের সাধারণ অবস্থা এই যে, তারা নেক আমল করে যায় এবং পরে এ কথা অনুভব করে কাঁদে যে, যে ধরনের এখলাছের সাথে আমলটি হওয়া উচিত ছিল, তা আমার ভাগ্যে জুটে নাই। হযরত মো'আয (রাঃ)-এর এ কান্নার মধ্যেও সম্ভবতঃ এ অনুভূতির দখল ছিল।

হযরত মো'আয (রাঃ) বলেন, রিয়া সম্পর্কে এ সতর্ক উচ্চারণের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্বিতীয় যে বিষয়টি সম্পর্কে সতর্ক নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্র সাথে যে সব বান্দার বিশেষ সম্পর্ক থাকে, তাদের ব্যাপারে খুবই সাবধান থাকা চাই। যে কেউ আল্লাহ্র এ প্রিয়পাত্রদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে, সে যেন সরাসরি আল্লাহ্কেই যুদ্ধের জন্য আহ্বান করে এবং আল্লাহ্র ক্রোধ ও গযব নিয়ে খেলতে চায়। তারপর তিনি বললেন ঃ মনে রেখো! আল্লাহ্র ঐসব বান্দারা তাঁর দরবারের প্রেমপাত্র, যারা পুণ্যবান ও তাক্-ওয়ার প্রতীক। কিন্তু আত্মপরিচিতি থেকে বেঁচে থাকার দরুন কেউ তাদের এ বৈশিষ্ট্যের কথা জানেই না। তারা এমন অপরিচিত ও অখ্যাত হয়ে থাকতে চায় যে, কোথাও অনুপস্থিত থাকলে কেউ তাদেরকে খুঁজতে যায় না, আর উপস্থিত থাকলে কেউ তাদেরকে ডেকে নেয় না। তাদের অন্তর কেবল আলোকময় নয়; বরং অন্যদেরকে আলো দানকারী প্রদীপের ন্যায়। তারা তাদের অন্তরের এ আলোর বরকতে ফেতনার কঠিন অন্ধকার থেকে নিজেদের দ্বীন ও ঈমানকে সংরক্ষিত রেখে বেরিয়ে যায়।

হযরত মো'আয (রাঃ)-এর কান্নায় সম্ভবতঃ তাঁর এ অনুভূতিরও দখল ছিল যে, আফসোস! আমরা তো এমন অপরিচিত ও অখ্যাত হয়ে থাকতে পারি নাই, আমাদের জীবন তো এমন দারিদ্র্যপূর্ণ ও অবহেলিত হয়ে কাটে নাই। এটাও সম্ভব যে, তিনি এ অনুভূতি নিয়ে কেঁদেছিলেন যে, হয়তো আল্লাহ্র এমন কোন অখ্যাত প্রিয়পাত্রের হক আমার দ্বারা বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে অথবা আমার পক্ষ থেকে সে কখনো কোন কষ্ট পেয়েছে।

(৯৯) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ اِلٰى اَنْ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْصِنِىْ! قَالَ اُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَاِنَّهٗ اَزْيَنُ لِاَمْرِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ زِدْنِىْ! قَالَ عَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ وَذِكْرِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ فَاِنَّهٗ ذِكْرٌ لَكَ فِى السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَكَ فِى الْاَرْضِ قُلْتُ زِدْنِىْ! قَالَ عَلَيْكَ بِطُوْلِ الصَّمْتِ فَاِنَّهٗ مَطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ وَعَوْنٌ لَكَ عَلٰى اَمْرِ دِيْنِكَ، قُلْتُ زِدْنِىْ! قَالَ اِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضَّحْكِ فَاِنَّهٗ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ، قُلْتُ زِدْنِىْ! قَالَ قُلِ الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا، قُلْتُ زِدْنِىْ! قَالَ لَاتَخَفْ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ قُلْتُ زِدْنِىْ! قَالَ لِيَحْجُزْكَ عَنِ النَّاسِ مَا تَعْلَمُ مِنْ نَفْسِكَ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

৯৯। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হলাম। (তারপর হযরত আবূ যর একটি দীর্ঘ হাদীসের উল্লেখ করলেন, যার অংশ বিশেষ ছিল এই ঃ) আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আমি তোমাকে তাক্ওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা, এ তাক্ওয়া তোমার সকল কাজকে সুশোভিত করে দেবে। আবূ যর বলেন, আমি পুনরায় আরয করলাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ তুমি কুরআন শরীফের তেলাওয়াত এবং আল্লাহ্র যিকিরকে অবশ্য করণীয় বানিয়ে নাও। কেননা, এ তেলাওয়াত ও যিকির আসমানে তোমার আলোচনার ওসীলা হবে এবং দুনিয়াতেও তোমার নূর লাভের কারণ হবে। আমি আবার আরয করলাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ দীর্ঘ নীরবতার অভ্যাস গড়ে তোল। কেননা, এটা শয়তানকে প্রতিরোধ করবে ও তোমার দ্বীনের ব্যাপারে সহায়ক হবে। আমি আবার আরয করলাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ অধিক হাসি থেকে বিরত থাক। কেননা, এ অভ্যাস অন্তরকে মুর্দা বানিয়ে দেয় এবং চেহারার নূর বিনষ্ট করে ফেলে। আমি আবার আরয করলাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ সর্বদা সত্য ও ন্যায়ের কথা বল–যদিও মানুষের কাছে তা তিক্ত মনে হয়। আমি আবার আরয করলাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ্র বেলায় কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারের পরওয়া করবে না। আমি আবার আরয করলাম, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ নিজের যেসব দোষের কথা জান, এটা যেন তোমাকে অন্যের দোষ চর্চা থেকে ফিরিয়ে রাখে। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের অধিকাংশ সময়ের অভ্যাস অনুযায়ী সর্বপ্রথম হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ)কে তাক্ওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন ঃ তাক্ওয়া তোমার জীবনের সকল কর্মকান্ডকে সুন্দর ও সুশোভিত করে তুলবে। একথা স্পষ্ট যে, মানুষ যদি তাক্ওয়াকে নিজের অভ্যাস ও নীতি বানিয়ে নেয়, তাহলে তার সারাটা জীবন আল্লাহ্র আনুগত্য ও দাসত্বের জীবন হয়ে যাবে এবং তার বহির্ভাগ ও অভ্যন্তর ভাগ সবকিছুই সুন্দর হয়ে যাবে। তারপর তিনি কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরের আধিক্যের উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন ঃ এর ফলে আসমানে অর্থাৎ ঊর্ধ্বজগতে ফেরেশতাদের সামনে তোমার আলোচনা হবে। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কোন বান্দা যখন এ দুনিয়াতে আল্লাহ্কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ফেরেশ্তাদের সমাবেশে তার আলোচনা করেন। কুরআন পাকেও এরশাদ হয়েছে ঃ তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। কুরআন তেলাওয়াত ও যিকিরের আরেকটি লাভ ও বরকত তিনি এ বর্ণনা করেছেন যে, এর দ্বারা এ দুনিয়াতেই তুমি একটি নূর লাভ করতে পারবে। যিকির ও তেলাওয়াত দ্বারা আসলে তো নূর বান্দার অন্তরে সৃষ্টি হয়, কিন্তু এর কল্যাণকর প্রভাব বাইরেও অনুভূত হয়।

তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যর (রাঃ)কে খুব চুপ থাকার উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন ঃ এটা হচ্ছে ঐ অস্ত্র, যার দ্বারা শয়তানকে প্রতিহত করা যায় এবং দ্বীনের ক্ষেত্রে এর দ্বারা বিরাট সাহায্য লাভ করা যায়। এটা এক বাস্তব কথা, যা সবাই উপলব্ধি করতে পারে যে, শয়তান মানুষের দ্বীনকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে এ মুখ ও

জিহ্বার পথ দিয়েই। মিথ্যা, পরনিন্দা, অপবাদ, গালি-গালাজ, চোগলখোরী ইত্যাদিই এমন গুনাহ্, যেগুলোতে মানুষ সবচেয়ে বেশী লিপ্ত থাকে। এ জন্যই এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে তাদের মুখের কর্তিত ফসল (অর্থাৎ, লাগামহীন কথা-বার্তা।) তাই বিষয়টি স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি অধিক নীরব থাকার ও কম কথা বলার অভ্যাস গড়ে তুলবে, সে নিজেকে এবং নিজের দ্বীনকে শয়তানের আক্রমণ থেকে বেশী রক্ষা করতে পারবে।

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, বেশী নীরব থাকার মর্ম এই যে, যে কথা বলার কোন প্রয়োজন না হয় এবং যে কথায় আখেরাতে কোন পুণ্য লাভের আশা নেই, এমন কথা থেকে মুখ বন্ধ রাখবে। এ অর্থ নয় যে, ভাল কথাও বলা যাবে না। কিতাবুল ঈমানে এ হাদীস আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ এবং আখেরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভাল কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে।

তারপর তিনি অধিক না হাসার উপদেশ দিতে গিয়ে বললেন ঃ এর দ্বারা অন্তর মরে যায় এবং চেহারা আলোহীন হয়ে যায়। অন্তর মরে যাওয়ার মর্ম এই যে, এতে উদাসীনতা, অনুভূতিহীনতা এবং এক ধরনের অন্ধকার এসে যায়। আর এর প্রভাব বহির্ভাগে এই দেখা যায় যে, চেহারায় ঐ নূর আর থাকে না, যা জীবন্ত ও জাগ্রত অন্তরের অধিকারী মু'মিনদের চেহারায় পরিলক্ষিত হয়।

এ কথোপকথনের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যরকে সর্বশেষ যে উপদেশটি দিয়েছিলেন, তা হচ্ছে এই যে, নিজের দোষ ও গুনাহ্ সম্পর্কে তুমি যা জান, এর চিন্তা তোমার এতটুকু হওয়া চাই যে, অন্যের দোষ ও গুনাহ্ দেখার এবং এর চর্চার কোন ফুরসতই তোমার না থাকে। প্রকৃতপক্ষে যে বান্দা নিজের দোষ ও নিজের গুনাহ্র প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং একজন খাঁটি মু'মিনের মত নিজের নফসের হিসাব গ্রহণ করবে, অন্যের দোষ ও অন্যায় তার চোখে ধরাই পড়বে না; বরং সে নিজেকেই সবচেয়ে বেশী দোষী ও অপরাধী মনে করবে। অন্যের দোষ তো তাদের চোখেই বেশী ধরা পড়ে, যারা নিজের ব্যাপারে চিন্তাশূন্য থাকে।

(١٠٠) عَنْ مُعَاوِيَةَ اَنَّهُ كَتَبَ اِلَى عَائِشَةَ اَنِ اكْتُبِىْ اِلَىَّ كِتَابًا تُوْصِيْنِي فِيْهِ وَلَا تُكْثِرِىْ فَكَتَبَتْ سَلَامٌ عَلَيْكَ، اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ الْتَمَسَ رِضَى اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مَؤُنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَّلَهُ اللّٰهُ اِلَى النَّاسِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ * (رواه الترمذى)

১০০। হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বরাবর একটি পত্র লিখলেন এবং এতে অনুরোধ জানালেন যে, আমাকে একটি পত্রের মাধ্যমে কিছু উপদেশ দান করুন। তবে কথা যেন সংক্ষিপ্ত হয়। উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) লিখলেন ঃ

আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। অতঃপর, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে অসন্তুষ্ট করে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট রাখতে চায়,

মানুষের ঝামেলা থেকে আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে নারায করে মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ্ তাকে মানুষের হাতেই ছেড়ে দিবেন। ওয়াস্ সালাম। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ দুনিয়ার বসবাসকারী মানুষের বিশেষ করে ব্যাপক সম্পর্ক ও ব্যাপক দায়িত্ব পালনকারী মানুষের জীবনে অনেক সময় এমন অবস্থা আসে যে, সে যদি তখন এমন নীতি গ্রহণ করে, যার দ্বারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের আশা করা যায়, তখন এমন অনেক মানুষ তার প্রতি বিরূপভাব পোষণ করে, যাদের সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে এবং অনেক স্বার্থও সংশ্লিষ্ট রয়েছে। এমতাবস্থায় সে যদি তাদের মন জুগিয়ে চলে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা নারায হন। এমন ক্ষেত্রের করণীয় সম্পর্কে এ হাদীসে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে যে, বান্দা যদি তখন আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টির পথ ও নীতি অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং তার প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন এবং সে মানুষের কাছ থেকে যেসব স্বার্থোদ্ধারের আশা পোষণ করে, আল্লাহ্র অনুগ্রহে সেগুলো এমনিতেই লাভ হতে থাকবে। পক্ষান্তরে সে যদি আল্লাহ্র সন্তুষ্টির চিন্তা ও অনুসন্ধান বাদ দিয়ে মানুষকে খুশী রাখতে চায় এবং তাদের মর্জিমত চলে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে নিজের অনুগ্রহ ও সাহায্য থেকে বঞ্চিত করে দেবেন এবং তাকে ঐ বান্দাদের হাতেই ছেড়ে দেবেন, যারা নিজেরাও এ বান্দার মতই পরমুখাপেক্ষী ও অসহায়।

সারকথা এই যে, বান্দা যদি চায় যে, আল্লাহ্ সরাসরি তার সকল প্রয়োজন পূরণ ও সমস্যার সমাধান করে দেন, তাহলে তার জন্য উচিত, সে যেন প্রত্যেক কাজে আল্লাহ্র এবং কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনাকেই নিজের উদ্দেশ্য ও জীবনের মূলনীতি বানিয়ে নেয়। এ ক্ষেত্রে তার অন্তরের ধ্বনি যেন এই হয় ঃ আল্লাহ্র কাছেই আমার সকল প্রয়োজন, মানুষের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। এ উপদেশটি যদিও শব্দের খুবই সংক্ষিপ্ত; কিন্তু চিন্তা করলে দেখা যাবে, মর্ম ও উদ্দেশ্যের বিবেচনায় এটা পূর্ণ একটি বইয়ের সমান।

✪✪✪

কিতাবুল আখলাক

ইসলাম ধর্মে আখলাক ও নৈতিকতার স্থান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষা ও আদর্শে ঈমানের পর যেসব বিষয়ের উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন এবং মানুষের সাফল্য ও সৌভাগ্যকে যেগুলোর উপর নির্ভরশীল বলে উল্লেখ করেছেন, এগুলোর মধ্যে একটি বিষয় এও যে, মানুষ যেন উন্নত চরিত্র অবলম্বন করে এবং মন্দ চরিত্র থেকে নিজেকে হেফাযত করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ পৃথিবীতে নবী হিসাবে প্রেরণ করার যে সকল উদ্দেশ্যের কথা কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হয়েছে, এগুলোর মধ্যে একটি উদ্দেশ্য এও বলা হয়েছে যে, তিনি মানুষের পরিশুদ্ধির কাজ করবেন। আর এ পরিশুদ্ধির মধ্যে চরিত্র সংশোধনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আমি চরিত্র সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি। অর্থাৎ, চরিত্র সংশোধনের কাজটি আমার প্রেরিত হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ও আমার কর্মসূচীর বিশেষ অংশ। আর এটাই হওয়া উচিত ছিল। কেননা, মানুষের জীবন ও এর ফলাফল লাভে চরিত্র ও নৈতিকতার বিরাট গুরুত্ব রয়েছে। মানুষের চরিত্র যদি সুন্দর হয়, তাহলে তার নিজের জীবনও আন্তরিক প্রশান্তি ও আনন্দের সাথে কেটে যাবে এবং অন্যদের জন্যও তার জীবন রহমত ও স্বস্তির কারণ হবে। পক্ষান্তরে কোন মানুষের চরিত্র যদি মন্দ হয়, তাহলে সে নিজেও জীবনের স্বাদ ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকবে, আর যাদের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা ও সম্পর্ক থাকবে, তাদের জীবনও বিস্বাদ ও তিক্ত হয়ে যাবে। এগুলো তো হল সচ্চরিত্রতা ও দুশ্চরিত্রতার নগদ ও পার্থিব ফলাফল, যা আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করে যাচ্ছি। কিন্তু মরণের পর যে জীবন আসবে, সে জীবনে এ দু'টির ফলাফল এর চেয়ে অনেক গুণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ধরা পড়বে। আখেরাতের জীবনে উত্তম চরিত্রের ফল হবে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের সন্তোষ ও জান্নাত, আর মন্দ চরিত্রের ফল হবে আল্লাহ্ তা'আলার ক্রোধ ও জাহান্নামের আগুন। আল্লাহ্ আমাদেরকে হেফাযত করুন।

চরিত্র সংশোধন সম্পর্কীয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব বাণী হাদীসের কিতাবসমূহে সংরক্ষিত রয়েছে, সেগুলো দুই প্রকার ঃ (১) ঐসব হাদীস, যেগুলোতে তিনি মৌলিকভাবে সচ্চরিত্রতার উপর জোর দিয়েছেন এবং এর গুরুত্ব, মর্যাদা ও এর অসাধারণ পরকালীন সওয়াবের কথা ঘোষণা করেছেন। (২) ঐসব হাদীস, যেগুলোতে তিনি বিশেষ বিশেষ উত্তম চরিত্র অবলম্বন করার অথবা অনুরূপভাবে বিশেষ বিশেষ মন্দ চরিত্র থেকে বেঁচে থাকার তাকীদ করেছেন। প্রথমে আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম প্রকারের কিছু বাণী এখানে লিপিবদ্ধ করব।

উত্তম চরিত্রের ফযীলত ও গুরুত্ব

(١٠١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ اَحْسَنَكُمْ اَخْلَاقًا * (رواه البخارى ومسلم)

১০১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল মানুষ তারাই, যারা চরিত্রের দিক দিয়ে ভাল। —বুখারী, মুসলিম

(١٠٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا * (رواه ابوداؤد والدارمى)

১০২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদারদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী তারা, যারা চরিত্রের দিক দিয়ে বেশী ভাল। —আবূ দাঊদ, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, ঈমান ও সচ্চরিত্রতার মধ্যে এমন সম্পর্ক যে, যার ঈমান পরিপূর্ণ হবে, তার চরিত্রও অনিবার্যরূপে সুন্দর হবে। অনুরূপভাবে যার চরিত্র ভাল হবে, তার ঈমানও পূর্ণাঙ্গ হবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, ঈমান ছাড়া আখলাক ও সচ্চরিত্রতার; বরং কোন নেক আমলের এমনকি এবাদতের কোন মূল্য নেই। প্রত্যেক আমল ও পুণ্য কাজের জন্য ঈমান হচ্ছে আত্মা ও প্রাণ স্বরূপ। তাই কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান ছাড়া আখলাক ও সচ্চরিত্রতা দেখা যায়, তাহলে এটা প্রকৃত সচ্চরিত্রতা নয়; বরং আখলাক ও সচ্চরিত্রতার আকৃতি মাত্র। তাই আল্লাহ্র নিকট এর কোন মূল্য নেই।

(١٠٣) عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَثْقَلَ شَيْءٍ يُوْضَعُ فِىْ مِيْزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ * (رواه ابوداؤد والترمذى)

১০৩। হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন মু'মিনের আমলের পাল্লায় সবচেয়ে ভারী যে জিনিসটি রাখা হবে, সেটা হচ্ছে তার উত্তম চরিত্র। —আবূ দাঊদ, তিরমিযী

(١٠٤) عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ قَالَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا خَيْرُ مَا اُعْطِىَ الْاِنْسَانُ ؟ قَالَ اَلْخُلُقُ الْحَسَنُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان والبغوى فى شرح السنة عن اسامة بن شريك)

১০৪। মুযাইনা গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, কিছু সংখ্যক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মানুষকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস কোন্টি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ উত্তম চরিত্র। —বায়হাকী, শরহুস্সুন্নাহ

ব্যাখ্যা ঃ এসব হাদীস দ্বারা এ ফলাফল বের করা ঠিক হবে না যে, উত্তম চরিত্রের মর্তবা ঈমান অথবা ইসলামের আরকানেরও উর্ধ্বে। সাহাবায়ে কেরাম— যাদেরকে উদ্দেশ্য করে এ কথা বলা হয়েছিল, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা এ ব্যাপারে ভালভাবেই অবগত ছিলেন যে, দ্বীনের বিভাগসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চ মর্তবা হচ্ছে ঈমান ও তওহীদের, তারপর আরকানে ইসলামের মর্যাদা এবং এরপরে ইসলামী জিন্দেগীর যে বিভিন্ন অংশ থাকে, এগুলোর মধ্যে বিভিন্ন দিক দিয়ে একটির আরেকটির উপর প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর নিঃসন্দেহে আখলাক ও সচ্চরিত্রতার স্তর খুবই উর্ধ্বে এবং মানুষের সৌভাগ্য ও সাফল্য লাভে এবং আল্লাহ্র দরবারে তাদের গ্রহণযোগ্যতা ও প্রিয়পাত্র হওয়ার ক্ষেত্রে সুন্দর চরিত্রের অবশ্যই বিরাট দখল রয়েছে।

(١٠٥) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهٖ دَرَجَةَ قَائِمِ الَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ * (رواه ابوداؤد)

১০৫। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ঈমানদার ব্যক্তি নিজের সুন্দর চরিত্র দ্বারা ঐসব মানুষের মর্তবা লাভ করে নেয়, যারা রাতভর নফল নামায আদায় করে এবং দিনে সর্বদা রোযা রাখে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, যে বান্দার অবস্থা এই যে, সে আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মের দিক দিয়ে সত্যিকার মু'মিন এবং এর সাথে চরিত্র মাধুর্যও তার মধ্যে বিদ্যমান। এমন ব্যক্তি যদি রাতে বেশী নফল নামায না পড়ে এবং বেশী করে নফল রোযা নাও রাখে, তবুও সে রাত্রি জাগরণ করে নফল আদায়কারী ও বেশী বেশী নফল রোযা পালনকারীদের মর্যাদা লাভ করে নেবে।

(١٠٦) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ كَانَ اٰخِرَمَا وَصَّانِيْ بِهٖ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ وَضَعْتُ رِجْلِيْ فِي الْغَرْزِ اَنْ قَالَ يَا مُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ * (رواه مالك)

১০৬। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সর্বশেষ যে ওসিয়তটি করেছিলেন— যখন আমি আমার পা নিজ সওয়ারীর রেকাবে রেখেছিলাম— সেটা ছিল এই যে, তিনি বলেছিলেন ঃ হে মো'আয! মানুষের জন্য তোমার চরিত্র ও আচার-আচরণকে সুন্দর করে নাও। —মুয়াত্তা মালেক

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র জীবনের শেষ দিকে হযরত মো'আযকে ইয়ামনের প্রাদেশিক গভর্নর করে প্রেরণ করেছিলেন। মদীনা শরীফ থেকে তাকে বিদায় দেওয়ার সময় তিনি খুবই গুরুত্ব সহকারে তাকে অনেকগুলো উপদেশ দিয়েছিলেন— যা হাদীসের কিতাবে বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বয়ং হযরত মো'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। এ হাদীসের ঐ ঘটনার দিকেই ইঙ্গিত করে তিনি বলেছেন যে, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে সওয়ারীতে আরোহণ করতে লাগলাম এবং এর

রেকাব বা পাদানীতে নিজের পদদ্বয় রাখলাম, তখন তিনি শেষ উপদেশ আমাকে এই দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ্‌র বান্দাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে।

মনে রাখা দরকার যে, উত্তম আচরণ ও সুন্দর চরিত্রের দাবী এটা নয় যে, যেসব পেশাদার অপরাধী ও উৎপীড়ক বদমায়েশ কঠিন শাস্তির যোগ্য এবং কঠোর শাস্তি ছাড়া তাদের দমন ও চিকিৎসা সম্ভব নয়— তাদের সাথেও নম্র ও ভদ্র আচরণ করতে হবে। কেননা, এটা নিজের দায়িত্ব পালনে অবহেলা ও অন্যায় প্রতিরোধে চরম দুর্বলতা হিসাবে গণ্য হবে। বস্তুতঃ ন্যায়-ইনসাফ এবং আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সীমা রেখার প্রতি লক্ষ্য রেখে অপরাধীদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা কোন নৈতিক বিধানেই সুন্দর নৈতিকতার পরিপন্থী নয়।

ফায়েদা ঃ এ হাদীসটি আগেও অতিক্রান্ত হয়েছে যে, হযরত মো'আযকে বিদায় দেওয়ার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এ কথাও বলেছিলেন যে, হয়তো এরপর আর আমার সাথে তোমার সাক্ষাত হবে না ; তুমি তখন আমার স্থলে আমার মসজিদ এবং আমার কবরকেই পাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ অভ্যাস যেহেতু এমন কথা বলার ছিল না, তাই হযরত মো'আয এটাই বুঝে নিলেন যে, তিনি নিজের ওফাতের দিকে ইঙ্গিত করছেন এবং হয়তো এ জীবনে আর তাঁর সাক্ষাত নছীব হবে না। তাই তিনি এ কথা শুনে কেঁদে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র মুত্তাকী বান্দারা আমার একান্ত সান্নিধ্যে থাকবে— তারা যেই হোক এবং যেখানেরই হোক। বাস্তবেও তাই হয়েছিল যে, হযরত মো'আযের ইয়ামন থেকে প্রত্যাবর্তন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় আর হয়নি। আর তিনি যখন ফিরে আসলেন, তখন কবর মুবারকই দেখতে পেলেন।

(١٠٧) عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ *

(رواه فى المؤطا ورواه احمد عن ابى هريرة)

১০৭। ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে বর্ণিত, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন ঃ আমাকে এজন্য প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমি যেন উন্নত নৈতিকতার পূর্ণতা দান করি। —মুয়াত্তা মালেক

মুসনাদে আহমাদে হাদীসটি হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর সূত্র উল্লেখ করে বর্ণিত হয়েছে।

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, চরিত্রের সংশোধন এবং উন্নত নৈতিকতার পূর্ণতা দান হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়াতে আগমনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতঃপূর্বেও বলা হয়েছে যে, কুরআন করীমে যে তাযকিয়া ও পরিশুদ্ধিকে তাঁর অন্যতম দায়িত্ব বলে উল্লেখ করা হয়েছে, চরিত্র সংশোধন এর একটা বিশেষ অংশ।

(١٠٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اَحَبِّكُمْ اِلَىَّ اَحْسَنُكُمْ اَخْلَاقًا * (رواه البخارى)

১০৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় তারা, যাদের আখলাক ও চরিত্র বেশী সুন্দর। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে— যা ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন— বলা হয়েছে ঃ তোমাদের মধ্য থেকে আমার নিকট অধিকতর প্রিয় ও কেয়ামতের দিন আমার অধিক সান্নিধ্য লাভকারী লোক তারাই হবে, যাদের আখলাক-চরিত্র তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভাল। এতে বুঝা গেল, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র হওয়ার ক্ষেত্রে এবং কেয়ামতের দিন তাঁর নৈকট্য লাভে সুন্দর চরিত্রের বিরাট দখল ও ভূমিকা রয়েছে।

সুন্দর চরিত্র কামনায় এবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দো'আও পাঠ করে নিন এবং নিজের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ দো'আ করে নিন।

(١٠٩) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَحْسَنْتَ خَلْقِيْ فَاَحْسِنْ خُلُقِيْ * (رواه احمد)

১০৯। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের দো'আয় নিবেদন করতেন ঃ হে আল্লাহ্! তুমি অনুগ্রহ করে আমার দেহের আকৃতিকে সুন্দর বানিয়েছ, এভাবে আমার আখলাক চরিত্রকেও সুন্দর করে দাও। —মুসনাদে আহমাদ

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুন্দর চরিত্র কামনার দো'আ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন শব্দমালায় বর্ণিত হয়েছে। ইন্শাআল্লাহ্ "দো'আ অধ্যায়ে" ঐসব দো'আ উল্লেখ করা হবে। এখানে এগুলোর মধ্য থেকে কেবল একটি দো'আ পাঠ করে নিন।

মুসলিম শরীফে হযরত আলী (রাঃ) হতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাহাজ্জুদ নামাযের কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে। সেই বর্ণনায় দেখা যায় যে, তিনি নামাযের মধ্যে নিজের জন্য যেসব দো'আ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে করতেন, এর মধ্যে একটি দো'আ এও ছিল ঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে সুন্দর থেকে সুন্দরতম আখলাকের পথ দেখাও। তুমি ছাড়া কেউ সুন্দরতম আখলাকের পথ দেখাতে পারে না। তুমি আমা হতে মন্দ আখলাক সরিয়ে রাখ। তুমি ছাড়া কেউ মন্দ আখলাককে আমা থেকে সরিয়ে রাখতে পারবে না।

এ হাদীসগুলো সুন্দর আখলাক ও সুন্দর চরিত্রের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে ছিল। এবার সামনে বিভিন্ন শিরোনামের অধীন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব বাণী লিপিবদ্ধ করা হবে, যেগুলোর মধ্যে তিনি বিশেষ বিশেষ সুন্দর চরিত্র ও সদগুণের প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন অথবা মন্দ চরিত্র ও মন্দ স্বভাব থেকে বেঁচে থাকার জোর নির্দেশ দিয়েছেন।

✪✪✪

সুন্দর চরিত্র ও মন্দ স্বভাব

দয়ার্দ্রতা ও নির্দয়তা

রহমত ও দয়া প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার একটি বিশেষ গুণ এবং রহমান ও রহীম তাঁর বিশেষ নাম। কোন মানুষের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এ গুণের যতটুকু ছায়া ও প্রতিবিম্ব থাকবে, সে ততটুকুই ভাগ্যবান ও আল্লাহ্র রহমতের অধিকারী হবে। আর যে যতটুকু নির্দয় হবে, সে আল্লাহ্র রহমত ও দয়া থেকে ততটুকুই বঞ্চিত থাকবে।

অন্যের প্রতি যারা দয়াশীল তারাই আল্লাহ্র দয়া লাভের উপযুক্ত

(١١٠) عَنْ جَرِيْرِبْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ * (رواه البخارى ومسلم)

১১০। হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ ঐসব মানুষের উপর বিশেষ দয়া করেন না, যারা মানুষের উপর দয়া করে না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে "মানুষ" শব্দটি ব্যাপক অর্থ প্রকাশক, যার মধ্যে মু'মিন, কাফের, মুত্তাকী ও পাপাচারী সবাই অন্তর্ভুক্ত। আর নিঃসন্দেহে দয়া লাভ সবারই অধিকার। তবে কাফের ও পাপাচারীর প্রতি সত্যিকার দয়ার্দ্রতার দাবী এই হওয়া চাই যে, তার কুফর ও পাপাচারের পরিণতির ব্যথা আমাদের অন্তরে থাকতে হবে এবং আমরা তাকে এ মন্দ পরিণতি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে যাব। এ ছাড়া সে যদি দুনিয়াবী অথবা দৈহিক কোন কষ্টে পড়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তাকে এ কষ্ট থেকে উদ্ধার করার চিন্তা করাও অবশ্যই দয়ার্দ্রতার দাবীর অন্তর্ভুক্ত। আমাদেরকে এর নির্দেশও শরীঅতে দেওয়া হয়েছে।

(١١١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الْاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ * (رواه ابوداؤد والترمذى)

১১১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দয়াশীল মানুষের উপর মহান দয়াময় দয়া করে থাকেন। তোমরা পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি দয়া কর, আসমানের অধিপতি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। —আবূ দাঊদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্র বিশেষ রহমত ও অনুগ্রহের অধিকারী কেবল ঐসব পুণ্যাত্মা বান্দারাই, যাদের অন্তরে অন্যান্য সৃষ্টির প্রতি দয়া ও দরদ থাকে।

এ হাদীসে ভূ-পৃষ্ঠে বসবাসকারী সকল সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করতে বলা হয়েছে। এর

মধ্যে সকল শ্রেণীর মানুষসহ পশুরাও অন্তর্ভুক্ত। সামনের হাদীসগুলোতে এ ব্যাপক অর্থের স্পষ্ট উল্লেখও করা হয়েছে।

এক ব্যক্তি পিপাসিত কুকুরকে পানি পান করিয়ে ক্ষমা পেয়ে গেল

(١١٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِىْ بِطَرِيْقٍ اِشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطْشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطْشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ بَلَغَ بِىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَاءَ خُفَّهٗ ثُمَّ اَمْسَكَهٗ بِفِيْهِ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهٗ فَغَفَرَ لَهٗ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَاِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا ؟ فَقَالَ نَعَمْ فِىْ كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ * (رواه البخارى ومسلم)

১১২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক সময় এক ব্যক্তি পথ চলছিল। এমন সময় তার খুব পিপাসা লেগে গেল। এর মধ্যে সে একটি কূপের সন্ধান পেয়ে গেল এবং এতে নেমে সে পানি পান করে উপরে উঠে আসল। কূপ থেকে বেরিয়ে এসে সে দেখল যে, একটি কুকুর জিহ্বা বের করে প্রচন্ড পিপাসায় কাদা-মাটি খাচ্ছে। লোকটি তখন মনে মনে বলল, পিপাসার কারণে এ কুকুরটিরও তেমনই কষ্ট হচ্ছে, যেমন আমার হচ্ছিল। তাই সে কুকুরটির প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে আবার কূপের মধ্যে নেমে গেল এবং নিজের চামড়ার মোজায় পানি ভরে সেটা মুখে আগলে ধরে কূপ থেকে বেরিয়ে আসল। তারপর কুকুরটিকে এ পানি পান করাল। ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তার এ দয়ার্দ্রতার খুবই মূল্যায়ন করলেন এবং এ কর্মের প্রতিদানে তার ক্ষমার ফায়সালা করে দিলেন।

এ ঘটনা শুনে কিছু সংখ্যক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুদের কষ্ট দূর করে দেওয়ার মধ্যেও আমাদের জন্য সওয়াব রয়েছে? তিনি উত্তর দিলেন ঃ হ্যাঁ, প্রতিটি তাজা কলিজার (অনুভূতিশীল ঘ্রাণের) অধিকারী প্রাণীর (কষ্ট দূর করে দেওয়ার) মধ্যে তোমাদের জন্য পুণ্য রয়েছে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অনেক সময় একটি সাধারণ ও নগণ্য কাজও অন্তরের বিশেষ অবস্থা ও অবস্থা বিশেষের কারণে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে বিরাট গ্রহণযোগ্যতা ও কবূলিয়্যত লাভ করে নেয় এবং এ কর্ম সম্পাদনকারী এর বিনিময়ে ক্ষমা পেয়ে যায়। এ হাদীসে যে ঘটনার বিবরণ দেখা যায়, এটার ধরনও ঠিক ঐরূপ। আপনি একটু ভেবে দেখুন! এক ব্যক্তি গরমের মৌসুমে নিজের বাড়ীর দিকে যাচ্ছে, আর এর মধ্যে তার পিপাসা লেগে গেল। এরই মধ্যে সে একটি কূপ দেখতে পেল। কিন্তু সেখানে পানি উত্তোলনের কোন উপকরণ-রশি-বালতি ইত্যাদি কিছুই নেই। এ জন্য বাধ্য হয়ে লোকটি পানি পান করার জন্য নিজেই কুয়ায় নেমে পড়ল এবং সেখানেই পানি পান করে উপরে উঠে আসল। এবার তার নজর পড়ল একটি কুকুরের প্রতি, যে প্রচণ্ড পিপাসার কারণে কাদামাটি চেটে খাচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে ঐ লোকটির অন্তর ব্যথিত হল এবং তার মনে এ আগ্রহ জাগ্রত হল যে, আমি এটাকেও পানি পান করিয়ে ছাড়ব। এ সময় একদিকে তো তার অবস্থার দাবী এই ছিল যে, নিজের পথ ধরে কোনক্রমে দ্রুত বাড়ী ফিরে

গিয়ে আরাম করে নেয়। অপর দিকে তার দয়ার্দ্র অনুভূতির চাপ এই ছিল যে, আমার পথ চলা যতই কঠিন হোক এবং কূপ থেকে পানি উঠাতে আমার যত কষ্টই হোক, আমি আল্লাহ্‌র এ সৃষ্টিকে পিপাসার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেবই। এ দু'টানা অবস্থার পর সে যখন নিজের আরামের দাবী উপেক্ষা করে দয়ার্দ্র অনুভূতির দাবী পূরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং কুয়ায় নেমে চামড়ার মোজায় পানি ভরে এনে এ পিপাসিত কুকুরকে পান করাল, তখন আল্লাহ্ তা'আলার রহমতের দরিয়ায় ঢেউ এসে গেল এবং এর উপরই তার ক্ষমার ফায়সালা হয়ে গেল।

সারকথা, তার ক্ষমা প্রাপ্তির এ ফায়সালার সম্পর্ক কেবল কুকুরকে পানি পান করানোর সাথেই একথা মনে করা ঠিক হবে না; বরং যে বিশেষ অবস্থায় এবং যে অনুভূতি নিয়ে সে এ কাজটি করেছিল সেটা আল্লাহ্ তা'আলার কাছে খুবই পছন্দনীয় হয়ে গেল এবং এরই উপর ঐ বান্দার ক্ষমার ফায়সালা করে দেওয়া হল।

(١١٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاِذَا فِيْهِ جَمَلٌ فَلَمَّا رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ فَاَتَاهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ فَسَكَتَ مَنْ رَبُّ هٰذَا الْجَمَلِ ؟ لِمَنْ هٰذَا الْجَمَلُ ؟ فَجَاءَ فَتًى مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ لِيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَقَالَ لَهُ اَفَلَا تَتَّقِي اللّٰهَ فِيْ هٰذِهِ الْبَهِيْمَةِ الَّتِيْ مَلَّكَكَ اِيَّاهُ ؟ فَاِنَّهُ شَكٰى اِلَيَّ اَنَّكَ تُجِيْعُهُ وَتُدْئِبُهُ * (رواه ابوداؤد)

১১৩। আব্দুল্লাহ্ ইবনে জা'ফর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক আনসারী সাহাবীর এক বাগানে তশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি উট দেখা গেল। উটটি যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখল, তখন সে খুবই করুন সুরে কাঁদতে লাগল এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি তখন তার কাছে গেলেন এবং তার কানের উপর স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিলেন। উটটি এবার শান্ত হয়ে গেল। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ উটটি কার ? এ উটের মালিক কে ? একথা শুনে এক আনসারী যুবক এগিয়ে আসল এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উটটি আমার। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ তুমি কি এ নির্বাক প্রাণীটির ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে ভয় কর না, যিনি তোমাকে এর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন ? সে আমার কাছে অভিযোগ করেছে যে, তুমি তাকে অনাহারে রাখ এবং অতিরিক্ত কাজ করিয়ে তাকে কষ্ট দিয়ে থাক। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ হযরত সুলায়মান (আঃ) যেভাবে আল্লাহ্‌র হুকুমে মু'জেযা হিসাবে পাখীদের ভাষা বুঝে নিতেন— যার উল্লেখ কুরআন মজীদেও করা হয়েছে ঃ (আমাকে পাখীদের ভাষা শিখানো হয়েছে।) তেমনিভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও অলৌকিকভাবে পশুদের কথা-বার্তা বুঝে নিতে পারতেন। এ হাদীসে একটি উটের অভিযোগ বুঝে নেওয়ার এবং এর পরবর্তী হাদীসে একটি পাখীর অভিযোগ বুঝে নেওয়ার যে উল্লেখ রয়েছে, এটাও বাহ্যত এ ধরনেরই ঘটনা এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু'জেযা বিশেষ।

হাদীসটির বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এই যে, যার কাছে কোন পশু থাকে, তার দায়িত্ব হচ্ছে, সে যেন এর আহার ও পানীয়র ব্যাপারে উদাসীন হয়ে না থাকে এবং তার শক্তির বাইরে কোন কাজের বোঝাও তার উপর চাপিয়ে না দেয়।

পৃথিবী "নির্দয়তা প্রতিরোধ"-এর দায়িত্ব বর্তমানে কিছুটা উপলব্ধি করছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ বছর পূর্বেই দুনিয়ার মানুষকে এ শিক্ষা দিয়েছিলেন।

(١١٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَاَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ فَجَعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا ؟ رُدُّوْ وَلَدَهَا اِلَيْهَا ---- وَرَاٰى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَقَ هٰذِهِ ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اِنَّهُ لَا يَنْبَغِىْ اَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ اِلَّا رَبُّ النَّارِ *

(رواه ابوداؤد)

১১৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের পুত্র আব্দুর রহমান তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। এক সময় তিনি এস্তেঞ্জা করতে গেলেন। এর মধ্যে আমরা একটি ছোট লাল পাখী (সম্ভবতঃ নীলকণ্ঠ হবে।) দেখলাম, যার সাথে তার দু'টি ছোট বাচ্চাও ছিল। আমরা এ বাচ্চা দু'টি ধরে ফেললাম। এমতাবস্থায় ঐ পাখিটি আসল এবং আমাদের মাথার উপর ঘুরতে লাগল। এরই মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে গেলেন। তিনি বললেন ঃ কে এ পাখীর বাচ্চাগুলো ধরে নিয়ে একে জ্বালাতন করছে ? এর বাচ্চাগুলো একে ফিরিয়ে দাও।

আরেকবার তিনি পিপিলিকার একটি আবাস দেখলেন, যা আমরা আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম। তিনি বললেন, কে এখানে আগুন দিয়েছে ? আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরাই আগুন দিয়েছি। তিনি বললেন ঃ আগুনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো পক্ষেই কোন প্রাণীকে আগুন দ্বারা শাস্তি দেওয়া সমীচীন নয়। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসগুলো দ্বারা জানা গেল যে, পশু-পাখী এমনকি পিপিলিকারও এ হক রয়েছে যে, অহেতুক এগুলোকে উৎপীড়ন করা যাবে না।

(١١٥) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَتْ اِمْرَأَةٌ النَّارَ فِىْ هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَاْكُلُ مِنْ خُشَاشِ الْاَرْضِ * (رواه البخارى ومسلم)

১১৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক নির্দয় মহিলা এ কারণে জাহান্নামে গেল যে, সে একটি বিড়ালকে বন্দী করে রেখেছিল (এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় তাকে মেরে ফেলেছিল।) সে নিজেও তাকে কিছু খেতে দেয়নি এবং তাকে মুক্তও করে দেয়নি যে, সে পোকা-মাকড় খেয়ে জীবন রক্ষা করবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হযরত জাবের (রাঃ)-এর এক রেওয়ায়াত দ্বারা জানা যায় যে, এ নির্দয় মহিলাটি ছিল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজ রজনীতে বা স্বপ্নে কিংবা জাগ্রত কাশফের মাধ্যমে তাকে জাহান্নামের আযাবে নিপতিত দেখেছিলেন।

যা হোক, এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, পশু-প্রাণীদের সাথে নির্মম আচরণ আল্লাহ্ তা'আলাকে খুবই নারায করে দেয় এবং এ ধরনের কর্ম মানুষকে জাহান্নামে নিয়ে যায়।

(١١٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ الصَّادِقَ الْمَصْدُوْقَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا تُنْزَعُ الرَّحْمَةُ اِلَّا مِنْ شَقِىٍّ * (رواه احمد والترمذى)

১১৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দয়া-অনুগ্রহের সদগুণ কেবল হতভাগ্যদের অন্তর থেকেই ছিনিয়ে নেওয়া হয়। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, দয়া ও সহানুভূতির সদগুণ থেকে কারো অন্তর সম্পূর্ণ শূন্য থাকা এ কথার লক্ষণ যে, সে আল্লাহ্র কাছে খুবই হতভাগা। কেননা, কেবল হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তরই দয়া ও অনুগ্রহ থেকে শূন্য হয়ে থাকে।

(١١٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً شَكَا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسْوَةَ قَلْبِهٖ قَالَ اِمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيْمِ وَاَطْعِمِ الْمِسْكِيْنَ * (رواه احمد)

১১৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজের পাষাণ হৃদয় সম্পর্কে অভিযোগ করল। তিনি বললেন ঃ ইয়াতীমের মাথায় (স্নেহের) হাত বুলাও, মিসকীনকে খাবার দাও। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ অন্তরের কাঠিন্য ও নিষ্ঠুরতা একটি আত্মিক রোগ এবং মানুষের হতভাগা হওয়ার একটি বিশেষ লক্ষণ। এখানে প্রশ্নকারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজের আত্মার এ রোগের কথা উল্লেখ করে এর চিকিৎসা জানতে চেয়েছিলেন। এর উত্তরে তিনি দু'টি বিষয়ের পথ নির্দেশ দিলেন ঃ (১) ইয়াতীমের মাথায় স্নেহের হাত বুলাও, (২) আর ক্ষুধার্ত ফকীর-মিসকীনকে আহার দিয়ে যাও।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত এ চিকিৎসাটি মনোবিজ্ঞানের এক বিশেষ ভিত্তি ও মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত; বরং বলা উচিত যে, এ হাদীস দ্বারা ঐ মূলনীতির সমর্থন ও পোষকতা পাওয়া যায়। ঐ মূলনীতিটি হচ্ছে এই যে, যদি কোন ব্যক্তির মনে অথবা অন্তরে কোন বিশেষ অবস্থা ও ভাব না থাকে এবং সে এটা সৃষ্টি করতে চায়, তাহলে এর একটি কৌশল এও যে, সে এ অবস্থার প্রভাব ও এর উপাদানগুলো অবলম্বন করে নেবে। এভাবে ইন্শাআল্লাহ্ কিছু দিনের মধ্যে তার অন্তরে ঐ বিশেষ অবস্থা ও ভাব জন্ম নিয়ে নেবে। অন্তরে আল্লাহ্র ভালবাসা সৃষ্টি করার জন্য অধিক পরিমাণে যিকির করার যে পদ্ধতি সুফিয়ায়ে কেরামের মধ্যে প্রচলিত, এর ভিত্তিও এ মূলনীতির উপরই।

যাহোক, ইয়াতীমের মাথায় হাত বুলানো এবং মিসকীনকে আহার দান প্রকৃতপক্ষে দয়ার্দ্রচিত্ততার প্রভাব বিশেষ। কিন্তু কারো অন্তর যদি এ আবেগ ও অনুভূতি থেকে শূন্য থাকে, আর সে এ কাজ লৌকিকতা রক্ষার জন্যও করে যায়, তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ্ ধীরে ধীরে তার অন্তরেও দয়ার ভাব সৃষ্টি হয়ে যাবে।

বদান্যতা ও কৃপণতা

বদান্যতা অর্থাৎ নিজের উপার্জিত সম্পদ অন্যের জন্য ব্যয় করা এবং অন্যদের কাজ উদ্ধার করে দেওয়া এটাও দয়া-অনুগ্রহেরই একটি শাখা। অনুরূপভাবে কৃপণতা ও চরম ব্যয়কুণ্ঠ হওয়া অর্থাৎ, অন্যের প্রয়োজনে অর্থ ব্যয় না করা ও অন্যের কাজে না আসা নির্দয়তা এবং নিষ্ঠুরতারই একটি বিশেষ লক্ষণ। এ দু'টি বিষয়ের ব্যাপারেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী শুনুন ঃ

(١١٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِنَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّارِ- وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِنَ اللّٰهِ بَعِيْدٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِىٌّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ * (رواه الترمذى)

১১৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দানশীল বান্দা আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী। (অর্থাৎ, সে আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভে ধন্য।) মানুষেরও নিকটবর্তী (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বান্দারা তার এ বদান্যতার গুণের কারণে তার সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসা রাখে এবং তার পাশে থাকে।) সে জান্নাতের নিকটবর্তী এবং জাহান্নাম থেকে দূরে। আর কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে। (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের নেয়ামত থেকে বঞ্চিত।) আল্লাহ্‌র বান্দাদের থেকেও দূরে। (কেননা, তার কৃপণতার কারণে মানুষ তার থেকে দূরে এবং সম্পর্কহীন হয়ে থাকে।) সে জান্নাত থেকেও দূরে এবং জাহান্নামের নিকটবর্তী। নিশ্চয়, একজন এলেমহীন দানশীল ব্যক্তি একজন কৃপণ আবেদের চেয়ে আল্লাহ্‌র নিকট অধিক প্রিয়। —তিরমিযী

(١١٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْفِقْ اُنْفِقْ عَلَيْكَ * (رواه البخارى ومسلم)

১১৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে বান্দা! তুমি অন্যের উপর খরচ কর, আমি তোমার উপর খরচ করে যাব। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার এটা এক চিরন্তন ঘোষণা যে, যেসব বান্দা নিজেদের উপার্জিত ধন-সম্পদ অন্য অভাবীদের জন্য খরচ করে যাবে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের ভাণ্ডার থেকে তাদেরকে অব্যাহতভাবে দিয়ে যাবেন এবং অভাব-অনটনের কষ্ট থেকে তাদেরকে সর্বদা রক্ষা করা হবে।

(١٢٠) عَنْ جَابِرٍ قَالَ مَا سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ فَقَالَ لَا * (رواه البخارى ومسلم)

১২০। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এমন কখনো হয়নি যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন জিনিস চাওয়া হয়েছে আর তিনি তখন "না" বলেছেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতার এ অবস্থা ছিল যে, তিনি কখনো কোন সাহায্যপ্রার্থীকে "না" বলে ফেরত দেননি; বরং তিনি প্রত্যেক সাহায্যপ্রার্থীকেই যথাসাধ্য দান করেছেন। কখনো কখনো এমনও হয়েছে যে, নিজের কাছে না থাকলে তিনি ঋণ করে হলেও দিয়েছেন।

(١٢١) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عِنْدِيْ مِثْلُ اُحُدٍ ذَهَبًا لَسَرَّنِيْ اَنْ لَا يَمُرَّ عَلَىَّ ثَلٰثُ لَيَالٍ وَعِنْدِيْ مِنْهُ شَيْءٌ اِلَّا شَيْءٌ اَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ * (رواه البخارى ومسلم)

১২১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কাছে যদি উহুদ পাহাড়ের সমান সোনাও থাকে, তাহলে আমার আনন্দ এতেই হবে যে, আমার উপর দিয়ে তিনটি রাত এমন অতিক্রান্ত না হোক যে, এর কিছু অংশ আমার কাছে থেকে যায়। তবে কোন ঋণ আদায়ের জন্য যদি এখান থেকে কিছু রেখে দেই। —বুখারী, মুসলিম

(١٢٢) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْاِيْمَانُ فِيْ قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا * (رواه النسائى)

১২২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কৃপণতা এবং ঈমান কোন বান্দার অন্তরে এক সাথে থাকতে পারে না। —নাসায়ী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, সত্যিকার ঈমান ও কৃপণতার অভ্যাসের মধ্যে এমন বৈপরিত্ব রয়েছে যে, যে অন্তরে প্রকৃত ঈমান লাভ হবে, সেখানে কৃপণতা আসতে পারবে না। আর যার মধ্যে কৃপণতা দেখা যাবে, সেখানে মনে করতে হবে যে, এ অন্তরে ঈমানের নূর নেই। একটু চিন্তা করলে সবাই বুঝতে পারবে যে, আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও গুণাবলীর উপর পূর্ণ ঈমান ও আস্থা থাকার পর কারো অন্তরে কৃপণতার মত কোন কুস্বভাবের স্থান হতে পারে না।

(١٢٣) عَنْ اَبِيْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَبٌّ وَلَا بَخِيْلٌ وَلَا مَنَّانٌ * (رواه الترمذى)

১২৩। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতারণাকারী, কৃপণ ও উপকার করে খোঁটা দানকারী জান্নাতে যেতে পারবে না। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ মর্ম এই যে, এ তিনটি মন্দ স্বভাব (প্রতারণা, কৃপণতা ও অনুগ্রহ করে তা প্রকাশ করা) ঐসব আশংকাজনক ও ধ্বংসাত্মক অভ্যাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো জান্নাতের পথে বাধা ও অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। এ জন্য যেসব বান্দা জান্নাত লাভে আগ্রহী ও জাহান্নাম থেকে ভীত, তাদের উচিত, নিজেদেরকে এসব মন্দ স্বভাব থেকে দূরে রাখা।

প্রতিশোধ না নেওয়া ও ক্ষমা করে দেওয়া

দয়ার্দ্রচিত্ততার মূল থেকে যে সকল শাখা-প্রশাখা বের হয়, এগুলোর মধ্যে একটি শাখা এও যে, অপরাধী ও অন্যায়কারীকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে এবং তার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের উম্মতকে এ বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করতেন। কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে "কিতাবুর রিকাক"-এর শেষ দিকে হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ)-এর বর্ণনায় এ হাদীস লিখে আসা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে আমার প্রতিপালক নয়টি বিষয়ের বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলোর মধ্যে তিনি একটি বিষয় এই উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, কেউ আমার প্রতি অন্যায় আচরণ করলে আমি যেন তাকে ক্ষমা করে দেই। এ ধারার দু'একটি হাদীস এখানেও পাঠ করে নিন।

(١٢٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلاً شَتَمَ اَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ يَتَعَجَّبُ وَيَتَبَسَّمُ فَلَمَّا اَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَغَضِبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فَلَحِقَهُ اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَانَ يَشْتِمُنِىْ وَاَنْتَ جَالِسٌ فَلَمَّا رَدَدْتُ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ غَضِبْتَ وَقُمْتَ قَالَ كَانَ مَعَكَ مَلَكٌ يَرُدُّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَدَدْتَ عَلَيْهِ وَقَعَ الشَّيْطَانُ ثُمَّ قَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ ثَلٰثٌ كُلُّهُنَّ حَقٌّ مَا مِنْ عَبْدٍ ظُلِمَ بِمَظْلَمَةٍ فَيُغْضِىْ عَنْهَا لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ اِلَّا اَعَزَّ اللّٰهُ بِهَا نَصْرَهُ وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ عَطِيَّةٍ يُرِيْدُ بِهَا صِلَةً اِلَّا زَادَ اللّٰهُ بِهَا كَثْرَةً، وَمَا فَتَحَ رَجُلٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ يُرِيْدُ بِهَا كَثْرَةً اِلَّا زَادَ اللّٰهُ بِهَا قِلَّةً * (رواه احمد)

১২৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে গালি দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানেই বসা ছিলেন এবং (তিনি ঐ ব্যক্তির অব্যাহত গালিদান এবং আবূ বকরের ধৈর্য ধারণ ও নীরবতায়) আশ্চর্যান্বিত হচ্ছিলেন এবং মুচকি হাসছিলেন। তারপর সে যখন গালি দিতে গিয়ে সীমা ছাড়িয়ে গেল, তখন আবূ বকরও তার কিছু কথার প্রতিউত্তর দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন কিছুটা অসন্তুষ্টি নিয়ে সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। আবূ বকর তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে ছুটলেন এবং নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি হল যে, ঐ লোকটি আমাকে গালি দিয়ে যাচ্ছিল আর আপনি সেখানে বসা ছিলেন। তারপর আমি যখন তার কথার প্রতিউত্তর দিলাম, তখন আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে আসলেন ? তিনি তখন বললেন ঃ

যতক্ষণ তুমি নিশ্চুপ ছিলে, ততক্ষণ একজন ফেরেশতা তোমার পক্ষ হতে উত্তর দিয়ে যাচ্ছিল এবং তার কথার প্রতিবাদ করছিল। তারপর তুমি নিজে যখন উত্তর দিতে শুরু করলে, তখন (ঐ ফেরেশতা চলে গেল এবং) শয়তান মাঝে এসে গেল। (কেননা, সে এ ব্যাপারে আশান্বিত হয়ে গেল যে, তোমাদের ঝগড়া সে দীর্ঘস্থায়ী করতে পারবে।) তারপর তিনি বললেন ঃ হে আবূ বকর! তিনটি বিষয় রয়েছে, এর সবগুলোই সত্য ঃ (১) যে কোন বান্দার উপর জুলুম ও বাড়াবাড়ি করা হয় আর সে কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য তা ক্ষমা করে দেয় (এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করে না,) আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তাকে সাহায্য করেন এবং তার সম্মান বাড়িয়ে দেন। (২) যে ব্যক্তি আত্মীয়তার হক রক্ষা করার জন্য কাউকে কিছু দান করার দরজা খুলে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা এর বিনিময়ে তাকে আরো বেশী দিয়ে থাকেন। (৩) যে ব্যক্তি (একান্ত অপারগতা ছাড়া) কেবল সম্পদ বৃদ্ধির জন্য সওয়াল ও ভিক্ষাবৃত্তির দরজা খুলে দেয়, আল্লাহ্ তা'আলা তার অভাব আরো বাড়িয়ে দেন। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ ন্যায়-ইনসাফের সাথে জুলুমের প্রতিশোধ নেওয়া যদিও জায়েয; কিন্তু উন্নত নৈতিকতা ও উচ্চস্তরের দ্বীনদারীর দাবী এটাই যে, প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা করে দেবে। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) যেহেতু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন, তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পক্ষ থেকে সামান্য প্রতিউত্তরকেও পছন্দ করলেন না।

কুরআন মজীদেও এরশাদ হয়েছে ঃ মন্দের (আইনগত) প্রতিফল তো অনুরূপ মন্দই, তবে যে ক্ষমা করে দেয় ও প্রতিশোধ না নেয়, তার পুরস্কার আল্লাহ্র নিকট অবধারিত। (সূরা শোরা ঃ রুকু ৪)

(١٢٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُوْسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَا رَبِّ مَنْ اَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ قَالَ مَنْ اِذَا قَدَرَ غَفَرَ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১২৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হযরত মূসা ইবনে ইমরান আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে আরয করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আপনার বান্দাদের মধ্যে আপনার নিকট সবচেয়ে বেশী সম্মানের অধিকারী কে? আল্লাহ্ তা'আলা বললেন ঃ ঐ বান্দা, যে (অপরাধীর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার) শক্তি থাকা সত্ত্বেও তাকে ক্ষমা করে দেয়। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ এখানে মনে রাখতে হবে যে, অপরাধীর অপরাধ ক্ষমা করার এ ফযীলতের সম্পর্ক কোন ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ব্যক্তিগত ও নিজস্ব ব্যাপার ও অধিকারের ক্ষেত্রে। তাই যেসব অপরাধের সম্পর্ক আল্লাহ্র সাথে এবং আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে শাস্তি নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে এ অপরাধ ক্ষমা করার এবং শাস্তি রহিত করার কারো কোন ক্ষমতা ও এখতিয়ার নেই। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম— যিনি পৃথিবীতে সবচেয়ে দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন, তাঁর কর্মনীতিও এই ছিল যে, তিনি নিজের অপরাধীকে সর্বদা ক্ষমা করে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ্র বিধান ও তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা ভঙ্গকারীদেরকে তিনি আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী অবশ্যই শাস্তি দিতেন। বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে এ হাদীস বর্ণিত

হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কখনো কাউকে শাস্তি দেননি এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। কিন্তু কেউ আল্লাহ্‌র বিধান লংঘন করলে তিনি এজন্য শাস্তি প্রয়োগ করতেন।

(١٢٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ اَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ فَصَمَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَمْ اَعْفُوْ عَنِ الْخَادِمِ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِيْنَ مَرَّةً * (رواه الترمذى)

১২৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার খাদেম (গোলাম অথবা চাকর)-এর অন্যায় কতবার ক্ষমা করব ? তিনি এর কোন উত্তর দিলেন না। তারপর সে আবার জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নিজের খাদেমকে কতবার ক্ষমা করব ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ দৈনিক সত্তর বার। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য এই ছিল যে, হুযূর! আমার খাদেম অথবা চাকর যদি বারবার অন্যায় করে, তাহলে আমি কতক্ষণ তাকে ক্ষমা করব এবং কতবার মাফ করার পর তাকে শাস্তি দেব ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন যে ঃ সে যদি দৈনিক সত্তর বারও অন্যায় করে, তবুও তুমি ক্ষমাই করে যাও। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, অন্যায় ক্ষমা করা এমন কোন বিষয় নয়, যার সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হবে; বরং মহৎ চরিত্র ও দয়ার্দ্রচিত্ততার দাবী এই যে, সে যদি সত্তরবারও অন্যায় করে, তবুও তাকে ক্ষমাই করে দেওয়া হোক।

শিক্ষা ঃ পূর্বেও অনেক বার উল্লেখ করা হয়েছে যে, সত্তর সংখ্যাটি এসব ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা বুঝানোর জন্য নয়; বরং কেবল আধিক্য বুঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিশেষ করে এ হাদীসে এ বিষয়টি খুবই স্পষ্ট।

এহ্‌সান ও পরোপকার

দয়া অনুগ্রহের একটি শাখা অথবা বলা যায় যে, দয়া-অনুগ্রহের একটি ফল হচ্ছে এহসান ও পরোপকার গুণ। এহসানের অর্থ হচ্ছে কারো উপকার করা, চাই তাকে হাদিয়া দিয়ে হোক, তার কোন কাজ করে দিয়ে হোক, তাকে শান্তি ও আরাম দিয়ে হোক অথবা এমন কোন কাজ করে হোক, যা তার খুশী ও আনন্দের কারণ হয়। এগুলো সবই এহসান ও পরোপকারের বিভিন্ন পদ্ধতি ও ধরন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন উম্মতকে এ সবকিছুর প্রতিই উৎসাহ দিয়েছেন।

(١٢٧) عَنْ اَنَسٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ قَالَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْخَلْقُ عِيَالُ اللّٰهِ فَاَحَبُّ الْخَلْقِ اِلَى اللّٰهِ مَنْ اَحْسَنَ اِلَى عِيَالِهٖ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১২৭। হযরত আনাস ও আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহ্ তা'আলার পোষ্য। (অর্থাৎ, সকল সৃষ্টির জীবিকা এবং

তাদের জীবনের সকল প্রয়োজন পূরণের প্রকৃত অভিভাবক আল্লাহ্। যেমন, পরিবারের কর্তা ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ এবং তদের অন্যান্য প্রয়োজনের রূপক অর্থে জিম্মাদার হয়ে থাকে।) অতএব, সকল সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্র অধিকতর প্রিয় ঐসব বান্দা যারা তাঁর পোষ্যের (অর্থাৎ, তাঁর সৃষ্টি ও মাখলূকের) সাথে এহসান ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করে। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ আমাদের এ দুনিয়ার রীতিও এই যে, কেউ যদি কারো পোষ্যদের সাথে অনুগ্রহমূলক আচরণ করে, তাহলে সে ঐ অভিভাবকের অন্তরে বিশেষ স্থান দখল করে নিতে পারে। এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার নীতিও ঠিক তাই যে, কেউ যদি তাঁর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করে, তাহলে সে আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়পাত্র হয়ে যায়।

শিক্ষা ঃ একথা পূর্বেও অনেক বার উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখানেও মনে রাখতে হবে যে, এ ধরনের সুসংবাদের সম্পর্ক কেবল ঐ বান্দাদের সাথে, যারা এমন কোন মারাত্মক অপরাধে অপরাধী নয়; যদ্দরুন মানুষ আল্লাহ্র রহমত ও ভালবাসা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে যায়।

এর উদাহরণ ঠিক এমন যে, কোন বাদশাহ এ ঘোষণা দিল যে, যে ব্যক্তি আমার প্রজাদের সাথে ভাল আচরণ করবে, সে আমার ভালবাসার অধিকারী হয়ে যাবে এবং আমি তাকে পুরস্কৃত করব। এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, যেসব লোক স্বয়ং বাদশাহ্র বিদ্রোহী অথবা অন্য কোন ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ পেশা হিসাবে করে যায়, তারা যদি প্রজাদের মধ্য থেকে কারো সাথে ভাল আচরণও করে, তবুও এ ঘোষণার কারণে তারা বাদশাহ্র ভালবাসা ও পুরস্কার লাভের যোগ্য বিবেচিত হবে না। এখানে এ কথাই বলা হবে যে, এ ধরনের রাষ্ট্রদ্রোহী ও পেশাদার অপরাধীদের সাথে এ রাজকীয় ঘোষণার কোন সম্পর্ক নেই।

(١٢٨) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكُوْنُوْا اِمَّعَةً تَقُوْلُوْنَ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَحْسَنَّا وَاِنْ ظَلَمُوْا ظَلَمْنَا وَلٰكِنْ وَطِّنُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنْ اَحْسَنَ النَّاسُ اَنْ تُحْسِنُوْا وَاِنْ اَسَاءُوْا فَلَا تَظْلِمُوْا * (رواه الترمذى)

১২৮। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অন্যের দেখাদেখি কাজ করো না। অর্থাৎ, একথা বলো না যে, অন্যেরা যদি ভাল ব্যবহার করে, তাহলে আমরাও ভাল ব্যবহার করব, আর তারা জুলুম করলে আমরাও জুলুম করব; বরং তোমরা তোমাদের মনকে এ বিষয়ে প্রস্তুত কর যে, অন্যেরা ভাল ব্যবহার করলে তোমরা ভাল ব্যবহার করবে, আর তারা যদি অন্যায় আচরণও করে, তাহলেও তোমরা ভাল ব্যবহার করে যাবে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, দুনিয়াতে চাই এহসান ও সদ্ব্যবহারের প্রচলন থাকুক অথবা জুলুম ও দুর্ব্যবহারের রাজত্ব চালু থাকুক, উভয় অবস্থায় মু'মিনদের কর্মপন্থা এটাই হওয়া উচিত যে, তারা সদ্ব্যবহার ও অন্যের উপকারই করে যাবে। তাছাড়া এ এহসান ও সদ্ব্যবহার

কেবল তাদের সাথেই করা হবে না, যারা আমাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে যায়; বরং যারা আমাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তাদের সাথেও আমরা ভাল ব্যবহার করে যাব।

"কিতাবুর রিকাকে" হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, যে ব্যক্তি আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে, আমি যেন তার সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি, আর যে আমাকে বঞ্চিত রাখে, আমি যেন দেওয়ার সময় তাকেও দিয়ে যাই।

(١٢٩) عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَضَى لِاَحَدٍ مِنْ اُمَّتِيْ حَاجَةً يُرِيْدُ اَنْ يَسُرَّهُ بِهَا فَقَدْ سَرَّنِيْ وَمَنْ سَرَّنِيْ فَقَدْ سَرَّ اللّٰهَ وَمَنْ سَرَّ اللّٰهَ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১২৯। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এ আশায় আমার উম্মতের কারো কোন প্রয়োজন পূরণ করে দিল যে, এর দ্বারা সে তার অন্তরকে খুশী করবে, সে যেন আমার অন্তরকে খুশী করে দিল। আর যে আমাকে খুশী করল, সে যেন আমার আল্লাহ্কে খুশী করল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্কে খুশী করল, আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে নিজের উম্মতের প্রতি যে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে, তা এ হাদীস দ্বারাও কিছুটা অনুমান করা যায়। এতে বলা হয়েছে যে, তাঁর উম্মতের কাউকে খুশী করার জন্য তার কোন কাজ সম্পাদন করে দেওয়া এবং তার সাথে ভাল আচরণ করা এমন সৎকর্ম যে, এর দ্বারা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুশী হয়ে যান। আর এর প্রতিদান হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও জান্নাত লাভ।

(١٣٠) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِيْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسِبُهُ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ * (رواه البخارى ومسلم)

১৩০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র যে বান্দা কোন বিধবা নারী এবং কোন মিসকীনের প্রয়োজন পূরণে চেষ্টা-সাধনা করে, সে প্রতিদান লাভের ক্ষেত্রে ঐ মুজাহিদের ন্যায়, যে আল্লাহ্র রাহে সংগ্রাম সাধনা চালিয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা যে, তিনি একথাও বলেছেন ঃ সে ঐ রাত্রি জাগরণকারী বান্দার ন্যায়, যে রাতভর নামায পড়েও ক্লান্ত হয় না এবং ঐ রোযাদারের মত, যে কখনো রোযা ছেড়ে দেয় না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ উপরের হাদীসগুলো দ্বারা একথা জানা গিয়েছিল যে, যে কোন ধরনের এহসান ও উপকার এবং তা যে কোন সৃষ্টির প্রতিই করা হোক, সর্বাবস্থায়ই এটা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের কারণ হয়ে থাকে। কিন্তু বিশেষভাবে কোন অসহায় বিধবা নারী এবং কোন মিসকীন বান্দার সাহায্যার্থে তাদের কার্যোদ্ধারে সাহায্য-সহায়তা ও শ্রম দেওয়া এমন উঁচু নেক আমল যে,

যারা এ কাজটি করে যায় তারা প্রতিদানের ক্ষেত্রে ঐসব বান্দাদের সমতুল্য, যারা আল্লাহ্র পথে জেহাদ করে যায় অথবা যারা সর্বদা দিনে রোযা রাখে ও রাতে আল্লাহ্র এবাদতে বিনিদ্র রজনী কাটায়।

আল্লাহ্র নিকট সামান্য এহসানেরও বিরাট মূল্য রয়েছে

(١٣١) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايُحَقِّرَنَّ اَحَدُكُمْ شَيْئًا مِّنَ الْمَعْرُوْفِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ اَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِقٍ وَاِذَا اشْتَرَيْتَ لَحْمًا اَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا فَاَكْثِرْ مَرَقَتَهُ وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ * (رواه الترمذى)

১৩১। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন কোন ধরনের অনুগ্রহ ও পরোপকারকে তুচ্ছ মনে না করে। কেউ যদি তার ভাইকে দেওয়ার জন্য কিছুই না পায়, তাহলে সে যেন অন্ততঃ তার সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করে। আর তুমি যখন গোশ্ত ক্রয় কর অথবা পাতিলে রান্না কর, তখন এতে ঝোল একটু বেশী দাও এবং এখান থেকে দু' এক চামচ তোমার প্রতিবেশীকেও দিয়ে দাও।

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই উচিত, সে যেন নিজের বন্ধু-বান্ধব ও প্রতিবেশীদের সাথে সদ্ব্যবহার করে, সামর্থ্য অনুযায়ী তাদেরকে হাদিয়া দেয়। হাদিয়া দেওয়ার জন্য সে যদি কোন মূল্যবান জিনিস না পায়, তাহলে তার জন্য যা সহজলভ্য হয়, তাই যেন দিয়ে দেয় এবং এটাকে ছোট ও তুচ্ছ মনে না করে। আর যদি সে কিছুই দিতে না পারে, তাহলে এতটুকুই যেন করে যে, তাদের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করবে। কেননা, এটাও সদাচরণের মধ্যে গণ্য এবং হাদিয়া-তোহফা বিনিময়ের মত এর দ্বারাও পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্পর্কের উন্নতি ঘটে। তাছাড়া একজন গরীব ও সামর্থ্যহীন মানুষ এতটুকু তো অবশ্যই করতে পারে যে, যখন ঘরে গোশ্ত রান্না করা হয়, তখন এতে একটু ঝোল বেশী দেবে এবং কোন প্রতিবেশীর বাড়ীতে এখান থেকে কিছু পাঠিয়ে দেবে।

আসলে সদাচরণের এ শেষ পদ্ধতিগুলোর উল্লেখ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদাহরণ হিসাবে করেছেন। অন্যথায় মর্ম এটাই যে, যার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হয়, সে যেন অন্যদের সাথে ততটুকুই অনুগ্রহমূলক আচরণ করে যায়।

(١٣٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاتُحَقِّرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَاِنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ اَنْ تَلْقَ اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ وَاَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِىْ اِنَاءِ اَخِيْكَ * (رواه الترمذى)

১৩২। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সদাচরণের কোন বস্তুকেই তুচ্ছ মনে করবে না। সদাচরণের একটি বিষয় হচ্ছে এই যে, তুমি হাসিমুখে তোমার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করবে। আর এটাও সদাচরণের অন্তর্ভুক্ত যে, তুমি তোমার বালতি থেকে তোমার ভাইয়ের পাত্রে পানি ভরে দেবে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেও নিজের বালতিটি থেকে আপন ভাইয়ের পাত্র ভরে দেওয়ার উল্লেখ কেবল উদাহরণ হিসাবেই করা হয়েছে। উদ্দেশ্য কেবল এই যে, নিজের ভাইয়ের যতটুকু খেদমত ও সাহায্য তুমি করতে পার এবং তাকে যতটুকু আরাম দিতে পার, এতে কুণ্ঠিত হয়ো না। আল্লাহ্র দৃষ্টিতে এগুলো সবই সদাচরণ ও পরোপকারের অন্তর্ভুক্ত।

আজ যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তাহলে সমাজে কেমন ভালবাসার পরিবেশ ও ভ্রাতৃত্বের ভাব সৃষ্টি হবে। এ হাদীসগুলো দ্বারা একথাও জানা গেল যে, কারো প্রতি সদাচরণ করা ও তার উপকার করা ধনী হওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং এ মর্যাদা লাভে গরীবরা নিজেদের দরিদ্রতা সত্ত্বেও ধনীদের সাথে অংশীদার হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে এ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উপদেশের মূল্য দেওয়ার এবং এ থেকে উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন।

অন্যকে অগ্রাধিকার দান

এহসান ও অন্যের হিতকামনার একটি উঁচু স্তর হচ্ছে এই যে, কারো একটি জিনিসের খুবই প্রয়োজন থাকে, কিন্তু অন্য কোন প্রার্থী যদি সামনে এসে যায়, তাহলে সে এটা তাকে দিয়ে দেয় এবং নিজে কষ্ট স্বীকার করে নেয়। এটাকেই "ঈসার" তথা নিজের উপর অন্যকে অগ্রাধিকার দান বলে। নিঃসন্দেহে মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে এর অবস্থান সর্বশীর্ষে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের জীবনধারা এটাই ছিল এবং তিনি অন্যদেরকেও এর শিক্ষা ও এর প্রতি উৎসাহ দান করতেন।

(١٣٣) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُرْدَةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَكْسُوْكَ هٰذِهٖ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَلَبِسَهَا فَرَاٰهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِهٖ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَحْسَنَ هٰذِهٖ فَاكْسُنِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَامَهُ اَصْحَابُهُ قَالَ مَا اَحْسَنْتَ حِيْنَ رَاَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَهَا مُحْتَاجًا اِلَيْهَا ثُمَّ سَاَلْتَهُ اِيَّاهَا وَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ لَايُسْاَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ فَقَالَ رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِيْنَ لَبِسَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَلِّىْ اُكَفَّنُ فِيْهَا ٭ (رواه البخارى)

১৩৩। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে একটি চাদর (হাদিয়া দেওয়ার জন্য) নিয়ে আসল এবং নিবেদন করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ চাদরটি আপনাকে পরিধান করাতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাদরটি গ্রহণ করে গায়ে দিলেন। আর তখন তাঁর এমন একটি চাদরের প্রয়োজনও ছিল। তিনি যখন এটা গায়ে দিলেন, তখন তাঁর সহচরদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! চাদরটি তো খুবই সুন্দর! এটা আমাকে দিয়ে দিন। তিনি বললেন ঃ আচ্ছা। (এই বলে তিনি চাদরটি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন।)

তারপর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মজলিস থেকে উঠে গেলেন, তখন তাঁর সাথীরা তাকে ভর্ৎসনা করে বলল, তুমি কাজটি ভাল করলে না। তুমি তো দেখছ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনের মুহূর্তে চাদরটি গ্রহণ করেছেন। তারপরও তুমি এটা চেয়ে বসলে, অথচ তুমি জান যে, তাঁর কাছে কোন কিছু চাওয়া হলে তিনি তা দিয়েই দেন। ঐ সাহাবী তখন উত্তরে বললেন, আমি তো কেবল এর বরকতের আশা করেছি। কেননা, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়ে পরিধান করেছেন। এখন আমার আশা যে, এটাই আমার কাফন হবে। —বুখারী

(١٣٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنِّىْ مَجْهُوْدٌ فَاَرْسَلَ اِلَى بَعْضِ نِسَائِهٖ فَقَالَتْ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِىْ اِلَّا مَاءٌ ثُمَّ اَرْسَلَ اِلَى اُخْرٰى فَقَالَتْ مِثْلَ ذٰلِكَ ،وَقُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذٰالِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّضَيِّفُهٗ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُقَالُ لَهٗ اَبُوْطَلْحَةَ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَانْطَلَقَ بِهٖ اِلَى رَحْلِهٖ فَقَالَ لِامْرَأَتِهٖ هَلْ عِنْدَكِ شَىْءٌ قَالَتْ لَا اِلَّا قُوْتُ صِبْيَانِىْ قَالَ فَعَلِّلِيْهِمْ بِشَىْءٍ وَنَوِّمِيْهِمْ فَاِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَاَرِيْهِ اَنَّا نَاْكُلُ فَاِذَا اَهْوٰى بِيَدِهٖ لِيَاْكُلَ فَقُوْمِىْ اِلَى السِّرَاجِ كَىْ تُصْلِحِيْهِ فَاَطْفِئِيْهِ فَفَعَلَتْ فَقَعَدُوْا وَاَكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ فَلَمَّا اَصْبَحَ غَدًا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ عَجِبَ اللّٰهُ اَوْ ضَحِكَ اللّٰهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ * (رواه البخارى ومسلم)

১৩৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করল, আমি ক্ষুধায় কাতর এক গরীব মানুষ। একথা শুনে তিনি তাঁর জনৈকা স্ত্রীর কাছে সংবাদ পাঠালেন (যে, ঘরে খাওয়ার মত কোন জিনিস থাকলে এর জন্য পাঠিয়ে দাও।) সেখান থেকে উত্তর আসল যে, ঐ সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমার কাছে এ মুহূর্তে পানি ছাড়া অন্য কোন কিছুই নেই। তারপর তিনি অন্য এক স্ত্রীর ঘরে খবর পাঠালেন। সেখান থেকেও এই উত্তর আসল। তারপর (এভাবে প্রত্যেক ঘরেই তিনি একথা বলে পাঠালেন এবং) সবার পক্ষ থেকে একই উত্তর আসল। এবার তিনি সাহাবীদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এ লোকটির মেহমানদারী করতে পারে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর বিশেষ অনুগ্রহ করবেন। একথা শুনে আনসারদের মধ্য থেকে আবূ তালহা নামক এক সাহাবী দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাকে নিজের মেহমান বানিয়ে নিচ্ছি। তারপর তিনি তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং স্ত্রীকে বললেন, তোমার কাছে কি (একজন মেহমানকে খাওয়ানোর মত) কিছু আছে ? স্ত্রী উত্তর দিল, কেবল শিশুদের আহারের জন্য কিছু খাবার আছে, এ ছাড়া আর কিছুই নেই। (এমনকি আপনার এবং আমার খাওয়ার জন্যও কিছু নেই।) আবূ তালহা বললেন, তুমি শিশুদেরকে কোন কিছু দিয়ে মনোরঞ্জন করে ঘুম পাড়িয়ে দাও। তারপর মেহমান যখন

ঘরে আসবে, তখন এ ভাব দেখাও যে, আমরাও তার সাথে খানা খাব। তারপর মেহমান যখন খাওয়ার জন্য হাত বাড়াবে (এবং খানা শুরু করে দেবে) তখন তুমি বাতি ঠিক করার বাহানায় উঠে গিয়ে সেটা নিভিয়ে দেবে। (যাতে ঘর অন্ধকার হয়ে যায় এবং মেহমান বুঝতে না পারে যে, আমরা তার সাথে খানায় শরীক আছি কিনা।) কথামত স্ত্রী তাই করল এবং খাবারে বসলেন তো সবাই, কিন্তু খাবার কেবল মেহমানই খেয়ে গেল। এভাবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ই ক্ষুধা নিয়েই রাত কাটিয়ে দিল। প্রভাত হলে আবূ তালহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন তার এবং তার স্ত্রীর নাম নিয়ে এ সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে তাঁর অমুক বান্দা ও অমুক বান্দীর এ কাজটি খুবই পছন্দ হয়েছে এবং তিনি খুবই খুশী হয়েছেন।

এখানে বর্ণনাকারীর সন্দেহ যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ তা'আলার খুশী বুঝানোর জন্য এখানে "আল্লাহ্ বিস্মিত হয়েছেন" শব্দ বলেছেন, না "আল্লাহ্ হেসেছেন" শব্দ বলেছেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও বাস্তব কর্মনীতি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অন্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার যে গুণ ও মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল, এ ঘটনাটি তারই একটি নমুনা ও উদাহরণ। কুরআন মজীদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনসার সাহাবাদের এ গুণ ও এ চরিত্রের প্রশংসা এভাবে করা হয়েছে ঃ তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দান করে। (সূরা হাশর)

আবূ তালহা আনসারীর এ কাজটির অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ও অভাবনীয় মূল্যায়নের বিষয়টি বুঝানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে রূপক অর্থে "আল্লাহ্ বিস্মিত হয়েছেন" অথবা "আল্লাহ্ হেসেছেন" শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অন্যথায় একথা স্পষ্ট যে, 'বিস্মিত হওয়া' এবং 'হাসা' প্রকৃত অর্থ বিবেচনায় কেবল কোন বান্দারই গুণ হতে পারে।

প্রীতি-ভালবাসা এবং সম্পর্কহীনতা ও শত্রুতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রীতি-ভালবাসাকেও ঈমানের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেছেন। আর কেনই বা হবে না ? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই যে প্রীতি ও ভালবাসার মহান প্রতিচ্ছবি ছিলেন। আর তাঁর প্রতিটি স্বভাব নিঃসন্দেহে ঈমানী স্বভাব।

(١٣٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ * (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

১৩৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি হচ্ছে প্রীতি-ভালবাসার কেন্দ্রস্থল। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, যে অন্যকে ভালরাসে না এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসে না। —মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, মু'মিন বান্দা প্রীতি ও ভালবাসার কেন্দ্রস্থল হয়ে থাকবে। অর্থাৎ, সে নিজে অন্যদেরকে ভালবাসবে এবং অন্যরাও তাকে ভালবাসবে এবং আপন মনে করবে। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে এ গুণ না থাকে, তাহলে তার মধ্যে যেন কোন কল্যাণ নেই।

কেননা, সে অন্যের কোন উপকারে আসবে না এবং অন্যরাও তার দ্বারা উপকৃত হতে পারবে না।

এ হাদীসে ঐসব নীরস ও শুষ্ক মেযাজের লোকদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে, যারা সব মানুষ থেকে সম্পর্কহীন হয়ে থাকাকেই দ্বীনের দাবী মনে করে এবং এ জন্য তারা নিজেরাও অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এবং অন্যদেরকেও তাদের প্রতি আকৃষ্ট হতে দেয় না। তবে মু'মিনের এ প্রীতি-ভালবাসা ও অন্যের প্রতি টান ও আকর্ষণ এবং অন্যকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করা এসব কিছুই আল্লাহ্র জন্য এবং তাঁর বিধি-বিধানের আওতায় হওয়া চাই।

আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা এবং আল্লাহ্র জন্য শত্রুতা

(١٣٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَحَبَّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللهِ تَعَالٰى اَلْحُبُّ فِى اللهِ وَالْبُغْضُ فِى اللهِ * (رواه ابوداؤد)

১৩৬। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের আমলসমূহের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হচ্ছে ঐ ভালবাসা, যা আল্লাহ্র জন্য হয় এবং ঐ শত্রুতা, যা আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই হয়। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ কোন মানুষের এ অবস্থা হয়ে যাওয়া যে, সে কেবল আল্লাহ্র জন্যই কাউকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্র জন্যই কারো প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, এটা ঈমানের এক উঁচু স্তর। কিতাবুল ঈমানেও এ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যর গেফারীকে বলেছিলেন ঃ ঈমানের সবচেয়ে মজবুত দলীল হচ্ছে আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা এবং তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, আর আল্লাহ্র জন্যই কারো সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'আলার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিদান ও এবাদত বিশেষ

(١٣٧) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلّٰهِ اِلَّا اَكْرَمَ رَبَّهٗ عَزَّوَجَلَّ * (رواه احمد)

১৩৭। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন বান্দা আল্লাহ্র জন্য অপর কোন বান্দাকে ভালবাসা দান করল, সে আসলে নিজের মহান প্রতিপালকের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করল। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, কোন বান্দার অন্য কোন বান্দার প্রতি আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে ভালবাসা পোষণ করা প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্র উচ্চ মর্যাদার দাবী পূরণ করারই নামান্তর। আর এ হিসাবে এটা আল্লাহ্ তা'আলার এবাদতের মধ্যেই গণ্য।

আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসা স্থাপনকারীরা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র হয়ে যায়

(١٣٨) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مُحَبَّتِىْ لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِىَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِىَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِىَّ * (رواه مالك)

১৩৮। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমার ভালবাসা অবধারিত ঐসব লোকের জন্য, যারা আমার জন্য একে অপরকে ভালবাসে, আমার কারণে কোথাও একসাথে বসে, আমার কারণে একে অপরের সাথে সাক্ষাত করে এবং আমার কারণে একজন অন্য জনের জন্য খরচ করে। —মুয়াত্তা মালেক

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্র যে সব বান্দা নিজেদের ভালবাসা ও আকাঙ্ক্ষা এবং নিজেদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পর্ককে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনার অধীন করে দিয়েছে এবং যাদের অবস্থা এই যে, তারা কাউকে ভালবাসলে আল্লাহ্র জন্যই ভালবাসে, কারো কাছে বসলে আল্লাহ্র জন্যই বসে, কারো সাথে সাক্ষাত করলে আল্লাহ্র জন্যই সাক্ষাত করে এবং কারো উপর অর্থ ব্যয় করলে আল্লাহ্র জন্যই ব্যয় করে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্র এসব বান্দা এর উপযুক্ত যে, তারা আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ সন্তুষ্টি ও ভালবাসার অধিকারী হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ তা'আলার এ সুসংবাদের ঘোষণা দিয়েছেন যে, আমার ঐসব বান্দার প্রতি আমার ভালবাসা অনিবার্য ও অবধারিত হয়ে গিয়েছে। আমি তাদেরকে ভালবাসি, আমি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আমার প্রিয়পাত্র।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে এসকল বান্দার অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

(١٣٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ لَهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ قَالَ اُرِيْدُ اَخًا لِىْ فِىْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا قَالَ لاَ غَيْرَ اَنِّىْ اَحْبَبْتُهُ فِى اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ *

(رواه مسلم)

১৩৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি তার এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করার জন্য রওয়ানা হল— যে অন্য এক জনপদে বাস করত। আল্লাহ্ তা'আলা তার চলার পথে এক ফেরেশ্তাকে অপেক্ষমান বানিয়ে বসিয়ে রাখলেন। (ঐ ব্যক্তি যখন এ স্থান দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল, তখন) ঐ ফেরেশ্তা তাকে জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা ? সে উত্তরে বলল, আমি এ জনপদে বসবাসকারী এক ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি। ফেরেশ্তা জিজ্ঞাসা করল, তোমার উপর কি তার এমন কোন অনুগ্রহ আছে, যার প্রতিদান দিতে তুমি যাচ্ছ ? সে বলল, না। আমার সেখানে যাওয়ার কারণ কেবল এই যে, আমি তাকে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসি। ফেরেশ্তা বলল, আমি তোমাকে বলছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে তোমার নিকট একথা বলার জন্য পাঠিয়েছেন যে, আল্লাহ্ তোমাকে ভালবাসেন, যেমন তুমি তাঁর জন্য ঐ বান্দাকে ভালবাস। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, বাহ্যতঃ এটা পূর্ববর্তী কোন উম্মতের কারো ঘটনা। এ ঘটনা দ্বারা একথাও জানা গেল যে, কোন কোন সময় ফেরেশ্তারা আল্লাহ্র নির্দেশে নবী ছাড়া অন্য কারো কাছেও আসতে পারেন

এবং তার সাথে সামনাসামনি এ ধরনের কথাও বলতে পারেন। হযরত মারইয়াম সিদ্দীকার কাছে আল্লাহ্র হুকুমে হযরত জিব্রাঈল (আঃ)-এর আগমন ও তাঁর সাথে কথোপকথনের বিষয়টি কুরআন মজীদেও উল্লেখিত রয়েছে। অথচ এটা জানা কথা যে, হযরত মারইয়াম নবী ছিলেন না।

এ ঘটনার আসল প্রাণবস্তু এবং এর বর্ণনা দ্বারা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ বাস্তব বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে, আল্লাহ্র কোন বান্দার তার ভাইয়ের প্রতি আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা পোষণ করা এবং এ ভালবাসার দাবীতে তার সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়া এমন পুণ্য কর্ম যে, এ কাজ তাকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র বানিয়ে দেয়। এমনকি কখনো কখনো এমন হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা নিজের বিশেষ ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে তাকে নিজের ভালবাসার সুসংবাদ পৌঁছিয়ে দেন। আহ্! তারা কত ভাগ্যবান! তাদের জন্য কি বিরাট সুসংবাদ।

আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা পোষণকারীদের স্বতন্ত্র মর্যাদা

(١٤٠) عَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ لَاُنَاسًا مَاهُمْ بِاَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْاَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللّٰهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ ؟ قَالَ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوْا بِرُوْحِ اللّٰهِ عَلٰى غَيْرِ اَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَاَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللّٰهِ اِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَاِنَّهُمْ لَعَلٰى نُوْرٍ لَا يَخَافُوْنَ اِذَا خَافَ النَّاسُ وَلَا يَحْزَنُوْنَ اِذَا حَزِنَ النَّاسُ وَقَرَءَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ * (رواه ابوداؤد)

১৪০। হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্যে কিছু এমন ভাগ্যবান বান্দা রয়েছে, যারা নবী অথবা শহীদ তো নয়, কিন্তু কেয়ামতের দিন অনেক নবী ও শহীদ তাদের নৈকট্যের কারণে তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে বলবেন কি, তারা কারা ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ তারা হচ্ছে ঐসব লোক, যারা কোন আত্মীয়তা ছাড়াই এবং অর্থ-সম্পদের লেনদেন ছাড়াই কেবল আল্লাহ্র রূহের কারণে একে অপরকে ভালবেসেছে। আল্লাহ্র শপথ! কেয়ামতের দিন তাদের মুখমণ্ডল হবে আলোকোজ্জ্বল; বরং আলোর মেলা। আর তারা নূরের মিম্বরের উপর থাকবে। সাধারণ লোকজন যখন ভীত বিহ্বল থাকবে, তখন তারা থাকবে নির্ভয়-নিশ্চিন্ত। অন্যরা যখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকবে, তখন তারা থাকবে দুশ্চিন্তামুক্ত। তারপর তিনি এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ এই ঃ মনে রেখো, যারা আল্লাহ্র বন্ধু, তাদের না কোন ভয়-ভীতি আছে, না তারা চিন্তান্বিত হবে। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এ দুনিয়ায় রক্তসম্পর্ক ও আত্মীয়তার কারণে কারো সাথে ভালবাসা ও সুসম্পর্কের সৃষ্টি হওয়া এমন একটি সাধারণ ও প্রকৃতিগত বিষয়, যা মানুষ ছাড়া সাধারণ পশু-এমনকি হিংস্র প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায়। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি অন্য কাউকে আর্থিকভাবে সাহায্য করে, তাকে হাদিয়া-তোহ্ফা দেয়, তাহলে তার মধ্যে ঐ সুহৃদ ও উপকারী ব্যক্তির প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যাওয়াও এমন একটি সহজাত বিষয়, যা কাফের, মুশরিক ও ফাসেক-

পাপাচারীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। কিন্তু কোন রক্তের বন্ধন ও আত্মীয়তা ছাড়া এবং কোন আর্থিক আদান-প্রদান এবং হাদিয়া তোহ্ফা ছাড়া কেবলমাত্র আল্লাহ্র দ্বীনের সম্পর্কের কারণে কাউকে ভালবাসা এমন একটি গুণ, আল্লাহ্ তা'আলার নিকট যার বিরাট মূল্য ও মর্যাদা রয়েছে। এর কারণে বান্দা আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র ও খুবই নৈকট্যশীল হয়ে যায় এবং কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার উপর এমন অনুগ্রহ বর্ষিত হবে যে, নবী-রাসূল এবং শহীদগণও তার উপর ঈর্ষা করবেন।

তবে এর অর্থ এটা বুঝা ঠিক হবে না যে, এসব লোক মর্তবা ও মর্যাদার দিক দিয়ে নবী-রাসূল ও শহীদদের চাইতে উত্তম ও উন্নত স্তরের অধিকারী হবে। কোন সময় এমনও হয় যে, নিম্নস্তরের কোন মানুষকে বিশেষ কোন অবস্থানে দেখে তার চেয়ে উঁচু স্তরের মানুষের মধ্যেও ঈর্ষা সৃষ্টি হয়ে যায়। এ বিষয়টি যুক্তি-বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনেকের কাছে অসম্ভব মনে হলেও বাস্তব ঘটনাবলীর আলোকে এর প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই এখানে যা বলা হয়েছে, এটা জোরপূর্বক কোন ব্যাখ্যা চাপিয়ে দেওয়া নয়; বরং এক বাস্তব সত্য।

এখানে যেসব বান্দার নৈকট্যের স্তর দেখে নবী-রাসূল এবং শহীদগণের ঈর্ষান্বিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাদের পরিচয় হাদীসে এ শব্দমালায় তুলে ধরা হয়েছে ঃ যারা আল্লাহ্র রূহের কারণে একে অপরকে ভালবাসে। এখানে রূহ শব্দটি "রা" অক্ষরে পেশ দিয়ে "রূহ" ও পড়া যায় এবং যবর দিয়ে "রাওহ"ও পড়া যায়। আমাদের দৃষ্টিতে উভয় অবস্থায়ই এর দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ্র দ্বীন। আর অর্থ এই হবে যে, এরা আল্লাহ্র ঐসব বান্দা, যারা এ দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ্র দ্বীনের সম্পর্কের কারণে একে অপরকে ভালবাসা দান করেছে। দ্বীন প্রকৃতপক্ষে পরকালীন জীবনের জন্য রূহতুল্য যা আসল জীবন। আর নিঃসন্দেহে দ্বীন আল্লাহ্র বিশেষ নেয়ামত ও রহ্মত। আর "রাওহ" শব্দের অর্থ নেয়ামত, রহ্মত ও শান্তি। সারকথা, এখানে "রূহ" এবং"রাওহ" যাই পড়া হোক, অর্থ একই থাকবে।

হাদীসের শেষে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্র দ্বীনের খাতিরে যারা একে অপরকে ভালবাসে, তাদের উপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বিশেষ এ অনুগ্রহ বর্ষিত হবে যে, কেয়ামতের দিন যখন সাধারণ মানুষের উপর ভয় এবং দুশ্চিন্তার তুফান চলবে, তখন তাদের অন্তরে ভয় ও আশংকার কোন লেশও থাকবে না; বরং তারা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত এবং আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহে স্বস্তি ও আনন্দে ডুবে থাকবে।

আল্লাহ্র ওয়াস্তে ভালবাসা স্থাপনকারীরা কেয়ামতের দিন আরশের ছায়ায় স্থান পাবে

(١٤١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلَالِىْ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّىْ * (رواه مسلم)

১৪১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন বলবেন ঃ আমার ঐ বান্দারা কোথায়, যারা আমার মাহাত্ম্যের খাতিরে একে অপরকে ভালবাসত ? আজ যখন আমার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া নেই, তখন আমি ঐ বান্দাদেরকে নিজের ছায়ার মধ্যে স্থান দেব। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছু জানেন এবং সবকিছুই দেখেন। বিশ্ব জগতের কোন অণু পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টির বাইরে নেই। তাই কেয়ামতের দিন তিনি যে বলবেন, আমার ঐসব বান্দা কোথায় ? এটা আসলে প্রশ্ন হিসাবে এবং জানার জন্য হবে না; বরং হাশরের ময়দানে সকল সৃষ্টির সামনে এ আহ্বান এ উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হবে, যাতে সমস্ত হাশরবাসীর সামনে তাদের মর্যাদা ফুটে উঠে। তারা যেন শুনে নেয় এবং দেখে নেয় যে, আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালবাসা পোষণকারীদের মর্যাদা ও অবস্থান কোথায়।

এ হাদীসে উল্লেখিত "আল্লাহ্র ছায়া" দ্বারা সম্ভবতঃ আল্লাহ্র আরশের ছায়া উদ্দেশ্য। যেমন, কোন কোন হাদীসে এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে।

ভালবাসা নৈকট্য ও সাহচর্য লাভের উপায়

(١٤٢) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِيْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ فَقَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ * (رواه البخارى ومسلم)

১৪২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু সে নিজে তাদের সঙ্গী হতে পারেনি ? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ যে যাকে ভালবাসে সে তারই সাথী হয়ে থাকবে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এখানে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য বাহ্যতঃ একথা জিজ্ঞাসা করা ছিল যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কোন বিশেষ পুণ্যবান মুত্তাকী বান্দাকে অথবা এ ধরনের কোন দল ও গোষ্ঠীকে ভালবাসে, কিন্তু সে নিজে কর্ম ও চরিত্রে ঠিক তাদের সমান ও তাদের স্তরে উন্নীত নয়; বরং তাদের চেয়ে কিছুটা পেছনে, এমন ব্যক্তির পরিণাম কি হবে ? এ ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের সারকথা এই হবে যে, এ ব্যক্তি আমল ও কর্মে কিছুটা পেছনে থাকলেও তাকে ঐ বান্দাদের সাথে শামিল করে দেওয়া হবে, যাদের সাথে আল্লাহ্র জন্য এবং দ্বীনের খাতিরে তার ভালবাসা ছিল। সামনে হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে প্রশ্নের শব্দমালা আরো অধিক স্পষ্ট।

(١٤٣) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يَّعْمَلَ كَعَمَلِهِمْ ؟ قَالَ اَنْتَ يَا اَبَا ذَرٍّ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ فَاِنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ فَاِنَّكَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ فَاَعَادَهَا اَبُوْ ذَرٍّ فَاَعَادَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ * (رواه ابوداؤد)

১৪৩। আব্দুল্লাহ ইবনে সামেত সূত্রে হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! একজন মানুষ আল্লাহ্র প্রিয় কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসে, কিন্তু সে নিজে তাদের মত আমল করতে

পারে না। (তাই এ ব্যক্তির পরিণাম কি হবে ?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন ঃ হে আবূ যর! তুমি যাকে ভালবাস তার সাথেই থাকবে। আবূ যর বললেন, আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের কাছেই এবং তাদের সাথেই থাকবে, যাদেরকে তুমি ভালবাস। একথা শুনে আবূ যর তার কথার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও একই উত্তর দিলেন। —আবূ দাউদ

(١٤٤) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَتَى السَّاعَةُ قَالَ وَيْلَكَ وَمَا اَعْدَدْتَ لَهَا قَالَ مَا اَعْدَدْتُ لَهَا اِلَّا اَنِّيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ قَالَ اَنَسٌ فَمَا رَاَيْتُ الْمُسْلِمِيْنَ فَرِحُوْا بِشَيْءٍ بَعْدَ اِسْلَامِهِمْ فَرْحَهُمْ بِهَا * (رواه البخارى ومسلم)

১৪৪। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেয়ামত কখন হবে ? তিনি বললেন ঃ আক্ষেপ তোমার উপর! (তুমি কেয়ামতের নির্দিষ্ট সময় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ, আগে বল তো,) তুমি এর জন্য কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ ? ঐ ব্যক্তি নিবেদন করল, আমি এর জন্য বিশেষ কোন প্রস্তুতি তো গ্রহণ করি নাই, (যা আপনার সামনে উল্লেখ করার মত এবং আমার জন্য আশাব্যঞ্জক।) তবে আমি আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলকে ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বললেন ঃ তুমি যাকে ভালবাস, তারই সান্নিধ্যে থাকবে।

হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আনাস বলেন ঃ আমি মুসলমানদেরকে (সাহাবায়ে কেরামকে) ইসলাম গ্রহণের পর অন্য কোন বিষয়ে এত আনন্দিত হতে দেখিনি, যতটুকু আনন্দিত হতে দেখেছি এ সুসংবাদ দ্বারা। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনাধারায় হযরত আনাস (রাঃ)-এর বক্তব্যের শেষাংশ এভাবেও বর্ণিত হয়েছে ঃ আমরা কখনো কোন ব্যাপারে এত আনন্দ লাভ করিনি, যতটুকু আনন্দ লাভ করেছিলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথায়, "তুমি তারই সান্নিধ্যে থাকবে, যাকে তুমি ভালবাস।" অতএব, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এবং হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)কে ভালবাসি এবং এ আশা পোষণ করি যে, তাঁদেরকে ভালবাসার কারণে আমি তাঁদের সান্নিধ্যে স্থান পাব, যদিও আমি তাঁদের মত আমল করতে পারিনি।

ভালবাসার কারণে প্রিয়পাত্রদের সান্নিধ্য লাভের অর্থ

কারো সাথী হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ভালবাসার কারণে— যে ভালবাসে এবং যাকে ভালবাসা দেওয়া হয়— তারা উভয়েই স্তর ও মর্যাদায় সম্পূর্ণ এক হয়ে যাবে এবং উভয়ের সাথে একই আচরণ করা হবে; বরং এখানে সাথী হওয়ার অর্থ নিজ নিজ স্তর ও পদমর্যাদায় এক সাথে থাকা। যেমন, এ দুনিয়াতেও খাদেম তার মনিবের সাথে এবং অনুগামী তার অনুসরণীয় ব্যক্তির সাথে থাকে। আর নিঃসন্দেহে এটাও বিরাট মর্যাদা ও সৌভাগ্যের কথা।

ভালবাসার জন্য আনুগত্য জরুরী

আরেকটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে যে, ভালবাসার জন্য আনুগত্য একান্ত জরুরী। এটা অসম্ভব কথা যে, কারো অন্তরে আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালাবাসা থাকবে আর তার জীবন হবে

অবাধ্যতা ও পাপাচারের। অতএব, যেসব লোক বল্গাহীনভাবে এবং নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ্ ও রাসূলের আহ্কাম ও বিধি-বিধান লংঘন করে, তারা যদি আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসার দাবী করে, তাহলে তারা মিথ্যাবাদী। আর তারা যদি বাস্তবেও নিজেদেরকে আল্লাহ্ ও রাসূলের আশেক ও প্রেমিক মনে করে, তাহলে মনে করতে হবে যে, তারা আত্ম-প্রবঞ্চনার শিকার।

হযরত রাবেয়া বসরী এ ধরনের ভালবাসার দাবীদার লোকদেরকে উদ্দেশ্য করেই বলেছেন এবং যথার্থই বলেছেন ঃ হে ভালবাসার মিথ্যা দাবীদার! তুমি আল্লাহ্র অবাধ্যতা করে যাচ্ছ, অথচ তাঁর ভালবাসার দাবী করছ। জ্ঞান ও যুক্তির বিবেচনায় এটা খুবই আশ্চর্য বিষয়। তোমার মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা থাকলে তুমি অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করতে। কেননা, প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের কথা অবশ্যই মেনে চলে।

যাহোক, আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসার জন্য তাঁদের আনুগত্য একান্ত জরুরী; বরং সত্য কথা এই যে, পূর্ণ আনুগত্য ভালবাসা থেকেই সৃষ্টি হয়। ফারসী কবি বলেন ঃ প্রেম আসলে কি ? তুমি বলে দাও যে, প্রেম হচ্ছে প্রেমাস্পদের গোলাম হয়ে যাওয়া।

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ ও রাসূলের আনুগত্যকারী বান্দাদের জন্য সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, তারা নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবানদের সাথী হয়ে থাকবে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ যে কেউ আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে, সে তাদের সঙ্গী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেছেন। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (সূরা নিসা ঃ আয়াত ৬৯)

অতএব, এ আয়াত ও উপরে উল্লেখিত হাদীসসমূহের বিষয়বস্তু একই। শুধু শিরোনাম ও অবতারণার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। এ বিষয়টি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঐ হাদীস দ্বারা আরো বেশী স্পষ্ট হয়ে যায়, যা আল্লামা ইবনে কাছীর (রহঃ) এ আয়াতের শানে নুযূল বর্ণনা করতে গিয়ে নিজ তফসীরগ্রন্থে ইবনে মারদুবিয়া এবং তাবারানীর বরাতে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটির সারসংক্ষেপ এই ঃ এক ব্যক্তি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনার প্রতি আমার অন্তরে নিজ স্ত্রী, নিজের সন্তানাদি এবং নিজের জীবনের চাইতেও অধিক ভালবাসা রয়েছে। আমার অবস্থা এই যে, যখন আমি বাড়ীতে থাকি এবং আপনার কথা মনে পড়ে, তখন আপনাকে এক নজর না দেখা পর্যন্ত আমি স্থির থাকতে পারি না। আমি যখন আমার মৃত্যুর কথা এবং আপনার ওফাতের কথা চিন্তা করি, তখন এ কথাই আমার বুঝে আসে যে, ওফাতের পরে আপনি তো জান্নাতে গিয়ে নবী-রাসূলদের সুউচ্চ মকামে পৌঁছে যাবেন। আর আমি যদি আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহে জান্নাতেও যাই, তবুও তো আমি ঐ উঁচু স্তরে পৌঁছতে পারব না। তাই আখেরাতে সম্ভবতঃ আপনার দীদার ও দর্শন থেকে আমি বঞ্চিতই থেকে যাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। এরই মধ্যে সূরা নিসার এ আয়াতটি নাযিল হল। এ আয়াতটি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ খাঁটি প্রেমিককে এবং অন্যান্য সকল প্রেমোৎসর্গকারী বান্দাদেরকে সুসংবাদ শুনিয়ে দিল যে, তোমার মধ্যে যেহেতু সত্যিকার ভালবাসা রয়েছে, তাই তুমি অবশ্যই আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত হয়ে থাকবে। তারপর তুমি জান্নাতেও আল্লাহ্র বিশেষ বান্দাদের সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য লাভ করতে পারবে।

যেহেতু প্রেম ও ভালবাসার ব্যাপারে অনেকেই ভুল বুঝাবুঝির শিকার হয়ে যায় এবং অজ্ঞতা অথবা গভীর চিন্তা-ভাবনা না করার দরুন অনেকেই ভালবাসা ও আনুগত্যের মধ্যে যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে, তা এড়িয়ে যায়, এ জন্য এখানে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা জরুরী মনে করে এর প্রয়াস পেয়েছি।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে তোমার এবং তোমার রাসূলের ভালবাসা দান কর। আর যাদের ভালবাসা তোমার নিকট আমাদের জন্য উপকারী হবে, ঐসব বান্দাদের ভালাবাসাও আমাদেরকে দান কর।

দ্বীনী ভ্রাতৃত্ব, সহানুভূতি ও সহমর্মিতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন রাহমাতুল লিল আলামীন, আর তাঁর শিক্ষা হচ্ছে সমস্ত জগতের জন্য রহ্মতের ঝর্ণাধারা। তিনি নিজের অনুসারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ সৃষ্টি ও সাধারণ মানুষের প্রতি দয়া ও সদাচরণের যে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েছেন, এগুলোর মধ্য থেকে কিছু উপদেশমালা পূর্ববর্তী পৃষ্ঠাসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী হিসাবে স্বীকৃতি দানকারী উম্মতকে যেহেতু আল্লাহ্র নির্দেশে ধর্মীয় বন্ধনের কারণে একটি বৃহৎ পরিবার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত এ পরিবারকেই নবুওয়াতের প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন উম্মতের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সদস্যবর্গ ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব, আল্লাহ্র জন্য আন্তরিক ভালবাসা, অকৃত্তিম সহানুভূতি ও নিঃস্বার্থ সহযোগিতার মাধ্যমে একাত্ম হয়ে থাকবে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষায় এ বিষয়টির উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সংক্রান্ত অধিকাংশ হাদীস তো সামাজিক রীতি-নীতি অধ্যায়ে আসবে। তবে দু'একটি হাদীস এখানে "আখলাক ও নৈতিকতা" অধ্যায়েই লিপিবদ্ধ করে দেওয়া উপযোগী মনে করছি।

মুসলমানদের মধ্যে পরস্পর কিরূপ ভালবাসা ও আন্তরিকতা থাকা চাই

(١٤٥) عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِىْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى عَضْوًا تَدَاعٰى لَهٗ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَالْحُمّٰى * (رواه البخارى ومسلم)

১৪৫। হযরত নু'মান ইবনে বশীর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি মু'মিনদেরকে তাদের পারস্পরিক দয়া-অনুগ্রহে, ভালবাসায় এবং সহানুভূতিতে একটি দেহের মত দেখতে পাবে। দেহের একটি অঙ্গে যখন অসুস্থতা বোধ হয়, তখন সারাটি দেহ অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যায়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অত্র হাদীসের মর্ম এই যে, আমার প্রতি ঈমান আনয়নকারী উম্মতের মধ্যে পরস্পর এমন ভালবাসা, এমন সহানুভূতি ও এমন আন্তরিক সম্পর্ক থাকা চাই যে, প্রতিটি দর্শনকারী চোখ তাদেরকে এ অবস্থায় দেখবে যে, তাদের মধ্যে কেউ বিপদে পড়ে গেলে সবাই এটাকে নিজের বিপদ মনে করে এবং সবাই তার চিন্তা ও অস্থিরতায় অংশীদার হয়ে

যায়। যদি ঈমানের দাবী সত্ত্বেও কারো অন্তরে এ অবস্থা সৃষ্টি না হয়, তাহলে বুঝে নিতে হবে যে, প্রকৃত এবং পরিপূর্ণ ঈমান এখনও লাভ হয়নি। কুরআন মজীদে মু'মিনদের এ গুণটির কথা নিম্নোক্ত শব্দমালায় সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে, "তারা নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল।"

(١٤٦) عَنْ اَبِىْ مُوْسىٰ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ * (رواه البخارى ومسلم)

১৪৬। হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একজন মু'মিন অপর মু'মিনের জন্য প্রাচীরের ন্যায়, যার একাংশ অপর অংশকে মজবুত ও সুদৃঢ় রাখে। তারপর তিনি নিজের এক হাতের আঙ্গুলগুলো অপর হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে প্রবিষ্ট করলেন (এবং দেখিয়ে দিলেন যে, মুসলমানদেরকে এভাবে মিলেমিশে এমন সুদৃঢ় প্রাচীরের মত হয়ে যাওয়া চাই, যার ইটগুলো পরস্পর লাগালাগি এবং একটি অপরটির সাথে এমনভাবে মিলিত যে, মাঝে কোন ফাঁক নেই।) —বুখারী, মুসলিম

পরস্পর ঘৃণা, হিংসা-বিদ্বেষ, কুধারণা ও অন্যের দুঃখে আনন্দিত হওয়ার নিষিদ্ধতা

উপরের হাদীসগুলোতে যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে পরস্পর ভালবাসা ও সহানুভূতিমূলক আচরণ করতে এবং একদেহ ও একপ্রাণ হয়ে থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, তেমনিভাবে এর বিপরীত আচরণ যেমন, পরস্পর কুধারণা পোষণ, কটুবাক্য বিনিময়, বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা, কারো বিপদে আনন্দিত হওয়া, কাউকে কষ্ট দেওয়া এবং হিংসা-বিদ্বেষ ইত্যাদির কঠোর নিন্দাবাদ এবং অত্যন্ত তাকীদের সাথে এগুলো থেকে নিষেধ করেছেন। এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

(١٤٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَاِنَّ الظَّنَّ اَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلَا تَحَسَّسُوْا وَلَاتَجَسَّسُوْا وَلَاتَنَاجَشُوْا وَلَاتَحَاسَدُوْا وَلَاتَبَاغَضُوْا وَلَاتَدَابَرُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا * (رواه البخارى ومسلم)

১৪৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা অন্যের ব্যাপারে কুধারণা থেকে বিরত থাক। কেননা, কুধারণা হচ্ছে বড় মিথ্যাচার। আর তোমরা কারো দুর্বলতা ও দোষের অনুসন্ধান করতে যেয়ো না, অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের আকাঙ্ক্ষা করো না, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ রেখো না এবং একজন অন্যজন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আল্লাহ্‌র বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাক। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যেসব জিনিস থেকে নিষেধ করা হয়েছে, এগুলো হচ্ছে ঐসব বিষয় যেগুলো অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করে পারস্পরিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করে দেয়। সর্বপ্রথম এখানে তিনি কুধারণার উল্লেখ করেছেন। এটা প্রকৃতপক্ষে একটা মিথ্যা অনুমান। যে ব্যক্তি এ

রোগে আক্রান্ত হয়, তার অবস্থা এই হয় যে, যার সাথেই তার সামান্য মতবিরোধ দেখা দেয়, তার প্রতিটি কাজেই সে অসৎ উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। তারপর কেবল এ মিথ্যা ধারণার ভিত্তিতে সে তার প্রতি এমন সব বিষয় সম্পৃক্ত করে দেয়, যেগুলো আসলে অবাস্তব তারপর অনিবার্যভাবেই বাহ্যিক আচরণেও এর প্রভাব পড়ে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তির পক্ষ থেকেও এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এভাবে উভয়ের অন্তর সাংঘাতিকভাবে আহত হয় এবং পারস্পরিক সম্পর্ক চিরদিনের জন্য নষ্ট হয়ে যায়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে কুধারণাকে সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার বলে উল্লেখ করেছেন। বাহ্যতঃ এর অর্থ এই যে, কারো বিরুদ্ধে মুখে মিথ্যা উচ্চারণ করলে এটা যে মস্ত বড় পাপ, একথা প্রত্যেক মুসলমানই জানে, কিন্তু কারো বিরুদ্ধে কুধারণা পোষণ করাকে এমন খারাপ মনে করা হয় না। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন যে, কুধারণাও বড়, বরং সবচেয়ে বড় মিথ্যাচার এবং অন্তরের এ গুনাহ্ মুখের গুনাহ্র চেয়ে কম নয়।

এ হাদীসে যেভাবে কুধারণাকে জঘন্য পাপ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে অন্য এক হাদীসে সুধারণাকে উত্তম এবাদত হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে ঃ حُسْنُ الظَّنِّ مِنْ حُسْنِ الْعِبَادَةِ "সুধারণা উত্তম এবাদতের মধ্যে গণ্য।" —মুসনাদে আহমাদ, আবূ দাঊদ বর্ণনা ঃ আবূ হুরায়রা (রাঃ)

কুধারণার পর এ হাদীসে আরো কতিপয় বদভ্যাস ও মন্দ স্বভাব থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে কারো দুর্বলতার পেছনে লেগে থাকা, অন্যদের দোষ অনুসন্ধান করা, একে অন্যের উপর প্রাধান্য ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা, কাউকে ভাল অবস্থায় দেখে তার উপর হিংসা করা ও শীতল চোখে কারো সুখ-শান্তি দেখতে না পারা ইত্যাদি। এ মন্দ স্বভাবগুলোর অবস্থাও এই যে, এগুলোর দ্বারা পারস্পরিক ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ অংকুরিত হয় এবং ঈমানী সম্পর্ক যে ভালবাসা ও সহানুভূতি এবং ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য কামনা করে, এগুলো এ সম্ভাবনাকেও তিরোহিত করে দেয়।

হাদীসের শেষাংশে যে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্র বান্দারা! ভাই ভাই হয়ে থাক," এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, যখন তোমরা নিজেদের অন্তর থেকে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টিকারী এ বদভ্যাসগুলো দূর করতে পারবে, তখনই কেবল তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকতে পারবে।

(١٤٨) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لَايَظْلِمُهُ وَلَايَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا — وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلٰثَ مِرَارٍ — بِحَسْبِ امْرِءٍ مِنَ الشَّرِّ اَنْ يُحَقِّرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ * (رواه مسلم)

১৪৮। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। সে তার উপর অবিচার করবে না, তাকে অসহায় অবস্থায় ছেড়ে রাখবে না, তাকে অপমান করবে না এবং তাকে ছোট মনে করবে না।

(কে জানে, তার অন্তরে হয়তো তাক্ওয়া ও খোদাভীতি রয়েছে এবং এ কারণে সে আল্লাহ্র নিকট সম্মানের পাত্র।) তারপর তিনি তিনবার নিজের বক্ষঃস্থলের দিকে ইশারা করে বললেন ঃ তাক্ওয়া এখানে থাকে। (হতে পারে যে, তুমি কাউকে তার বাহ্যিক অবস্থাদৃষ্টে অতি সাধারণ মানুষ মনে কর, অথচ নিজের অন্তরের তাক্ওয়ার কারণে সে আল্লাহ্র কাছে অসাধারণ সম্মানের অধিকারী। তাই কখনো কোন মুসলমানকে ছোট মনে করো না।) একজন মানুষের মন্দ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে। প্রত্যেক মুসলমানের কাছে অন্য মুসলমানের রক্ত, সম্পদ ও সম্ভ্রম পবিত্র ও সম্মানিত বস্তু। (এ জন্য অন্যায়ভাবে তার রক্তপাত, সম্পদ আত্মসাৎ ও সম্ভ্রমহানি করা হারাম।) —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে এক মুসলমানের উপর অন্য মুসলমানের একটি হক এই বলা হয়েছে যে, সে যখন তার সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়, তখন তাকে সাহায্য করতে হবে। তবে এটা তখনই করতে হবে, যখন সে ন্যায়ের উপর থাকে এবং নির্যাতিত হয়। অত্যাচারী হলে তাকে সাহায্য করা যাবে না।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে যে, তোমার মুসলমান ভাই যদি নির্যাতিত হয়, তাহলে তাকে সাহায্য কর। আর জালেম হলে জুলুম থেকে ফিরিয়ে রাখ। তাকে এ জুলুম থেকে বিরত রাখাই তাকে সাহায্য করা।

ঈমানদার বান্দাদেরকে উৎপীড়নকারী ও অপমানকারীদের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী

(١٤٩) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادٰى بِصَوْتٍ رَفِيْعٍ يَا مَعْشَرَ مَنْ اَسْلَمَ بِلِسَانِهٖ وَلَمْ يُفْضِ الْاِيْمَانُ اِلٰى قَلْبِهٖ لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تُعَيِّرُوْهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنْ يَّتَّبِعْ عَوْرَةَ اَخِيْهِ الْمُسْلِمِ يَتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ وَمَنْ يَّتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهٗ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِىْ جَوْفِ رَحْلِهٖ * (رواه الترمذى)

১৪৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন মিম্বরে আরোহণ করলেন এবং উচ্চকণ্ঠে বললেন ঃ হে ঐসব লোকজন, যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ, অথচ অন্তরের গভীরে এখনো ঈমানের প্রভাব পৌঁছেনি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে লজ্জা দিয়ো না এবং তাদের গোপন দোষ অনুসন্ধান করো না। কেননা, আল্লাহ্র নীতি হচ্ছে এই যে, যে কেউ তার মুসলমান ভাইয়ের গোপন দোষ অনুসন্ধান করবে, আল্লাহ্ তার গোপন দোষ অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ্ যার দোষ অন্বেষণ করবেন, তাকে তিনি অবশ্যই অপমান করে ছাড়বেন— যদি সে তার ঘরের ভিতর লুক্কায়িতও থাকে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ কারো অন্তরে যখন প্রকৃত ঈমান স্থান করে নেয়, তখন এর স্বাভাবিক ফল এ হয় যে, সে নিজের পরিণতির চিন্তায় ব্যস্ত থাকে এবং আল্লাহ্ তা'আলার এবং বান্দার হক সম্পর্কে খুবই সচেতন ও সতর্ক হয়ে যায়। বিশেষ করে আল্লাহ্র যেসব বান্দা খাঁটি ঈমানের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাথে নিজেদের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন, তাদের ব্যাপারে সে আরো বেশী সতর্ক থাকে। তাদেরকে উৎপীড়ন করতে তাদের অন্তরে আঘাত দিতে, তাদের গোপন দোষ

আলোচনা করতে, তাদেরকে লজ্জা দিতে এবং তাদের জীবনের দুর্বল দিকগুলোতে দৃষ্টি দিতে সে সতর্কতার সাথে বিরত থাকে। কিন্তু অন্তরে যদি ঈমানের স্বরূপ প্রবেশ না করে থাকে এবং মুখেই শুধু ইসলামের দাবী করা হয়, তাহলে মানুষের অবস্থা এর বিপরীত দেখা যায়। সে নিজের চিন্তার পরিবর্তে অন্যের দোষ অনুসন্ধান করে বেড়ায়। বিশেষ করে সে আল্লাহ্র ঐসব বান্দার পেছনে লেগে যায়, যারা আল্লাহ্র সাথে ঈমান ও দাসত্বসূলভ সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়ে থাকে। সে তাদেরকে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট করে দেখাবার চেষ্টা করে, তাদের দোষত্রুটি প্রচার করে বেড়ায় এবং তাদেরকে বদনাম ও অপমান করতে চায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এসব লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, তারা যেন এ আচরণ থেকে ফিরে আসে এবং আল্লাহ্র নেক বান্দাদের বদনাম করা এবং তাদের সম্ভ্রমহানি ও গোপন দোষ অনুসন্ধানের নেশা ত্যাগ করে। অন্যথায় আখেরাতের বিচারের পূর্বে এ দুনিয়াতেই তাদেরকে অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে। তারা যদি অপমান থেকে বাঁচার জন্য নিজেদের ঘরের ভিতরেও লুকিয়ে থাকে, তবুও এ চার দেয়ালের ভিতরেই আল্লাহ্ তাদেরকে লাঞ্ছিত করে ছাড়বেন। ফারসী কবি বলেন ঃ আল্লাহ্ যখন কাউকে অপমান করতে চান, তখন তার অন্তর পুণ্যবানদের সমালোচনার দিকে যায়।

হিংসা সম্পর্কে বিশেষ সতর্কবাণী

(١٥٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ * (رواه ابوداؤد)

১৫০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা হিংসা-রোগ থেকে বেঁচে থাক। কেননা, হিংসা মানুষের নেক আমলসমূহকে এভাবে খেয়ে ফেলে, যেভাবে আগুন লাকড়ীকে খেয়ে ফেলে। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ অভিজ্ঞতাও সাক্ষী যে, যার অন্তরে হিংসার আগুন জ্বলে উঠে, সে এর পেছনেই লেগে থাকে যে, যার প্রতি তার হিংসা, তার কিভাবে ক্ষতি করা যায় এবং তাকে কিভাবে অপমান করা যায়। তারপর সে যদি কিছু করতে না পারে, তাহলে তার গীবত করেই মনের আগুন নিভাতে চায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যান্য হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, এর ন্যূনতম ফল এই হবে যে, কেয়ামতের দিন এ হিংসুক গীবতকারীর পুণ্যসমূহ ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেওয়া হবে, যার গীবত সে করেছিল। "হিংসা পুণ্যসমূহ খেয়ে ফেলে" এর সহজ ব্যাখ্যা এটাই।

(١٥١) عَنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ اَلْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِىَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ * (رواه احمد والترمذى)

১৫১। হযরত যুবায়ের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মারাত্মক ব্যাধি অর্থাৎ, হিংসা ও শত্রুতা তোমাদের দিকে সংক্রমিত হয়ে চলে আসছে। আর এটা হচ্ছে মুন্ডনকারী। (তারপর নিজের উদ্দেশ্য স্পষ্ট

করতে গিয়ে বললেন ঃ) আমার এ কথার উদ্দেশ্য এ নয় যে, এটা মাথার চুল মুন্ডন করে; বরং এটা দ্বীনের মূলোচ্ছেদ করে ফেলে। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে মহাজ্ঞানী ও সর্বজ্ঞ মহান আল্লাহ্‌র এ সাক্ষ্য কুরআন মজীদে সংরক্ষিত রয়েছে যে, "তারা পরস্পর সহানুভূতিশীল"। অন্যত্র বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাদের অন্তরকে এক করে দিয়েছেন এবং এর ফলে তারা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গিয়েছে। (সূরা আলে ইমরান)

অন্য এক আয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এটা আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ যে, তিনি আপনার প্রতি ঈমান আনয়নকারী সাহাবীদের অন্তর মিলিয়ে দিয়েছেন এবং অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করে দিয়েছেন। আপনি যদি দুনিয়ার সকল সম্পদ ও উপকরণ এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করে ফেলতেন, তবুও তাদের অন্তরে এমন প্রীতি সঞ্চার করতে পারতেন না। (সূরা আনফাল)

কুরআন মজীদের এ স্পষ্ট সাক্ষ্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সাহাবায়ে কেরামের অন্তরকে পরস্পর ভালবাসা ও প্রীতিতে ভরে দেওয়া হয়েছিল এবং তাদের মধ্যে পরস্পর হিংসা ও বিদ্বেষের নাম-গন্ধও ছিল না। তাই এ হাদীসের উদ্দেশ্য এটাই হতে পারে যে, (সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে নয়; বরং) পরবর্তী যুগসমূহে হিংসা ও শত্রুতার যে মারাত্মক রোগ মুসলমানদের মধ্যে সংক্রমিত হয়ে আসবে, সে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে প্রকাশিত হয়েছিল। তাই তিনি উম্মতকে এ আসন্ন বিপদ থেকে সতর্ক করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, হিংসা-বিদ্বেষের যে সর্বনাশা ব্যাধি পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের অনেকের দ্বীন ও ঈমান বরবাদ করে দিয়েছিল, সেই ব্যাধি এ উম্মতের দিকেও আসছে। তাই আল্লাহ্‌র বান্দারা যেন সাবধান থাকে এবং এ অভিশাপ থেকে নিজেদের অন্তরকে রক্ষা করার চিন্তা করে।

হিংসা-বিদ্বেষের অশুভ পরিণতি

(١٥٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَضُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّتَيْنِ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيْسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ اِلَّا عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ اُتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتّٰى يَفِيْئَا * (رواه مسلم)

১৫২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি সপ্তাহে দুই দিন— সোমবার ও বৃহস্পতিবার সমস্ত মানুষের আমল আল্লাহ্‌র দরবারে পেশ করা হয় এবং প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। তবে ঐ দু' বান্দাকে ক্ষমা করা হয় না, যারা একে অপরের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে। তাদের সম্পর্কে বলা হয়, এ দু'জনকে বাদ রাখ, (অর্থাৎ, তাদের ক্ষমার সিদ্ধান্ত লিখো না,) যে পর্যন্ত না তারা বিদ্বেষ ও শত্রুতা থেকে ফিরে আসে এবং অন্তর পরিষ্কার করে নেয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের ব্যাখ্যা অন্য এক হাদীস থেকে পাওয়া যায়, যা ইমাম মুনযিরী (রহঃ) "তারগীব ও তারহীব" গ্রন্থে তাবারানীর "আওসাত" গ্রন্থের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন। সেখানে বলা হয়েছে ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের আমলসমূহ আল্লাহ্‌র দরবারে

পেশ করা হয়। অতএব, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে থাকে, তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং যে তওবা করে নিয়ে থাকে তার তওবা কবূল করা হয়। কিন্তু পরস্পর বিদ্বেষ পোষণকারীদের আমল তাদের বিদ্বেষের কারণে ফিরিয়ে দেওয়া হয়, (অর্থাৎ, তাদের ক্ষমা ও তওবা কবূলের ফায়সালা করা হয় না।) যে পর্যন্ত তারা এ বিদ্বেষ থেকে ফিরে না আসে।

এ বিষয়ের আরো কিছু হাদীস রয়েছে। এর সবগুলো থেকে একথাই জানা যায় যে, যে মুসলমানের অন্তরে অন্য মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা থাকে, সে যে পর্যন্ত এ ব্যাধি থেকে নিজের অন্তরকে পরিষ্কার করে না নেবে, সে পর্যন্ত সে আল্লাহ্র রহ্মত ও ক্ষমার যোগ্য হবে না।

হে আল্লাহ্! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং ঈমানদারদের প্রতি আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না।

কারো দুঃখে আনন্দিত হওয়ার শাস্তি

(١٥٣) عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْاَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ بِاَخِيْكَ فَيُعَافِيْهِ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ * (رواه الترمذى)

১৫৩। হযরত ওয়াছেলা ইবনুল আসকা' (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি তোমার কোন ভাইয়ের বিপদ দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। (এমন করলে হতে পারে যে,) আল্লাহ্ তাকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে দেবেন আর তোমাকে বিপদে ফেলে দেবেন। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ যখন দুই ব্যক্তির মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয় এবং এটা উন্নতি করতে করতে শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখন এমন অবস্থাও হয় যে, একজন বিপদে পড়লে অন্যজন খুশী হয়। এটাকেই "শামাতাত" তথা "অন্যের দুঃখে উল্লসিত হওয়া" বলে। হিংসা ও বিদ্বেষের মত এ ঘৃণিত অভ্যাসটিও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ডেকে আনে। আর আল্লাহ্ তা'আলা অনেক সময় দুনিয়াতেই এর শাস্তি এভাবে দিয়ে দেন যে, বিপদগ্রস্তকে বিপদ থেকে মুক্তি দিয়ে এর উপর উল্লাসকারীকে বিপদে ফেলে দেন।

নম্রতা ও কঠোরতা

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নৈতিক চরিত্রের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলোর উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন এবং তাঁর নৈতিক শিক্ষায় যেগুলো বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে, এগুলোর মধ্যে একটি বিষয় এও যে, মানুষ যেন সকলের সাথে নম্র ও ভদ্র আচরণ করে এবং কঠোরতা ও কর্কশতা পরিহার করে চলে। এ ধারার কয়েকটি হাদীস এখানে পাঠ করে নিন।

(١٥٤) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى رَفِيْقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَيُعْطِىْ عَلَى الرِّفْقِ مَالَا يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ وَمَالَا يُعْطِىْ عَلٰى مَاسِوَاهُ * (رواه مسلم)

১৫৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা কোমল এবং তিনি কোমলতা পছন্দ করেন। তিনি কঠোরতা এবং অন্য কিছুর উপর ততটুকু দেন না, যতটুকু কোমলতার উপর দিয়ে থাকেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অনেক মানুষ নিজেদের স্বভাব ও আচরণে কঠোর ও কর্কশ হয়ে থাকে, আবার অনেকেই নম্র ও দয়ালু থাকে। যারা বাস্তবতা উপলব্ধিতে ব্যর্থ, তারা মনে করে যে, কঠোরতা দ্বারা মানুষ তা লাভ করতে পারে, যা নম্রতা ও কোমলতা দ্বারা লাভ করা যায় না। তাদের ধারণায় কঠোরতা যেন কার্যোদ্ধারের মাধ্যম এবং উদ্দেশ্য সাধনের চাবিকাঠি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এ ভ্রান্ত ধারণাও দূর করে দিয়েছেন।

সর্বপ্রথম তো তিনি নম্র স্বভাবের মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এ বর্ণনা করেছেন যে, এটা আল্লাহ্ তা'আলার একটি সত্তাগত গুণ। তারপর বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এটা খুবই পছন্দনীয় বিষয় যে, তাঁর বান্দাদের পারস্পরিক আচরণ ও ব্যবহার নম্র ও বিনয়যুক্ত হবে। তারপর শেষে বলেছেন যে, উদ্দেশ্য সফল হওয়া না হওয়া এবং কোন জিনিস লাভ হওয়া বা না হওয়া তো আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যা কিছু হয় তাঁরই ফায়সালা ও ইচ্ছায় হয়ে থাকে। আর তাঁর নীতি হচ্ছে এই যে, তিনি নম্রতার উপর এতটুকু দান করেন, যতটুকু কঠোরতার উপর দেন না; বরং নম্রতা ছাড়া অন্য কোন জিনিসের উপরও আল্লাহ্ তা'আলা ততটুকু দান করেন না, যতটুকু নম্রতার উপর দেন। এ জন্য নিজের স্বার্থ ও কল্যাণের দৃষ্টিতেও নিজের সম্পর্ক ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে মানুষকে নম্রতা ও কোমলতার নীতিই অবলম্বন করা চাই। অন্য শব্দমালায় কথাটি এভাবে বলতে পারেন যে, যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ্ তার উপর সদয় হোন এবং তার কার্যসিদ্ধি করে দিন, সে যেন অন্যদের বেলায় সদয় থাকে এবং কঠোরতার পরিবর্তে নম্রতা ও কোমলতাকে নিজের মূলনীতি ও কর্মপদ্ধতি বানিয়ে নেয়।

(١٥٥) عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ يُحْرَمُ الرِّفْقَ يُحْرَمُ الْخَيْرَ *

(رواه مسلم)

১৫৫। হযরত জারীর (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নম্রতার গুণ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে সমূহ কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত থাকে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, নম্রতা ও কোমলতা এমন একটি গুণ এবং এর মর্যাদা এত বেশী যে, যে ব্যক্তি এ গুণ থেকে বঞ্চিত থাকে, সে যেন সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত রয়ে গেল। কথাটি এভাবেও বলা যায় যে, মানুষের অধিকাংশ কল্যাণ ও সাফল্যের মূলভিত্তি ও উৎস যেহেতু তার স্বভাবের নম্রতা। তাই যে ব্যক্তি এ স্বভাব থেকে বঞ্চিত রইল, সে সকল কল্যাণ, মঙ্গল ও সফলতা থেকেই বঞ্চিত থাকবে।

(١٥٦) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ *

(رواه البغوى فى شرح السنة)

১৫৬। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে যে ব্যক্তি কোমলতা গুণের অংশটি পেয়ে গেল, সে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের অংশটি পেয়ে গেল। আর যে ব্যক্তি নম্রতা গুণ থেকে বঞ্চিত রইল, সে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণের অংশ থেকে বঞ্চিত থাকল। —শরহুস্‌সুন্নাহ

(١٥٧) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرِيْدُ اللّٰهُ بِاَهْلِ بَيْتٍ رِفْقًا اِلَّا نَفَعَهُمْ وَلَا يُحْرِمُهُمْ اِيَّاهُ اِلَّا ضَرَّهُمْ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৫৭। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যে পরিবারের লোকদেরকে নম্রতার স্বভাব দান করেন, তাদেরকে উপকৃত করেই ছাড়েন। আর যে পরিবারের লোকদেরকে এ থেকে বঞ্চিত রাখেন, তাদেরকে তিনি ক্ষতিগ্রস্ত করেই ছাড়েন। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার সাধারণ নিয়ম ও বিধান হচ্ছে এই যে, যে পরিবারের লোকদেরকে তিনি নম্রতা গুণ দান করেন, তাদের জন্য এ নম্রতা গুণসমূহ কল্যাণ ও বরকতের কারণ হয়। আর যাদেরকে তিনি এ গুণ থেকে বঞ্চিত রাখেন, তারা অনেক ক্ষতি ও দুঃখ-বেদনার শিকার হয়।

মানুষের স্বভাবসমূহের মধ্যে কোমলতা এবং কঠোরতার বৈশিষ্ট্য এই যে, এ দু'টির প্রয়োগ ও ব্যবহারের ক্ষেত্র খুবই প্রশস্ত। যে ব্যক্তির মেযাজ ও আচরণে কঠোরতা ও নির্মমতা থাকবে, সে নিজের পরিবারের স্ত্রী, সন্তান, প্রিয়জন ও আত্মীয়-স্বজন সবার জন্য কঠোর হবে, প্রতিবেশীর অধিকারের বেলায় কঠিন হবে। সে যদি শিক্ষক হয়, তাহলে ছাত্রদের বেলায় কঠিন হবে। অনুরূপভাবে সে যদি শাসক অথবা কোন কর্মকর্তা হয়, তাহলে শাসিত ও অধীনস্থদের বেলায় কঠোর হবে। মোটকথা, জীবনে যেখানে যেখানে এবং যাদের সাথে তার পালা পড়বে তাদের সবার সাথেই তার ব্যবহার কঠোর হবে। আর এর ফল এ হবে যে, তার জীবন স্বয়ং তার জন্য এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটা স্বতন্ত্র বিপদ হয়ে যাবে। অপর দিকে যার মেযাজে ও আচরণে নম্রতা ও কোমলতা থাকবে, সে পরিবারের লোকদের প্রতি, প্রতিবেশীর প্রতি, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও অধীনস্থদের প্রতি, ছাত্র-উস্তাদের প্রতি এবং আপন ও পর সবার প্রতি বিনম্র ও কোমল থাকবে। আর এর ফল এই হবে যে, এ কোমলতার কারণে সে নিজেও শান্তিতে থাকবে এবং অন্যদের জন্যও সে শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হবে। তাছাড়া এ নম্রতা পরস্পর ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করবে এবং সম্মান, ভক্তি ও কল্যাণকামিতার অনুভূতি জাগ্রত করবে। পক্ষান্তরে স্বভাবের কঠোরতা ও রুক্ষতা অন্তরে ঘৃণা ও শত্রুতা সৃষ্টি করবে; হিংসা, মন্দ কামনা এবং ঝগড়া-বিবাদের অশুভ আকাঙ্ক্ষার আগুন প্রজ্বলিত করবে।

কঠোরতা ও নম্রতার এ হল কয়েকটি পার্থিব ফলাফল, যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে প্রত্যক্ষ করে থাকি এবং একটু চিন্তা করলে এর সুদূরপ্রসারী ফলও উপলব্ধি করতে পারি। এগুলো ছাড়া এ নম্রতা ও কঠোরতার যে বিরাট ফলাফল আখেরাতের জীবনে সামনে আসবে সেগুলো তো সময় আসলে সেখানেই প্রত্যক্ষ করা যাবে। তবে এ দুনিয়ার জীবনে আখেরাতের লাভ-ক্ষতি এবং পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপারে আমরা যতটুকু জানতে

ও বুঝতে পারি, এর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সংক্রান্ত বাণীগুলিই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এখানে এ ধারার কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে।

(١٥٨) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ وَبِمَنْ تَحْرُمُ النَّارُ عَلَيْهِ عَلٰى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ * (رواه ابوداؤد والترمذى)

১৫৮। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির সন্ধান দিব না, যে জাহান্নামের জন্য হারাম এবং জাহান্নামের আগুনও তার উপর হারাম ? (শুনে নাও, আমি বলে দিচ্ছি, জাহান্নামের আগুন হারাম) প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির উপর, যে গরম মেযাজী নয়, নম্র, মানুষের সাথে মিশুক এবং বিনম্র স্বভাবের। —আবূ দাঊদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে উল্লেখিত হাইয়্যিনুন, লাইয়্যিনুন, কারীবুন ও সাহ্লুন এ চারটি শব্দই প্রায় একার্থবোধক এবং এগুলো নম্রতা ও কোমলতার বিভিন্ন দিককেই ফুটিয়ে তোলে। হাদীসটির মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি নিজের মেযাজ ও আচরণে নম্র এবং নরম স্বভাবের কারণে মানুষের সাথে খুব মেলামেশা করে, দূরে দূরে এবং একা পৃথক হয়ে থাকে না। আর তার এ উত্তম ও মিষ্টি স্বভাবের কারণে মানুষও তাকে অকৃত্রিমভাবে ভালবাসে এবং তার সাথে মেলামেশা করে। সে যার সাথে কথা বলে নম্রতা ও অনুগ্রহের সাথে কথা বলে, এমন মানুষ জান্নাতী। জাহান্নামের আগুন তার উপর হারাম।

এ ধরনের হাদীসের ব্যাখ্যায় একাধিকবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, কুরআন মজীদের স্পষ্ট আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অব্যাহত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাহাবায়ে কেরামের মন-মস্তিষ্কে যেহেতু এ বিষয়টি বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল (এবং দ্বীনের সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞান রাখে, এমন প্রতিটি মানুষ আজও এতটুকু জানে) যে, এ ধরনের সুসংবাদের সম্পর্ক কেবল ঐসব লোকদের সাথে, যারা ঈমানের অধিকারী এবং ঈমানের অপরিহার্য দাবীসমূহ যারা পূরণ করে চলে। এ জন্য এ জাতীয় সুসংবাদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এ শর্তটি শব্দের মধ্যে উল্লেখ করা হয় না। কিন্তু মনে মনে এ শর্তটির কথা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। কেননা, এটা এক স্বীকৃত বাস্তবতা যে, ঈমান ছাড়া আল্লাহ্র কাছে কোন আমল ও সদগুণের কোনই মূল্য নেই।

(١٥٩) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِىُّ * (رواه ابوداؤد)

১৫৯। হারেছা ইবনে ওয়াহ্ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কটুবাক ও রুক্ষ-স্বভাব ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসে কখনো কখনো কোন মন্দকাজ অথবা খারাপ অভ্যাসের নিন্দাবাদ করতে গিয়ে এবং মানুষকে এ থেকে বাঁচানোর জন্য এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গীও অবলম্বন করা হয় যে, "এ কর্ম অথবা অভ্যাসে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না।" আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য কেবল এ

হয় যে, এ কর্ম অথবা অভ্যাসটি ঈমানের মর্যাদার পরিপন্থী এবং এটা জান্নাতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী। তাই জান্নাতের প্রত্যাশী প্রতিটি ঈমানদারকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এ কাজ ও অভ্যাস থেকে বিরত থাকতে হবে।

হারেছা ইবনে ওয়াহ্বের এ হাদীসের উদ্দেশ্যও এটাই যে, কটুবাক ও রুক্ষ-স্বভাব হওয়া ঈমানের পরিপন্থী একটি ঘৃণিত স্বভাব, যা জান্নাতের পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী এবং যা কোন মুসলমানের মধ্যে থাকা উচিত নয়। এ ঘৃণিত ও অপবিত্র স্বভাবের লোকেরা খাঁটি মু'মিনদের মত হতে পারবে না এবং তাদের সাথে জান্নাতে যেতে পারবে না।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বভাবের কোমলতা

(١٦٠) عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِيْنَ بِالْمَدِيْنَةِ وَاَنَا غُلَامٌ لَيْسَ كُلُّ اَمْرِىْ كَمَا يَشْتَهِىْ صَاحِبِىْ اَنْ يَّكُوْنَ عَلَيْهِ مَا قَالَ لِىْ فِيْهَا اُفٍّ قَطُّ وَمَا قَالَ لِىْ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا اَوْ اَلَا فَعَلْتَ هٰذَا * (رواه ابوداؤد)

১৬০। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মদীনায় দশ বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম। আমি তখন অল্প বয়স্ক এক তরুণ। এ জন্য আমার প্রতিটি কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি অনুযায়ী হত না। (অর্থাৎ, কমবয়সী হওয়ার কারণে আমার পক্ষ থেকে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে যেত।) কিন্তু দশ বছরের এ দীর্ঘ মেয়াদকালে তিনি কখনো "উহ্" শব্দ উচ্চারণ করে আমাকে তিরস্কার করেননি এবং কখনো একথা বলেননি যে, তুমি এ কাজটি কেন করলে অথবা এ কাজটি কেন করলে না। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদীনা শরীফ আগমন করলেন, তখন হযরত আনাসের বয়স দশ বছরের কাছাকাছি ছিল। তাঁর মা উম্মে সুলাইম তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক খেদমতের জন্য দিয়ে দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ খেদমতে ছিলেন। তাঁরই এ বর্ণনা যে, বয়স কম হওয়ার দরুন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আমার পক্ষ থেকে অনেক ত্রুটি হয়ে যেত। কিন্তু আমার কোন ভুল অথবা ত্রুটির উপর তিনি কখনো "উহ্" শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেননি এবং আমার উপর রাগ করেননি। নিঃসন্দেহে এটা খুবই কঠিন এক বিষয়; কিন্তু আমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তম জীবনাদর্শ এটাই। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর প্রিয় হাবীবের এ নম্রতা ও সহনশীলতার কিছু অংশ আমাদেরকেও দান করুন।

সহ্য, ধৈর্য অবলম্বন করা এবং রাগ না করা ও রাগ হজম করে ফেলা

(١٦١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لَا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ ذٰلِكَ مِرَارًا قَالَ لَا تَغْضَبْ * (رواه البخارى)

১৬১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ রাগান্বিত হয়ো না। লোকটি তারপরও কয়েকবার এ কথার পুনরাবৃত্তি করল এবং তিনিও প্রতিবার একই কথা বললেন যে, রাগান্বিত হয়ো না। —বুখারী

ব্যাখ্যাঃ মনে হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপদেশপ্রার্থী এ লোকটি খুব গরম মেযাজের ছিল এবং ক্রোধের কাছে পরাভূত ছিল। এ কারণে তার জন্য সবচেয়ে উপযোগী উপদেশ এটাই ছিল যে, রাগ করো না। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বার বার এ একই উপদেশ দিলেন।

এটাও এক বাস্তব সত্য যে, মানুষের মন্দ স্বভাবসমূহের মধ্যে রাগ বা ক্রোধ একটি মারাত্মক অভ্যাস, যা খুবই মন্দ পরিণতি ডেকে আনে। রাগের অবস্থায় মানুষের মধ্যে না আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখার প্রতি খেয়াল থাকে, না নিজের লাভ-ক্ষতির প্রতি লক্ষ্য থাকে। অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ বলে যে, মানুষের উপর শয়তানের নিয়ন্ত্রণ রাগের অবস্থায় যেমনটি চলে, অন্য কোন অবস্থায় হয়তো ততটা চলে না। মনে হয়, মানুষ তখন নিজের আয়ত্তে থাকে না; বরং শয়তানের মুঠিতে চলে যায়। এর চরম পর্যায় এই যে, রাগের মাথায় মানুষ কখনো কখনো কুফুরী বাক্য উচ্চারণ করতে শুরু করে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে বলেছেন যে, রাগ মানুষের দ্বীন ও ঈমানকে এমনভাবে ধ্বংস করে দেয়, যেমন মুছাব্বর মধুকে নষ্ট এবং তিক্ত বানিয়ে দেয়। (হাদীসটি কিতাবুল ঈমানে আগেও গিয়েছে।)

তবে এখানে মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী শরীঅতে যে রাগের নিষিদ্ধতা ও কঠোর নিন্দাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ঐ রাগ, যা নফ্স ও প্রবৃত্তির কারণে হয় এবং যার কাছে পরাভূত হয়ে মানুষ আল্লাহ্র সীমারেখা ও শরীঅতের বিধান অতিক্রম করে যায়। কিন্তু যে রাগ আল্লাহ্র জন্য এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে হয় এবং যাতে সীমা লংঘন হয় না; বরং মানুষ সেখানে আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখার সম্পূর্ণ ভিতরেই থাকে, সেই রাগ ঈমানের পরিপূর্ণতার লক্ষণ এবং আল্লাহ্র মাহাত্ম্যবোধের পরিচায়ক।

রাগের সময় যে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে সে-ই প্রকৃত বীর

(١٦٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهٗ عِنْدَ الْغَضَبِ * (رواه البخارى ومسلم)

১৬২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি বীর নয়, যে প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করে ফেলে; বরং প্রকৃত বীর ঐ ব্যক্তি, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে তার নফ্স, যাকে বশীভূত করতে খুবই বেগ পেতে হয়। যেমন, এক হাদীসে বলা হয়েছে, "তোমার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে স্বয়ং তোমারই নফ্স।" আর এটা জানা কথা যে, বিশেষ করে রাগের সময় এ নফ্সকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই কঠিন হয়। এ জন্যই বলা হয়েছে যে, বীর ও বাহাদুর নামে

অভিহিত হওয়ার প্রকৃত দাবীদার ঐ ব্যক্তিই হতে পারে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে এবং নফ্‌সের চাহিদা তাকে দিয়ে কোন অন্যায় আচরণ ও ভুল কাজ করিয়ে নিতে না পারে।

এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের দাবী এটা নয় যে, বান্দার অন্তরে ঐ অবস্থাই সৃষ্টি হবে না, যাকে রাগ, ক্রোধ ও গোস্‌সা বলা হয়। কেননা, কোন অপ্রীতিকর বিষয়ের কারণে অন্তরে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া তো সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত ব্যাপার এবং নবী-রাসূলগণও এর বাইরে নন। তবে আল্লাহ্ ও রাসূলের দাবী হচ্ছে এই যে, এ অবস্থার সময়ও যেন মানুষ নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। এমন যেন না হয় যে, মানুষ এর সামনে পরাভূত হয়ে এ ধরনের কর্মকাণ্ড শুরু করে দেবে যা দাসত্বের দাবীর পরিপন্থী।

রাগের সময় কি করা চাই

(١٦٣) عَنْ اَبِىْ ذَرّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَاِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَاِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ * (رواه احمد والترمذى)

১৬৩। হযরত আবূ যর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো যখন রাগ আসে আর সে দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে, তাহলে সে যেন বসে যায়। এভাবে যদি তার রাগ দূর হয়ে যায়, তাহলে তো ভাল। আর এতেও যদি রাগ প্রশমিত না হয়, তাহলে সে যেন শুয়ে পড়ে। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে রাগ দমনের একটি মনস্তাত্ত্বিক কৌশল ও পন্থা বলে দিয়েছেন, যা খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া এর আরেকটি উপকারিতা এও যে, রাগের মাথায় মানুষের পক্ষ থেকে যে সকল অপ্রীতিকর কর্মকাণ্ড ও অহেতুক কথাবার্তা প্রকাশ পেতে পারে, কোন জায়গায় সে স্থির হয়ে বসে গেলে এগুলোর সম্ভাবনা অনেকটা কমে যায়। আর কোথাও শুয়ে গেলে এ সম্ভাবনা আরো অনেক কমে যায়।

(١٦٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِمُوْا وَيَسِّرُوْا وَلَاتُعَسِّرُوْا وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ وَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ * (رواه احمد والطبرانى فى الكبير)

১৬৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদেরকে তোমরা দ্বীনের শিক্ষা দান কর এবং এ শিক্ষাদানে তোমরা সহজপন্থা ও নম্রতা অবলম্বন কর, কাঠিন্য আরোপ করো না। আর তোমাদের কারো যখন রাগ এসে যায়, তখন সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে, তোমাদের কারো যখন রাগ এসে যায় তখন সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে, তোমাদের কারো যখন রাগ এসে যায় তখন সে যেন নীরবতা অবলম্বন করে। —মুসনাদে আহমাদ, তাবরানী

ব্যাখ্যা ঃ রাগের মন্দ পরিণাম থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখানো দ্বিতীয় কৌশল যে, যখন রাগ আসবে, তখন মানুষ

নীরবতা অবলম্বন করে নেবে। আর একথা স্পষ্ট যে, এমন করলে রাগ মনের ভিতরেই শেষ হয়ে যাবে এবং বিষয়টি আর আগে বাড়বে না।

(١٦٥) عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ السَّعْدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَاِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَاِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَاِذَا غَضِبَ اَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ *

(رواه ابوداؤد)

১৬৫। আতিয়্যা ইবনে ওরওয়া সা'দী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ রাগ শয়তানের প্রভাবে আসে এবং শয়তান হচ্ছে আগুনের সৃষ্টি। আর আগুন পানি দ্বারা নিভানো হয়। তাই তোমাদের কারো যখন রাগ এসে যায়, তখন যেন সে ওযূ করে নেয়। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ রাগ দমনের জন্য এটা হচ্ছে বিশেষ তদ্বীর ও কৌশল এবং এটা পূর্বে উল্লেখিত অন্যান্য কৌশলের চেয়েও অধিক কার্যকর। বাস্তব সত্য এই যে, রাগের প্রচণ্ডতা ও তীব্রতার সময় যদি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি স্মরণে এসে যায় এবং সাথে সাথে উঠে গিয়ে পূর্ণ আদবের প্রতি লক্ষ্য রেখে ওযূ করে নেওয়া হয়, তাহলে রাগের তীব্রতা তৎক্ষণাৎ প্রশমিত হয়ে যাবে এবং এমন মনে হবে যে, ওযূর পানি সরাসরি রাগ ও উত্তেজনার জ্বলন্ত আগুনে গিয়ে পড়েছে।

আল্লাহ্র জন্য রাগ হজম করে নেওয়ার পুরস্কার

(١٦٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ اَفْضَلَ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّٰهِ تَعَالٰى * (رواه احمد)

১৬৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন বান্দা মহান আল্লাহ্র দৃষ্টিতে গোস্সার ঢোক্ অপেক্ষা উত্তম কোন ঢোক্ গলাধঃকরণ করে না, যা সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য হজম করে নেয়। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ রাগ সংবরণ করাকে যেমন আমাদের ভাষায় "গোস্সা হজম করে ফেলা" বলে, আরবী ভাষারও বাক-পদ্ধতি তাই। হাদীসটির মর্ম এই যে, পান করার অনেক এমন জিনিস আছে, যেগুলো পান করা এবং হজম করে ফেলা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির কারণ হয়ে থাকে। তবে এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম জিনিস হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় গোস্সা হজম করে ফেলা।

যেসব সদগুণের অধিকারী বান্দাদের জন্য জান্নাত তৈরী করে রাখা হয়েছে, কুরআন মজীদে তাদের একটি গুণ এও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ তারা গোস্সাকে হজম করে নেয় এবং মানুষের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করে। (সূরা আলে ইমরান ঃ আয়াত ১৩৪)

(١٦٧) عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ

يَقْدِرُ عَلَى اَنْ يُّنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِىْ اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ * (رواه الترمذى وابوداؤد)

১৬৭। সাহল ইবনে মো'আয তাঁর পিতা হযরত মো'আয (রাঃ)-এর সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রাগ সংবরণ করে নেয়—অথচ সে এটা কার্যকর করার শক্তি রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন তাকে সকল সৃষ্টির সামনে ডেকে আনবেন এবং তাকে তার পছন্দ অনুযায়ী যে কোন বেহেশতী হূর বেছে নেওয়ার অধিকার দান করবেন। —তিরমিযী, আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, রাগের তীব্রতার সময় মানুষের অন্তরের চরম ইচ্ছা এটাই হয় যে, সে রাগের দাবী পূরণ করে ফেলবে। অতএব, যে বান্দা শক্তি থাকা সত্ত্বেও কেবল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য নিজের মনের এ চরম ইচ্ছাকে দুনিয়াতে বলি দিয়ে ফেলে, আল্লাহ্ তা'আলা আখেরাতে এর বিনিময় এভাবে দান করবেন যে, সমগ্র সৃষ্টির সামনে তাকে ডেকে এনে বলবেন ঃ নিজের মনের ইচ্ছার ঐ কুরবানীর বিনিময়ে আজ বেহেশতী হূরদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা নিজের জন্য নির্বাচন করে নাও।

(١٦٨) عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللّٰهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ اِعْتَذَرَ اِلَى اللّٰهِ قَبِلَ اللّٰهُ عُذْرَهُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৬৮। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি (মন্দ কথা থেকে) নিজের রসনাকে ফিরিয়ে রাখে, আল্লাহ্ তা'আলা তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখেন। আর যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ দমন করে রাখে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর থেকে আযাব ফিরিয়ে রাখবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের অন্যায়-অপরাধের জন্য আল্লাহ্র নিকট ওযর-আপত্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ্ তার ওযর-আপত্তি কবূল করে নেন (এবং তাকে ক্ষমা করে দেন)। —বায়হাকী

ধৈর্য ও অচঞ্চলতা আল্লাহ্র নিকট খুবই প্রিয় গুণ

(١٦٩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَ اللّٰهُ اَلْحِلْمُ وَالْاَنَاةُ * (رواه مسلم)

১৬৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আব্দুল কায়েস গোত্রের সরদার "আশাজ্জ" কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে, যা আল্লাহ্র নিকট খুবই পছন্দনীয় ঃ (১) ধৈর্য, (রাগের কারণে পরাভূত না হওয়া।) (২) স্থিরতা অর্থাৎ, তাড়াতাড়ি না করা। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আব্দুল কায়েস গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত লাভের জন্য মদীনায় এসেছিল। প্রতিনিধি দলের সবাই নিজ নিজ বাহন থেকে লাফালাফি করে নেমে দ্রুত হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছে গেল। কিন্তু দলনেতা যার নাম ছিল মুনযির এবং ডাকনাম আশাজ্জ— তিনি তাড়াহুড়া করলেন না; বরং বাহন থেকে নেমে প্রথমে সব সামানপত্র একত্রিত ও এগুলোর হেফাযতের ব্যবস্থা করলেন। তারপর গোসল করলেন এবং পোশাক পরিবর্তন করে গাম্ভীর্যের সাথে ধীরস্থিরে দরবারে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এ চাল-চলন খুব পছন্দ করলেন এবং এ ক্ষেত্রেই তিনি বলেছিলেন ঃ তোমার মধ্যে এমন দু'টি স্বভাব রয়েছে, যেগুলো আল্লাহ্র নিকট খুবই প্রিয়। এর একটি হচ্ছে ধৈর্য ও গাম্ভীর্য অর্থাৎ, ক্রোধের কাছে পরাভূত না হওয়া এবং ক্রোধের সময়ও সংযমচিত্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে অচঞ্চলতা, অর্থাৎ, কোন কাজে তাড়াহুড়া না করা; বরং প্রতিটি কাজ ধীরে-স্থিরে সম্পাদন করা।

প্রতিটি কাজ ধীরে-স্থিরে ও স্বস্তির সাথে সম্পাদন করার প্রতি উৎসাহ দান

(١٧٠) عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْاَنَاةُ مِنَ اللّٰهِ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ * (رواه الترمذى)

১৭০। হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়িদী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ধীরে সুস্থে কাজ করা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে, আর তাড়াহুড়া শয়তানের প্রভাবে হয়ে থাকে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ প্রতিটি দায়িত্ব ধীরে সুস্থে সম্পাদন করার অভ্যাস একটি প্রশংসনীয় গুণ এবং এটা আল্লাহ্ তা'আলার তওফীকেই অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে তাড়াহুড়া করা একটি মন্দ অভ্যাস এবং এতে শয়তানের দখল থাকে।

(١٧١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسْ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤَدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ اَرْبَعٍ وَّ عِشْرِيْنَ جُزْءً مِنَ النُّبُوَّةِ * (رواه الترمذى)

১৭১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সারজিস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম চাল-চলন, ধীরে-স্থিরে কার্য সম্পাদনের অভ্যাস এবং মধ্যম পন্থা অবলম্বন নবুওয়তের চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য এ তিনটি জিনিসের গুরুত্ব বর্ণনা করা এবং এগুলোর প্রতি উৎসাহ প্রদান। এটা নবুওয়তের অংশ হওয়ার অর্থ বাহ্যতঃ এই যে, নবীদের জীবন যেসব সৌন্দর্য ও গুণাবলীতে পরিপূর্ণ ও সুশোভিত থাকে, এ তিনটি গুণ এগুলোর চব্বিশ ভাগের এক ভাগ। অথবা বলা যায়, মানুষের সুন্দর চরিত্র গঠনে নবী-রাসূলগণ যেসব অভ্যাস ও গুণাবলীর শিক্ষা দিতেন, এগুলোর চব্বিশ ভাগের এক ভাগ হচ্ছে এ তিনটি জিনিস ঃ (১) উত্তম চাল-চলন, (২) ধীরে সুস্থে কার্য সম্পাদনের অভ্যাস এবং (৩) মধ্যম পন্থা অবলম্বন।

মধ্যম পন্থার ব্যাখ্যা

আমরা হাদীসে উল্লেখিত "ইকতেসাদ" শব্দের অনুবাদ করেছি মধ্যম পন্থা। এর অর্থ হচ্ছে

সর্বাবস্থায় বাহুল্য ও সঙ্কোচন থেকে বেঁচে থাকা এবং এতদুভয়ের মাঝামাঝি অবস্থান করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষা ও উপদেশে এ বিষয়টির উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন। এমনকি এবাদতের মত সর্বোত্তম কর্মেও তিনি মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তাকীদ করেছেন। কোন কোন সাহাবী খুব বেশী এবাদত করার ইচ্ছা করলেন, অর্থাৎ, দিনের বেলায় সর্বদা রোযা রাখার এবং সারা রাত জেগে নফল নামায পড়ার পরিকল্পনা করলেন। একথা শুনে তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করলেন এবং এ থেকে নিষেধ করে দিলেন। অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী যখন তাদের সকল সম্পদ আল্লাহ্‌র পথে খরচ করে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন তিনি তাদেরকে এ কাজ থেকে বারণ করলেন এবং কেবল সম্পদের এক তৃতীয়াংশ খরচ করার অনুমতি দিলেন। বস্তুতঃ এটাই হচ্ছে "ইকতেসাদ" তথা মধ্যম পন্থা।

কিতাবুর রিকাকে আপনি এমন অনেক হাদীস পড়ে এসেছেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভাব-অনটন এবং সচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মধ্যম পন্থা অবলম্বনের তাকীদ দিয়েছেন। এর মর্ম এটাই যে, মানুষ অভাব-অনটন ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থায়ই মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে চলবে। আর এটাকেই এ হাদীসে নবুওয়াতের একটা অংশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মিষ্টি কথা ও কর্কশ ভাষা

মানুষের নৈতিক জীবনের যেসব দিক দিয়ে তার সমজাতির সাথে সর্বাধিক পালা পড়ে এবং যেগুলোর প্রভাব ও ফলাফল খুবই সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে, এগুলোর মধ্যে তার ভাষার মিষ্টতা ও তিক্ততা এবং বাক্যালাপে নম্রতা ও কঠোরতা অন্যতম। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অনুসারী ও ভক্তদেরকে মিষ্টি কথা ও মধুর ভাষা ব্যবহার করতে খুব তাকীদ করতেন এবং খারাপ ও কঠোর ভাষা প্রয়োগ করতে নিষেধ করতেন। এমনকি মন্দ কথার উত্তরেও মন্দ কথা বলতে তিনি পছন্দ করতেন না। নিম্নে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস পাঠ করে নিন।

(١٧٢) عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ يَهُوْدَ اَتَوُا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ قَالَ مَهْلًا يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَاِيَّاكِ وَالْعُنْفَ وَالْفُحْشَ *

(رواه البخارى)

১৭২। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, ইয়াহুদীদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হল এবং তারা (নিজেদের ভ্রষ্টতা ও দুষ্টামির কারণে আস্‌সালামু আলাইকুম-এর স্থলে) বলল ঃ আস্‌সামু আলাইকুম। (যা প্রকৃতপক্ষে একটি গালি এবং এর অর্থ হচ্ছে তোমার মরণ হোক।) হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, তোমাদের হোক, আর তোমাদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত ও গযবও নামুক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে আয়েশা! রসনা সংযত কর, নম্রতার পথ অবলম্বন কর। কঠোরতা ও কটু বাক্য পরিত্যাগ কর। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন এ ইয়াহুদীদের চরম ঔদ্ধত্যের জবাবেও কঠোরতাকে পছন্দ করলেন না; বরং নম্র ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দিলেন।

(١٧٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِطَعَّانٍ وَلَا لَعَّانٍ وَلَافَاحِشٍ وَلَا بَذِيٍّ * (رواه الترمذى)

১৭৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তি কটুভাষী হয় না, অভিসম্পাতকারী হয় না, অশ্লীল ভাষী ও গালিগালাজকারী হয় না। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, মু'মিনের অবস্থান ও তার চরিত্র এই হওয়া চাই যে, তার মুখ দিয়ে কটু কথা ও গালিগালাজ বের হবে না। কিতাবুল ঈমানে ঐ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে, যেখানে ঝগড়া-বিবাদের সময় গালমন্দ করাকে মুনাফিকের আলামত বলা হয়েছে।

(١٧٤) عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِئْسَ ابْنُ الْعَشِيْرَةِ اَوْ بِئْسَ رَجُلُ الْعَشِيْرَةِ ثُمَّ قَالَ ائْذَنُوْا لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ الَانَ لَهُ الْقَوْلَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَنْتَ لَهُ الْقَوْلَ وَقَدْ قُلْتَ لَهُ مَا قُلْتَ قَالَ اِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَنْ وَدَعَهُ اَوْ تَرَكَهُ النَّاسُ لِاتِّقَاءِ فُحْشِهِ * (رواه البخارى ومسلم وابوداؤد واللفظ له)

১৭৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইল। তিনি তখন আমাদেরকে বললেন ঃ এ লোকটি তার গোত্রের মন্দ সন্তান অথবা বললেন ঃ লোকটি তার গোত্রের মধ্যে খুবই খারাপ মানুষ। তারপর তিনি বললেন ঃ একে আসার অনুমতি দাও। পরে সে যখন ভিতরে প্রবেশ করল, তখন তিনি তার সাথে খুব নম্রভাবে কথা বললেন। লোকটি যখন চলে গেল, তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো তার সাথে খুব নম্রভাবে কথা বললেন, অথচ আগে আপনি তারই ব্যাপারে এ কথা বলেছিলেন (যে, সে খুবই খারাপ লোক।) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তরে বললেন ঃ আল্লাহ্‌র নিকট কেয়ামতের দিন সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ হবে ঐ ব্যক্তি, যার কটু ভাষার কারণে মানুষ তাকে পরিত্যাগ করে। (অর্থাৎ, তার সাথে মেলামেশা ও কথা-বার্তা বলা থেকে মানুষ বেঁচে থাকতে চায়। —বুখারী, মুসলিম, আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরের সারমর্ম এই যে, কোন মানুষ যদি মন্দ ও দুষ্টও হয়, তবুও তার সাথে কথা নম্রতা ও ভদ্রতার সাথেই বলতে হবে। অন্যথায় মন্দভাষা ও কটুকথার প্রতিক্রিয়া এই হয় যে, এমন ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত করতে ও কথা বলতে মানুষ পলায়নপর হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তির অবস্থা এই হয়, সে আল্লাহ্‌র নিকট খুবই মন্দ এবং কেয়ামতের দিন তার অবস্থা হবে খুবই খারাপ। এ হাদীসটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বুঝে নেওয়া উচিত ঃ

(১) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তির আগমনের পূর্বেই উপস্থিত লোকদেরকে তার মন্দ হওয়ার অবগতি সম্ভবতঃ এজন্য দিয়েছিলেন, যাতে তারা তার সামনে

সতর্ক হয়ে কথা বলে এবং এমন কোন কথা যেন না বলে ফেলে, যা কোন দুষ্ট ও খারাপ মানুষের সামনে বলা যায় না। এমন কোন পরিণামদর্শিতার কারণে কারো কোন দোষের ব্যাপারে অন্যদেরকে সতর্ক করা গীবত ও পরনিন্দার মধ্যে গণ্য নয়; বরং এমন করার নির্দেশ রয়েছে। যেমন, এক হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পাপাচারী ও খারাপ মানুষের মধ্যে যে দোষ থাকে, তা লোকদেরকে বলে দাও, যাতে আল্লাহ্র বান্দারা তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারে। —কানযুল উম্মাল

(২) এ হাদীস থেকে একথাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি মন্দ ও দুষ্ট হলেও তার সাথে নরমভাবেই কথা বলতে হবে। এ ঘটনা সম্পর্কেই বুখারী শরীফের এক বর্ণনায় এ শব্দমালা এসেছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটির সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করলেন ও কথাবার্তা বললেন। এর দ্বারা বুঝা গেল যে, যারা এ ধারণা পোষণ করে যে, পাপাচারী ও মন্দ স্বভাবের লোকদের সাথে ভালভাবে সাক্ষাত করাও উচিত নয়, এ ধারণা ঠিক নয়।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী উদ্ধৃত করেছেন যে, তিনি বলতেন ঃ আমরা অনেক এমন মানুষের সাথেও হাসিমুখে সাক্ষাত করি এবং কথা বলি, যাদের অবস্থা ও কর্মের কারণে আমাদের অন্তর তাদেরকে অভিসম্পাত করে। তবে বিশেষ কোন ক্ষেত্রে কঠোর আচরণ ও অসন্তুষ্টি প্রকাশের মধ্যেই যদি কল্যাণ নিহিত থাকে, তাহলে সেখানে এমন পন্থা অবলম্বন করাও ঠিক হবে।

(৩) এ হাদীসেরই আবূ দাউদের এক বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি নিজেই বলেছিলেন যে, লোকটি খুবই খারাপ, তার সাথে আপনি আবার কেমন করে হাসিমুখে কথা বললেন ? রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্তর দিলেন ঃ হে আয়েশা! আল্লাহ্ তা'আলা কটুভাষী ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। মর্ম এই যে, কটুকথা বলার অভ্যাস মানুষকে আল্লাহ্র ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করে দেয়। তাই আমি কেমন করে এ দোষে লিপ্ত হতে পারি।

(١٧٥) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ * (رواه البخارى)

১৭৫। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ উত্তম ও মিষ্টি কথাও একটি সদকা। (অর্থাৎ, এক ধরনের পুণ্য, যার দ্বারা বান্দা প্রতিদান ও পুরস্কারের অধিকারী হয়।) —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ এটা আসলে একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ বিশেষ। ইমাম বুখারী এ পূর্ণ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন এবং এক স্থানে সনদ উল্লেখ ছাড়া কেবল এ অংশটুকু উদ্ধৃত করেছেন। এর মর্ম স্পষ্ট যে, কারো সাথে মধুর ভঙ্গিতে উত্তম কথা বললে এটা তার খুশী ও আনন্দের কারণ হয়। আর আল্লাহ্র কোন বান্দার মনে আনন্দ দান করা নিঃসন্দেহে বড় পুণ্য কাজ।

কথা কম বলা এবং খারাপ ও অহেতুক কথা থেকে রসনার হেফাযত করা

দুনিয়াতে যেসব ঝগড়া-বিবাদ ও গন্ডগোল হয়ে থাকে, এগুলোর অধিকাংশই অসংযত কথা-বার্তার কারণে হয়ে থাকে, তাছাড়া মানুষের পক্ষ থেকে যেসব বড় বড় গুনাহ্ প্রকাশ পায়, এগুলোর সম্পর্কও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রসনার সাথেই থাকে। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টির প্রতি সবিশেষ তাকীদ করতেন যে, রসনাকে যেন নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং সর্বপ্রকার মন্দ কথা; বরং অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থহীন কথা থেকেও যেন রসনাকে বিরত রাখা হয়। কথা বলার যখন বিশেষ কোন প্রয়োজন দেখা না দেয় এবং এ কথার দ্বারা কোন কল্যাণ ও লাভের আশা না থাকে, তখন যেন নীরবতাই অবলম্বন করা হয়। এ শিক্ষাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোর উপর মানুষের কল্যাণ ও মুক্তি নির্ভরশীল। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, নামায, রোযা, হজ্জ এবং জেহাদের মত এবাদতসমূহের দীপ্তি ও সাদর গ্রহণযোগ্যতাও রসনার এ সতর্ক ব্যবহারের উপর নির্ভর করে।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিছু হাদীস "কিতাবুর রিকাকে" ইতঃপূর্বেই এসে গিয়েছে। নিম্নে আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

(١٧٦) عَنْ مُعَاذٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ قَالَ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ اَمْرٍ عَظِيْمٍ وَاِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلٰى مَنْ يَسَّرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكْ بِهٖ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلٰوةَ وَتُؤْتِي الزَّكٰوةَ وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰى اَبْوَابِ الْخَيْرِ ؟ اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِى الْمَاءُ النَّارَ وَصَلٰوةُ الرَّجُلِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ- ثُمَّ تَلَا تَتَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ -- حَتّٰى بَلَغَ يَعْمَلُوْنَ ثُمَّ قَالَ اَلَا اَدُلُّكَ بِرَأْسِ الْاَمْرِ وَعَمُوْدِهٖ وَذُرْوَةِ سَنَامِهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَأْسُ الْاَمْرِ الْاِسْلَامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلٰوةُ وَذُرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ- ثُمَّ قَالَ اَلَا اُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذٰلِكَ كُلِّهٖ قُلْتُ بَلٰى يَا نَبِيَّ اللّٰهِ فَاَخَذَ بِلِسَانِهٖ فَقَالَ كُفَّ عَلَيْكَ هٰذَا فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَاِنَّا لَمُؤَاخَذُوْنَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهٖ قَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ يَا مُعَاذُ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اَوْ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ اِلَّا حَصَائِدُ اَلْسِنَتِهِمْ * (رواه احمد والترمذى وابن ماجة)

১৭৬। হযরত মো'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। তিনি বললেন ঃ তুমি একটি বিরাট বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করেছ, তবে (বিষয়টি বিরাট ও কঠিন হওয়া সত্ত্বেও) ঐ বান্দার জন্য সহজ, যার জন্য আল্লাহ্ সহজ করে দেন। তুমি আল্লাহ্র এবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করবে না, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং বায়তুল্লাহ্র হজ্জ করবে। তারপর বললেন ঃ আমি কি তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহের সন্ধান দিব না ? (এ পর্যন্ত যেসব বিষয়ের কথা বলা হয়েছে, এগুলো ইসলামের

ফরয বিধান ছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার বললেন ঃ তুমি যদি চাও, তাহলে আমি তোমাকে কল্যাণ লাভের আরো কিছু বিষয়ের কথা বলে দেব। সম্ভবতঃ এ কথার দ্বারা নফল এবাদত উদ্দেশ্য ছিল। তাই তিনি হযরত মো'আযের আগ্রহ দেখে বললেন ঃ) রোযা হচ্ছে (গুনাহ্ এবং জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষাকারী) ঢাল, সদাকা গুনাহ্কে (এবং গুনাহের কারণে সৃষ্ট আগুনকে) এমনভাবে নিভিয়ে দেয়, যেমন পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে। আর কোন ব্যক্তির মধ্যরাতের নামায। (অর্থাৎ, তাহাজ্জুদ নামাযেরও এ অবস্থা এবং কল্যাণের দ্বারসমূহের মধ্যে এটি অন্যতম।) তারপর তিনি (তাহাজ্জুদ ও দানের ফযীলত প্রসঙ্গে) সূরা সেজদার এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ হচ্ছে ঃ তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে পৃথক থাকে। তারা তাদের প্রতিপালককে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দান করেছি, তা থেকে ব্যয় করে। তাদের জন্য নয়নপ্রীতিকর কি কি প্রতিদান লুক্কায়িত রয়েছে, তা কেউ জানে না। এটা হবে তাদের কর্মের প্রতিদান।

তারপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে দ্বীনের শির, এর স্তম্ভ এবং এর উচ্চ শিখরের সন্ধান দেব না ? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলে দিন। তিনি তখন বললেন ঃ দ্বীনের শির হচ্ছে ইসলাম, এর স্তম্ভ হচ্ছে নামায, আর এর উচ্চ শিখর হচ্ছে জেহাদ। তারপর তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাকে ঐ জিনিসের কথা বলে দেব, যার উপর ঐসব কিছু নির্ভর করে ? আমি আরয করলাম, হে আল্লাহ্র নবী! আপনি অবশ্যই বলুন। তিনি তখন নিজের জিহ্বা ধরে বললেন ঃ এটাকে নিবৃত রাখ। (অর্থাৎ, নিজের রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ।) আমি আরয করলাম, আমরা যেসব কথা-বার্তা বলি, এগুলোর জন্যও কি আমাদেরকে ধরা হবে ? তিনি বললেন ঃ হে মো'আয! তোমার মা তোমার উপর কাঁদুক। (আরবী বাকরীতি অনুযায়ী এটা প্রীতিবাক্য।) মানুষকে তাদের মুখের উপর অথবা নাকের উপর উপুড় করে এ অসংযত কথা-বার্তাই জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরকানে ইসলামের পর "কল্যাণের দ্বার" শিরোনামে রোযা এবং দান খয়রাতের যে আলোচনা করেছেন, এ অধমের নিকট এর দ্বারা নফল রোযা এবং নফল দান উদ্দেশ্য। এ জন্যই তিনি এর সাথে তাহাজ্জুদ নামাযের উল্লেখ করেছেন, যা নফল নামাযসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। তারপর তিনি ইসলামকে দ্বীনের শির নামে অভিহিত করেছেন। বাহ্যত এখানে ইসলাম দ্বারা ইসলাম গ্রহণ করা এবং এটাকে নিজের দ্বীন বানিয়ে নেওয়া উদ্দেশ্য। আর তখন এর মর্ম এই হবে যে, কোন ব্যক্তি যদি সকল পুণ্য কাজ করে নেয় এবং তার চরিত্র এবং আচার-আচরণও ভাল হয়; কিন্তু সে ইসলামকে নিজের দ্বীন বানিয়ে না নেয়, তাহলে তার উদাহরণ হবে এমন একটি দেহের মত, যার হাত পা ইত্যাদি সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু মাথা নেই।

তারপর নামাযকে তিনি দ্বীনের স্তম্ভ বলেছেন। এর মর্ম এই যে, যেভাবে স্তম্ভ ছাড়া কোন ঘর টিকে থাকতে পারে না, অনুরূপভাবে নামায ছাড়া দ্বীন কায়েম থাকতে পারে না। তারপর তিনি জেহাদকে দ্বীনের সর্বোচ্চ শিখর বলে উল্লেখ করেছেন। আর একথা স্পষ্ট যে, দ্বীনের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি জেহাদের উপরই নির্ভরশীল।

হাদীসের সর্বশেষ অংশ—যার কারণে হাদীসটি এখানে আনা হয়েছে, সেটা হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ উপরে উল্লেখিত সবগুলো জিনিসের

নির্ভরশীলতা এর উপর যে, মানুষ তার রসনাকে হেফাযত করবে। কেননা, লাগামহীন কথা-বার্তা মানুষের ঐসব পুণ্য আমলকে ওজনহীন ও দীপ্তিশূন্য করে দেয়। তারপর হযরত মো'আয একথা শুনে যখন আশ্চর্যবোধ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন যে, মুখের কথার উপরও কি আমাদের পাকড়াও হবে? তখন তিনি উত্তরে বললেন ঃ অনেক মানুষকেই এ রসনার অপব্যবহার ও লাগামহীন কথাবার্তার কারণেই উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। আজও প্রতিটি চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নিজ চোখেই দেখে নিতে পারে যে, যেসব বড় বড় গুনাহ্ মহামারীর মত ব্যাপক আকার ধারণ করে আছে এবং যেগুলো থেকে আত্মরক্ষাকারী মানুষ খুবই কম, এগুলোর সম্পর্ক অধিকাংশই রসনা ও মুখের সাথেই। জনৈক কবি বলেছেন ঃ মানুষের উপর ক্ষতিকারক যা কিছু আসছে, এর সবগুলোই হচ্ছে রসনা ও মুখের ফল।

(١٧٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَفَعَهُ قَالَ اِذَا اَصْبَحَ ابْنُ اٰدَمَ فَاِنَّ الْاَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ فَتَقُوْلُ اِتَّقِ اللّٰهَ فِيْنَا فَاِنَّا نَحْنُ بِكَ فَاِنِ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَاِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا * (رواه الترمذى)

১৭৭। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ আদম-সন্তান যখন প্রভাত করে, তখন তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিনয় ও অনুরোধের সাথে জিহ্বাকে বলে, আমাদের ব্যাপারে আল্লাহ্কে ভয় কর (এবং আমাদের উপর দয়া কর।) কেননা, আমরা তোমারই সাথে জড়িত। তুমি ঠিক থাকলে আমরাও ঠিক থাকব। আর তুমি বাঁকা হয়ে গেলে আমরাও বাঁকা হয়ে যাব (এবং পরে এর মন্দ পরিণাম সবাইকে ভোগ করতে হবে।) —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ উপরের হাদীস থেকে জানা গিয়েছিল যে, মানুষের প্রকাশ্য অঙ্গসমূহের মধ্য থেকে জিহ্বার অপপ্রয়োগজনিত কারণেই মানুষ বেশী জাহান্নামে যাবে। এ হাদীসে বলে দেওয়া হয়েছে যে, জিহ্বার এ বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রতিদিন মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে জিহ্বাকে বলে যে, আমাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ তোমার সাথেই সম্পর্কিত। এ জন্য তুমি আমাদের উপর দয়া কর এবং আল্লাহ্ থেকে নির্ভয় হয়ে লাগামহীন হয়ে যেয়ো না। অন্যথায় তোমার সাথে আমরাও আল্লাহ্র আযাবে নিপতিত হয়ে যাব।

অন্য একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে অন্তরের এ বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, এটা যখন ঠিক থাকে, তখন সারা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই ঠিক থাকে। কিন্তু এ দুটি কথার মধ্যে কোন বৈপরিত্ব নেই। আসল তো অন্তরই; কিন্তু বাহ্যিক অঙ্গসমূহের মধ্যে যেহেতু জিহ্বাই এর বিশেষ মুখপাত্র, তাই উভয়টির ধরন একই যে, এটা ঠিক থাকলে সব ঠিক। আর যদি ও দু'টোর মধ্যে বক্রতা এসে যায়, তাহলে আর মানুষের রক্ষা নেই।

(١٧٨) عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِىْ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ اَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ * (رواه البخارى)

১৭৮। হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাকে তার মুখ ও যৌনাঙ্গের ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেবে (যে, এ দু'টির অপপ্রয়োগ হবে না,) আমি তার জান্নাতে প্রবেশের দায়িত্ব নিচ্ছি। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের অঙ্গসমূহের মধ্যে জিহ্বা ছাড়া অন্য যে অঙ্গটির অপব্যবহার থেকে হেফাযত করার গুরুত্ব খুবই বেশী, সেটা হচ্ছে মানুষের যৌন অঙ্গ। এ জন্য এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ উভয়টির ব্যাপারে বলেছেন যে, যে বান্দা এ দায়িত্ব গ্রহণ করবে যে, সে অপব্যবহার থেকে নিজের জিহ্বাকেও হেফাযত করবে এবং জৈবিক চাহিদা পূরণকেও আল্লাহ্‌র বিধানের অধীনে রাখবে, আমি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি।

এখানে আবার সেই কথাটি মনে রাখতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধরনের বক্তব্যের সম্বোধিত ব্যক্তি হতেন ঐসব ঈমানদারগণ, যারা তাঁরই শিক্ষা-দীক্ষা দ্বারা এ মৌলিক সত্যকে জেনে নিয়েছিলেন যে, এ ধরনের প্রতিশ্রুতির সম্পর্ক কেবল ঐসব লোকদের সাথে, যারা ঈমানের অধিকারী এবং ঈমানের মৌলিক দাবীসমূহও তারা পূরণ করে থাকে।

(١٧٩) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا اَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ قَالَ فَاَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهٖ وَقَالَ هٰذَا * (رواه الترمذى)

১৭৯। হযরত সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ সাকাফী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার উপর আপনি যেসব জিনিসের আশংকা করেন, এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আশংকার বস্তু কোন্‌টি ? সুফিয়ান বলেন, তখন তিনি নিজের জিহ্বাটি ধরলেন এবং বললেন ঃ সবচেয়ে আশংকার বস্তু হচ্ছে এটি। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, তোমার পক্ষ থেকে আমি অন্য কোন মন্দের তো বেশী আশংকা করি না, তবে আমার এ ভয় যে, তোমার জিহ্বা লাগামহীন হয়ে যায় কিনা। তাই এ ব্যাপারে সাবধান ও সতর্ক থাকবে। হতে পারে যে, প্রশ্নকারী সুফিয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ্‌র ভাষা কিছুটা কড়া ছিল এবং এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একথা বলেছিলেন। আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন।

(١٨٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَمَتَ نَجَا * (رواه احمد والترمذى والدارمى والبيهقى فى شعب الايمان)

১৮০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে চুপ থাকল, সে মুক্তি পেয়ে গেল। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি খারাপ কথা ও অহেতুক কথা থেকে জিহ্বাকে বিরত রাখল, সে ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেল। এ মাত্র হযরত মো'আয (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্য অতিক্রান্ত হয়েছে যে, মানুষ বেশীর ভাগ অসংযত কথাবার্তার কারণেই উপুড় হয়ে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

(۱۸۱) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَقِيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَالنَّجَاةُ ؟ فَقَالَ

اَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلٰى خَطِيْئَتِكَ * (رواه احمد والترمذى)

১৮১। হযরত উকবা ইবনে 'আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, মুক্তি লাভের উপায় কি ? (এবং এ মুক্তি লাভের জন্য আমাকে কি করতে হবে ?) তিনি উত্তরে বললেন ঃ তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ, নিজের ঘরেই পড়ে থাক এবং নিজের গুনাহ্র জন্য আল্লাহ্র দরবারে কান্নাকাটি কর। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ জিহ্বাকে আয়ত্তে রাখা এবং নিজের গুনাহ্র জন্য কান্নাকাটি করার মর্ম তো স্পষ্ট। তবে এ দু'টি ছাড়া তৃতীয় যে উপদেশটি তিনি দিয়েছেন যে, "নিজের ঘরে পড়ে থাক" এর অর্থ এই যে, যখন বাইরে প্রয়োজনীয় কোন কাজ না থাকে, তখন আড্ডাবাজ ও ভবঘুরেদের মত বাইরে ঘুরাফেরা করো না; বরং নিজের ঘরে স্ত্রী-সন্তানদের সাথে থেকে বাড়ীর কাজকর্ম দেখাশুনা কর এবং আল্লাহ্র এবাদত করে যাও। অভিজ্ঞতা সাক্ষী যে, বিনা প্রয়োজনে বাইরে ঘুরাফেরা করা অনেক অনিষ্ট ও ফেতনার কারণ হয়ে যায়।

(۱۸۲) عَنْ اَنَسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى خَصْلَتَيْنِ

هُمَا اَخَفُّ عَلَى الظَّهْرِ وَاَثْقَلُ فِى الْمِيْزَانِ ؟ قَالَ قُلْتُ بَلٰى قَالَ طُوْلُ الصَّمْتِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَالَّذِىْ

نَفْسِىْ بِيَدِهٖ مَا عَمِلَ الْخَلاَئِقُ بِمِثْلِهِمَا * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৮২। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন দু'টি অভ্যাসের কথা বলে দেব না, যা বহন করা খুবই সহজ এবং মীযানের পাল্লায় খুবই ভারি ? আমি আরয করলাম, অবশ্যই বলুন। তিনি তখন বললেন ঃ দীর্ঘ নীরবতার অভ্যাস ও সচ্চরিত্রতা। ঐ মহান সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! সৃষ্টিকুলের আমলসমূহের মধ্যে এ দু'টির তুলনা হয় না। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ পূর্বেও যেমন উল্লেখ করা হয়েছে যে, বেশী নীরব থাকার অর্থ এটাই যে, মানুষ অপ্রয়োজনীয় ও অশোভন কথাবার্তা থেকে নিজের জিহ্বাকে ফিরিয়ে রাখবে। আর যে ব্যক্তির কর্মপদ্ধতি এই হবে, সে স্বাভাবিকভাবেই স্বল্পভাষী ও দীর্ঘ নীরবতা পালনকারী হবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দুনিয়ার সবচেয়ে বেশী কথা বলার প্রয়োজন ছিল। কেননা, কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির পথ প্রদর্শনের কাজ তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল এবং তিনি এ প্রয়োজনে কথা বলতে ত্রুটি করতেন না; বরং বলার মত ছোট বড় সব কথাই বলতেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রত্যক্ষদর্শী সাহাবায়ে কেরাম তাঁর এ অবস্থা বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুব বেশী নীরব থাকতেন। (শরহুস্ সুন্নাহ) অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ তিনি কেবল ঐ কথাই বলতেন, যার উপর তিনি সওয়াবের আশা করতেন। —তাবরানী

(١٨٣) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ اَتَيْتُ اَبَا ذَرٍّ فَوَجَدْتُهُ فِى الْمَسْجِدِ مُحْتَبِيًا بِكِسَاءٍ اَسْوَدَ وَحْدَهُ فَقُلْتُ يَا اَبَا ذَرٍّ مَا هٰذِهِ الْوَحْدَةُ ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْوَحْدَةُ خَيْرٌ مِنْ جَلِيْسِ السُّوْءِ وَالْجَلِيْسُ الصَّالِحُ خَيْرٌ مِنَ الْوَحْدَةِ وَاِمْلَاءُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِّنَ السُّكُوْتِ وَالسُّكُوْتُ خَيْرٌ مِّنْ اِمْلَاءِ الشَّرِّ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৮৩। ইমরান ইবনে হিত্তান তাবেয়ী থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদিন হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) এর খেদমতে হাজির হয়ে দেখি যে, তিনি মসজিদে একটা কালো চাদর গায়ে জড়িয়ে একাকী বসে আছেন। আমি বললাম, হে আবূ যর! এটা কেমন একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা। (অর্থাৎ, আপনি এভাবে সম্পূর্ণ একা ও নিঃসঙ্গ থাকা কেন অবলম্বন করলেন ?) তিনি উত্তর দিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ খারাপ সাথীর সঙ্গ থেকে একা থাকা ভাল, আর সৎসঙ্গ একাকিত্বের চেয়ে উত্তম। কাউকে ভাল কথা বলে দেওয়া নীরব থাকার চেয়ে ভাল, আর মন্দ কথা বলার চেয়ে নীরব থাকা ভাল। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে এ কথাটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এসে গিয়েছে যে, নীরব থাকার যে ফযীলত, সেটা হয় মন্দ কথা বলার তুলনায়। অন্যথায় ভাল কথা বলা নীরব থাকার চেয়ে উত্তম। অনুরূপভাবে এ কথাটিও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, অসৎ লোকের সাথে মেলামেশা ও তাদের সাহচর্যের চেয়ে একা থাকা ভাল। কিন্তু পুণ্যবানদের সাহচর্য একাকিত্বের চেয়ে উত্তম।

ফায়েদা ঃ এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম কথা এই বুঝে নেওয়া চাই যে, আল্লাহ্র বান্দাদের প্রকৃতি, তাদের যোগ্যতা এবং ঝোঁক-প্রবণতা বিভিন্ন হয়ে থাকে। এদিকে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শে এমন বিজ্ঞজনোচিত প্রশস্ততা ও সমন্বয়ের সুযোগ রয়েছে যে, বিভিন্ন মেযাজ ও বিভিন্ন মনের মানুষ নিজেদের মেযাজ ও রুচি অনুযায়ী তাঁর অনুসরণ করে আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টির সুউচ্চ স্থান লাভ করে নিতে পারে। যেমন, অনেক লোকের মন-মেযাজ এমন থাকে যে, যে ধরনের লোকদেরকে সে পছন্দ করে না, তাদের সাথে মেলামেশা করা তার জন্য খুবই কঠিন ও ভারী হয়ে যায় এবং এ ধরনের মানুষের সাথে মেলামেশা রাখাতে সে নিজের ক্ষতি মনে করে। এ ধরনের মানুষের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা ও দিকনির্দেশনা বর্তমান রয়েছে, যার উল্লেখ হযরত আবূ যর গেফারী এ হাদীসে করেছেন এবং যার উপর তিনি স্বয়ং আমল করতেন।

অপরদিকে অনেক মানুষ নিজেদের স্বভাব-প্রকৃতি ও মেযাজের দিক দিয়ে এমন হয়ে থাকে যে, যেসব লোকের অবস্থা ও চাল-চলন তাদের কাছে পছন্দনীয় নয়, তাদেরও সংশোধন এবং তাদেরকে সুপথে আনার জন্য তাদের সাথে মেলামেশা করা এবং তাদের মন্দ প্রভাব থেকে নিজেদেরকে হেফাযতে রেখে বিভিন্নভাবে তাদের খেদমত করা তাদের জন্য কোন কঠিন বিষয় মনে হয় না; বরং এর প্রতি তাদের একটা ঝোঁক ও আকর্ষণ থাকে। তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্যান্য হাদীসে (যেগুলো যথাস্থানে আসবে।) এ কর্মপদ্ধতিরই দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। আর অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম যাঁরা আবূ যর (রাঃ)-এর মত নির্জনতা প্রিয় ছিলেন না, তাঁদের কর্মপদ্ধতি এটাই ছিল। তাই সাহাবায়ে কেরামের জীবনের

কোন কোন ক্ষেত্রে এবং অনুরূপভাবে পরবর্তী যুগের ঈমানদার ও পুণ্যবানদের বিভিন্ন মহলের কর্মপদ্ধতিতে এ ধরনের যে বিভিন্নরূপ কোথাও কোথাও দেখা যায়, এটা কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্ট বিভিন্ন মন-মেযাজের স্বাভাবিক পার্থক্য এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষার ব্যাপকতা ও পরিপূর্ণতার এক অনিবার্য ফল। তাই যারা নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে সবাইকে একই অবস্থার এবং সম্পূর্ণ একইরূপে দেখতে চান, তারা আসলে দ্বীনের ব্যাপক রূপ, নববী শিক্ষার সামগ্রিক চিত্র এবং আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টিরহস্য ও তাঁর বিধানের হেকমতের বিষয়টি ভাল করে ভেবে দেখেননি।

অহেতুক কথা বর্জন

(١٨٤) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالَا يَعْنِيْهِ * (رواه مالك واحمد و روراه ابن ماجة عن ابى هريرة والترمذى والبيهقى فى شعب الايمان عنهما)

১৮৪। হযরত আলী ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের ইসলামী জিন্দেগীর একটি সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য এই যে, সে উদ্দেশ্যহীন ও অহেতুক কথাবার্তা পরিহার করে চলে। —মোয়াত্তা মালেক, মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, অহেতুক ও উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তা না বলা এবং বাজে কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখা ঈমানের পরিপূর্ণতার দাবী এবং মানুষের ইসলামী জীবন ধারার এক মহান সৌন্দর্য। এ গুণকেই সংক্ষেপে "অহেতুক কথা ও কাজ বর্জন" বলে।

পরনিন্দা

যেসব বদভ্যাসের সম্পর্ক জিহ্বার সাথে হয়ে থাকে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলোকে মারাত্মক অপরাধ ও কবীরা গুনাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন এবং যেগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য তিনি সবিশেষ তাকীদ করেছেন, এগুলোর মধ্যে পরনিন্দা অন্যতম। কারো এমন কোন বক্তব্য অন্যের গোচরীভূত করা, যার দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয় এবং একজনের অপরজনের প্রতি কুধারণা সৃষ্টি হয়, এ মন্দ অভ্যাসের নাম হচ্ছে চোগলখোরী ও পরনিন্দা।

যেহেতু পারস্পরিক মধুর সম্পর্ক, সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থান ও আন্তরিক ভালবাসা স্থাপন নববী শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অন্যতম, (এমনকি এক হাদীসে এটাকে কোন কোন দিক দিয়ে এবাদতের চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বলা হয়েছে।) এ জন্য যে জিনিসটি পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট করে হিংসা-বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও ঘৃণা সৃষ্টি করে, সেটা অবশ্যই মারাত্মক পাপ হিসাবে গণ্য হবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরনিন্দাকে কঠিন গুনাহ্ হিসাবে উল্লেখ করেছেন এবং আখেরাতে এর যে মন্দ পরিণতি ভোগ করতে হবে, সে সম্পর্কে উম্মতকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

(١٨٥) عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ * (رواه البخارى وفى رواية مسلم نمام)

১৮৫। হযরত হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পরনিন্দাকারী ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, পরনিন্দা ও চোগলখোরীর অভ্যাস ঐসব মারাত্মক গুনাহ্র অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো জান্নাতে প্রবেশের অন্তরায় হবে এবং কোন মানুষ এ অপবিত্র ও শয়তানী স্বভাবের সাথে জান্নাতে যেতে পারবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'আলা যদি নিজের অনুগ্রহে কাউকে মাফ করে দিয়ে অথবা এ অপরাধের শাস্তি দিয়ে তাকে পবিত্র করে নেন, তাহলে এরপর জান্নাতে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে।

(١٨٦) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غُنْمٍ وَاَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خِيَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ اِذَا رُأُوْا ذُكِرَ اللّٰهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ الْمَشَّاؤُنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ اَلْبَاغُوْنَ الْبُرَاءَ الْعَنَتَ * (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

১৮৬। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে গুনম ও আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র উত্তম বান্দা হচ্ছে তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়। আর নিকৃষ্ট বান্দা হচ্ছে তারা, যারা চোগলখোরী করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং যারা আল্লাহ্র নিষ্পাপ বান্দাদেরকে কোন গুনাহে জড়িত করে দিতে অথবা কষ্টে ফেলে দিতে প্রয়াসী থাকে। —মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে আল্লাহ্র নেক বান্দাদের এ লক্ষণ বলা হয়েছে যে, তাদেরকে দেখলে আল্লাহ্র কথা স্মরণ হয়ে যায়। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ তাদেরকে বলা হয়েছে, যারা চোগলখোরীতে অভ্যস্ত, চোগলখোরী করে করে বন্ধুদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা যাদের পেশা এবং যারা আল্লাহ্র বান্দাদের বদনাম ও তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার পেছনে লেগে থাকে।

অতএব মানুষের উচিত, সাহচর্য ও ভালবাসার জন্য আল্লাহ্র এমন বান্দাদেরকে খুঁজে বের করা, যাদেরকে দেখলে অন্তরের উদাসীনতা দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র স্মরণ এসে যায়। এর বিপরীত— যারা আল্লাহ্কে চিনে না এবং মানুষকে কষ্ট দেওয়ার পেছনে লেগে থাকে, মানুষের বদনাম করা ও ক্ষতিসাধন করা যাদের নেশা, এমন লোকদের থেকে নিজেকে দূরে রাখবে এবং তাদের মন্দ প্রভাব থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে।

(١٨٧) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُبَلِّغُنِىْ اَحَدٌ مِنْ اَصْحَابِىْ عَنْ اَحَدٍ شَيْئًا فَاِنِّىْ اُحِبُّ اَنْ اَخْرُجَ اِلَيْكُمْ وَاَنَا سَلِيْمُ الصَّدْرِ * (رواه ابوداؤد)

১৮৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সহচরদের মধ্য থেকে কেউ যেন কারো কোন মন্দ কথা আমার নিকট না পৌঁছায়। কেননা, আমি এটাই পছন্দ করি যে, আমি যখন তোমাদের কাছে আসি, তখন যেন আমার অন্তর (সবার প্রতি) পরিষ্কার ও নির্মল থাকে। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসের মাধ্যমে উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, অন্যের ব্যাপারে এমন কথা শুনতেও যেন মানুষ বিরত থাকে, যার দ্বারা তার অন্তরে কুধারণা এবং মনোবেদনা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। (তবে মনে রাখতে হবে যে, যেসব ক্ষেত্রে শরয়ী প্রয়োজন এবং দ্বীনী স্বার্থের দাবীই হচ্ছে এমন কথা বলে দেওয়া অথবা শ্রবণ করা, সেসব ক্ষেত্র এ নিষেধাজ্ঞার বাইরে।)

কারো অগোচরে নিন্দা ও অপবাদ প্রসঙ্গ

চোগলখোরী দ্বারা যে ধরনের বিপর্যয় ও ভয়াবহ ফলাফল সামনে আসে, এর চাইতেও মারাত্মক ফলাফল ও পরিণতি গীবত ও অপবাদের দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকে। গীবত হচ্ছে কোন ভাইয়ের এমন কথা অথবা তার এমন কোন কর্ম ও অবস্থা অন্যের কাছে বলে দেওয়া, যার উল্লেখ সে অপছন্দ করে এবং এর দ্বারা সে মনে কষ্ট পায় এবং অপমানবোধ করে। যেহেতু গীবত দ্বারা একজন মানুষের অপমান ও বেইজ্জতি হয়, তার অন্তর আহত হয় এবং অন্তরে ফেতনা ও মনোমালিন্যের বীজ অংকুরিত হয়— যার ফল কখনো কখনো খুবই মারাত্মক ও সুদূরপ্রসারী হতে দেখা যায়, এ জন্য গীবতকে শরীঅতে খুবই কঠিন গুনাহ্ সাব্যস্ত করা হয়েছে। গীবতের ঘৃণ্যতা ও এর জঘন্যতা বুঝানোর জন্য কুরআন ও হাদীসে এটাকে "মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া"র সাথে তুলনা করা হয়েছে। যাহোক, গীবতকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ঘৃণিত ও কদর্য চরিত্র এবং কবীরা গুনাহ্ বলে উল্লেখ করেছেন।

অপরদিকে অপবাদ এর চেয়েও মারাত্মক। অপবাদের অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্র কোন বান্দার প্রতি এমন কোন খারাপ কর্ম অথবা মন্দ চরিত্রের কথা আরোপ করা, যা থেকে সে সম্পূর্ণ পবিত্র ও মুক্ত। এ কথা স্পষ্ট যে, এটা মানুষের দুর্ভাগ্য ডেকে আনে এবং এমন কাজে লিপ্ত ব্যক্তিরা আল্লাহ্র দরবারেও অপরাধী এবং মানুষের কাছেও অপরাধী। এ ভূমিকার পর এখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কয়টি হাদীস পাঠ করুন ঃ

(١٨٨) عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ الْاَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ مَنْ اٰمَنَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ قَلْبَهُ لَا تَغْتَابُوا الْمُسْلِمِيْنَ وَلَا تَتَّبِعُوْا عَوْرَاتِهِمْ فَاِنَّهُ مَنْ اِتَّبَعَ عَوْرَاتِهِمْ يَتَّبِعِ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ يَتَّبِعُ اللّٰهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ فِيْ بَيْتِهِ * (رواه ابوداؤد)

১৮৮। হযরত আবূ বারযাহ আসলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে ঐ সকল লোকজন! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ এবং ঈমান এখনও তাহার অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে নাই, তোমরা মুসলমানদের গীবত করো না এবং তাদের গোপন দোষের অনুসন্ধানে লেগে যেও না। কেননা, যে ব্যক্তি এমন করবে, আল্লাহ্ তা'আলাও তার সাথে এমন আচরণ করবেন। আর আল্লাহ্ যার দোষ অন্বেষণ করবেন, তিনি তাকে তার ঘরের মধ্যেই অপমানিত করে ছাড়বেন। —আবু দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, কোন মুসলমানের গীবত করা এবং তার দোষ ও দুর্বলতা প্রকাশে উৎসুক হওয়া প্রকৃতপক্ষে এমন এক মুনাফেকসুলভ কর্ম, যা কেবল ঐসব লোক থেকেই প্রকাশিত হতে পারে, যারা কেবল মুখে মুসলমান এবং ঈমান তাদের অন্তরে স্থান করে নিতে পারেনি।

(١٨٩) عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عُرِجَ بِىْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ اَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَصُدُوْرَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيْلُ قَالَ هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ لُحُوْمَ النَّاسِ وَيَقَعُوْنَ فِىْ اَعْرَاضِهِمْ * (رواه ابوداؤد)

১৮৯। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন আমাকে মে'রাজে নিয়ে যাওয়া হল, তখন (ঐ উর্ধ্বজগতের ভ্রমণে) আমি এমন কিছু লোকের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলো ছিল তামার এবং তারা এগুলো দিয়ে খুবলে নিজেদের মুখমন্ডল ও বক্ষ আহত করে যাচ্ছিল। আমি জিবরাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা ? জিবরাঈল বললেন, এরা ঐসব লোক, যারা মানুষের গোশ্‌ত ভক্ষণ করত (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র বান্দাদের গীবত করত) এবং তাদের মান-সম্ভ্রম নিয়ে খেলা করত। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে তামার নখের যে উল্লেখ রয়েছে, এর দ্বারা বাহ্যতঃ উদ্দেশ্য এই যে, তাদের নখগুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত লাল তামার মত ছিল এবং তারা এ নখগুলো দিয়েই তাদের মুখমন্ডল ও বক্ষদেশকে খাবলে খাবলে ক্ষত-বিক্ষত করছিল। তাদের জন্য বরযখ জগতে এ বিশেষ শাস্তি নির্ধারিত হওয়ার রহস্য এই যে, দুনিয়ার জীবনে এ অপরাধীরা আল্লাহ্‌র বান্দাদের গোশ্‌ত খুবলে তুলে নিত অর্থাৎ, গীবত করত এবং এটা ছিল তাদের প্রিয় নেশা।

(١٩٠) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَكَيْفَ الْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا ؟ قَالَ اِنَّ الرَّجُلَ لَيَزْنِىْ فَيَتُوْبُ فَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِ (وَفِىْ رِوَايَةٍ فَيَتُوْبُ فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لَهُ) وَاِنَّ صَاحِبَ الْغِيْبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتّٰى يَغْفِرُهَا لَهُ صَاحِبُهُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৯০। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী ও জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গীবত ব্যভিচারের চাইতেও বেশী জঘন্য। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! গীবত ব্যভিচারের চেয়ে জঘন্য হয় কিভাবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ মানুষ যদি দুর্ভাগ্যক্রমে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েই যায় এবং তওবা করে নেয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন। কিন্তু গীবতকারীকে যে পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজে মাফ না করে দেয়, সে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার ক্ষমা হয় না। —বায়হাকী

(١٩١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْغِيْبَةُ ؟ قَالُوْا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيْلَ اَفَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ فِىْ اَخِىْ مَا اَقُوْلُ ؟ قَالَ اِنْ كَانَ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَّمْ يَكُنْ فِيْهِ مَا تَقُوْلُ فَقَدْ بَهَتَّهُ * (رواه مسلم)

১৯১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন ঃ তোমরা কি জান, গীবত কাকে বলে ? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। তিনি তখন বললেন ঃ গীবত হচ্ছে তোমার ভাইয়ের এমন কোন বিষয় আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। সাহাবীদের পক্ষ থেকে জিজ্ঞাসা করা হল, বলুন তো! আমি যা বলি, তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে বাস্তবেই বিদ্যমান থাকে ? তিনি উত্তর দিলেন, তার মধ্যে এ দোষ বিদ্যমান থাকলেই তো বলা হবে যে, তুমি গীবত করেছ। আর যদি তার মধ্যে এ দোষ বিদ্যমানই না থাকে, তাহলে তো তুমি তার উপর অপবাদ আরোপ করলে (যা গীবতের চেয়েও জঘন্য)। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা গীবতের স্বরূপ এবং গীবত ও অপবাদের পার্থক্য স্পষ্টভাবে বুঝা গেল। আর একথাও জানা গেল যে, অপবাদ আরোপ করা গীবত করার চেয়েও মারাত্মক ও জঘন্য।

ফায়দা ঃ এখানে এ কথাটিও মনে রাখতে হবে যে, যদি আল্লাহ্র বান্দাদের কল্যাণ কামনায় অথবা কোন ধরনের ক্ষতি ও বিপর্যয় রোধ করতে গিয়ে কোন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর বাস্তব দোষ অন্যের সামনে বর্ণনা করা জরুরী হয়ে যায়, অথবা কোন দ্বীনী, নৈতিক কিংবা সামাজিক স্বার্থ সংরক্ষণ এর উপর নির্ভরশীল হয়ে যায়, তাহলে ঐ ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর দোষ বর্ণনা করা নিষিদ্ধ গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না; বরং কোন কোন অবস্থায় এটা সওয়াবের কাজ হিসাবে গণ্য হবে। যেমন, বিচারক ও হাকিমের সামনে জালেমের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া, কোন পেশাদার প্রতারকের প্রতারণা সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করা, যাতে মানুষ তার প্রতারণার শিকার না হয়।

মুহাদ্দেসগণ যে অনির্ভরযোগ্য ও অবিশ্বস্ত হাদীস বর্ণনাকারীদের সমালোচনা করে থাকেন এবং হক্কানী ওলামায়ে কেরাম বাতেলপন্থীদের দোষ ও তাদের ভণ্ডামী সম্পর্কে লোকদেরকে অবহিত করে থাকেন, এগুলোও এ ধরনের দ্বীনী প্রয়োজনে করা হয়ে থাকে। তাই এটাও নিষিদ্ধ গীবত নয়।

দ্বিমুখীপনার নিষিদ্ধতা

অনেক মানুষের এ অভ্যাস থাকে যে, যখন দু'ব্যক্তি অথবা দু'গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ ও বিবাদ দেখা দেয়, তখন সে উভয় পক্ষের সাথে মিলে অন্যের বিরুদ্ধে কথা বলে। তেমনিভাবে অনেকের অবস্থা এই হয় যে, যখন কারো সাথে মিলিত হয়, তখন তার সাথে নিজের সুন্দর সম্পর্কের কথা প্রকাশ করে, কিন্তু পশ্চাতে তার দোষ ও সমালোচনামূলক কথাবার্তা বলে। এ ধরনের মানুষকে দুমুখা বলা হয়। এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এ কর্মনীতি এক ধরনের মুনাফেকী এবং এক প্রকার প্রতারণা যা থেকে বাঁচার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানদারদেরকে কঠোর তাকীদ করেছেন। তিনি বলে দিয়েছেন যে, এটা জঘন্য গুনাহ এবং এতে লিপ্ত ব্যক্তিরা কঠোরতর আযাবের সম্মুখীন হবে।

(١٩٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُوْنَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِىْ يَأْتِىْ هٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهٰؤُلَاءِ بِوَجْهٍ * (رواه البخارى ومسلم)

১৯২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেয়ামতের দিন সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে এদের কাছে এক মুখ নিয়ে যায়, আবার ওদের কাছে আরেক মুখ নিয়ে হাজির হয়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কেয়ামতের দিন এমন ব্যক্তিকে যে সর্বাপেক্ষা মন্দ অবস্থায় দেখা যাবে, এর কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা পরবর্তী হাদীস দ্বারা জানা যাবে।

(١٩٣) عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِى الدُّنْيَا كَانَ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِسَانَانِ مِنْ نَّارٍ * (رواه ابوداؤد)

১৯৩। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দুমুখী হবে, কেয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকবে। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ সৎকর্ম এবং সৎস্বভাবসমূহ— যেগুলোর উপর আখেরাতে সওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে, এগুলো বিভিন্ন প্রকারের এবং এগুলোর স্তরও ভিন্ন ভিন্ন। অনুরূপভাবে মন্দকর্ম এবং মন্দ স্বভাবসমূহ— যেগুলোর উপর আখেরাতের শাস্তির হুমকি দেওয়া হয়েছে, সেগুলোও বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন স্তরের। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দ্বারা প্রত্যেক ভাল ও মন্দের পুরস্কার ও শাস্তি সেই কাজের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে নির্ধারণ করেছেন। তাই দ্বিমুখীপনা (যা এক ধরনের মুনাফেকী) এর শাস্তি এই নির্ধারণ করা হয়েছে যে, এ চরিত্রের মানুষের মুখে সেখানে আগুনের দু'টি জিহ্বা থাকবে। মনে রাখা চাই যে, কোন কোন সাপের দু'টি জিহ্বা থাকে।

এখানে এ কথাটি আমাদের সবার জন্য ভাবনার বিষয় যে, কোন কোন মন্দ কর্ম ও মন্দ স্বভাব বাস্তবে খুবই ভয়াবহ এবং আল্লাহ্ তা'আলার কাছে অত্যন্ত মারাত্মক। কিন্তু আমরা এগুলোকে সাধারণ ব্যাপার মনে করি এবং এগুলো থেকে আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু যত্নবান হওয়া উচিত, আমরা ততটুকু যত্নবান হই না। এ ধরনের মন্দ বিষয়সমূহ সম্পর্কেই কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ তোমরা এটাকে সাধারণ ব্যাপার এবং হাল্কা বিষয় মনে কর, অথচ আল্লাহ্র নিকট এটা খুবই গুরুতর ও মারাত্মক বিষয়। এ দ্বিমুখীপনাও এ পর্যায়ের। আমাদের মধ্যে অনেকেই এটাকে সাধারণ ব্যাপার মনে করে এবং এটা থেকে আত্মরক্ষার চিন্তা করে না। অথচ এ দু'টি হাদীস দ্বারা জানা গিয়েছে যে, এটা কত গুরুতর ও মারাত্মক গুনাহ্ এবং আখেরাতে এর জন্য কি কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা এবং মিথ্যা ও প্রতারণা প্রসঙ্গ

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষা ও আদর্শে যেসব সুন্দর চরিত্র ও সদগুণসমূহের উপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন এবং যেগুলোকে ঈমানের অপরিহার্য অঙ্গ সাব্যস্ত করেছেন, এগুলোর মধ্যে সত্যবাদিতা ও আমানতদারীর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফের এ হাদীসটি "কিতাবুল ঈমানে" উল্লেখ করে আসা হয়েছে যে, মিথ্যা বলা, আমানতে খেয়ানত করা এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা মুনাফেকীর আলামতসমূহের মধ্যে অন্যতম

এবং যার মধ্যে এ দোষগুলোর সমন্বয় ঘটে, সে মুনাফেক। অনুরূপভাবে ঐ হাদীসটিও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যার মধ্যে আমানতদারী ও বিশ্বস্ততা নেই, তার মধ্যে ঈমান নেই।" এ হাদীসটিও পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে যে, "মু'মিন ব্যক্তি মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত হতে পারে না।"

এখন এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐসব বাণী লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে, যেগুলোর মধ্যে তিনি সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে সরাসরি নির্দেশ করেছেন।

(١٩٤) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَاِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَ اِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكِذْبَ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا * (رواه البخارى ومسلم)

১৯৪। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সত্যবাদিতা অবলম্বন কর এবং সর্বদা সত্য কথা বল। কেননা, সত্যবাদিতা পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়, আর পুণ্য মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যায়। মানুষ যখন সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্যকেই অনুসন্ধান করে, তখন সে সিদ্দীকের স্তরে পৌঁছে যায় এবং আল্লাহ্র কাছে তাকে সিদ্দীক তথা মহাসত্যবাদী হিসাবে লিখে নেওয়া হয়।

আর তোমরা সর্বদা মিথ্যা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, মিথ্যার অভ্যাস মানুষকে পাপাচারের দিকে নিয়ে যায়, আর পাপাচার তাকে জাহান্নামে নিয়ে যায়। মানুষ যখন মিথ্যায় অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং মিথ্যাকে অবলম্বন করে নেয়, তখন এর ফল এই হয় যে, তাকে আল্লাহ্র কাছে মহামিথ্যুক হিসাবে লিখে দেওয়া হয়। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, সত্য কথা বলা স্বয়ং একটি ভাল অভ্যাস। সাথে সাথে এর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এটা মানুষের জীবনের অন্যান্য দিকেও ভাল প্রভাব সৃষ্টি করে তাকে জান্নাতের অধিকারী বানিয়ে দেয় এবং সত্য বলায় অভ্যস্ত মানুষ সিদ্দীকের স্তরে পৌঁছে যায়। অনুরূপভাবে মিথ্যা বলা স্বয়ং একটি ঘৃণিত স্বভাব। তাছাড়া এর একটি মন্দ প্রতিক্রিয়া এটাও যে, এটা মানুষের মধ্যে পাপাচার ও অবাধ্যতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে তার সম্পূর্ণ জীবনটাকে পাপাচারের জীবন বানিয়ে জাহান্নাম পর্যন্ত নিয়ে যায়। অধিকন্তু মিথ্যায় অভ্যস্ত ব্যক্তি মহামিথ্যুকের স্তরে পৌঁছে একেবারে অভিশপ্ত হয়ে যায়।

(١٩٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ قُرَادٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ يَوْمًا فَجَعَلَ اَصْحَابُهٗ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهٖ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكُمْ عَلٰى هٰذَا قَالُوْا حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهٗ اَنْ يُحِبَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اَوْ يُحِبَّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ

فَلْيَصْدُقْ حَدِيْثَهُ اِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَائْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَهُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

১৯৫। আব্দুর রহমান ইবনে আবী কুরাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ওযূ করলেন। সাহাবায়ে কেরাম তখন তাঁর ওযূর পানি নিয়ে নিয়ে (নিজেদের মুখমণ্ডল ও শরীরে) মাখতে লাগলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন্ জিনিস তোমাদেরকে এ কাজে উদ্বুদ্ধ করছে এবং কোন্ আবেগ তোমাদের দ্বারা এ কাজ করিয়ে নিচ্ছে ? তাঁরা উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ভালবাসা।" তাঁদের এ উত্তর শুনে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি এতে আনন্দিত হয় এবং সে চায় যে, আল্লাহ্ এবং রাসূলকে সে ভালবাসবে অথবা আল্লাহ্ ও রাসূল তাকে ভালবাসা দান করবেন, তার জন্য উচিত যে, সে যখনই কথা বলবে, সত্য বলবে, যখন তার কাছে কোন আমানত সমর্পণ করা হবে, তখন কোন প্রকার খেয়ানত ছাড়াই সে এটা আদায় করে দেবে, আর সে যার প্রতিবেশী হয়ে থাকবে, তার সাথে সুন্দর আচরণ করবে। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের ভালবাসা এবং তাদের সাথে সুসম্পর্কের প্রথম দাবী হচ্ছে এই যে, মানুষ সর্বদা সত্য কথা বলবে, আমানতদারী ও বিশ্বস্ততাকে আপন নিদর্শন বানিয়ে নেবে এবং মিথ্যা ও প্রতারণা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকবে। যদি এটা না হয়, তাহলে ভালবাসার এ দাবী এক নিরর্থক দাবী ও এক ধরনের মুনাফেকী ছাড়া কিছুই নয়।

(١٩٦) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِضْمَنُوْا لِىْ سِتًّا مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اُصْدُقُوْا اِذَا حَدَّثْتُمْ وَاَوْفُوْا اِذَا وَعَدْتُّمْ وَاَدُّوْا اِذَائْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوْا فُرُوْجَكُمْ وَغُضُّوْا اَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ * (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

১৯৬। হযরত উবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে ছয়টি বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দাও, আমি তোমাদের জন্য জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। যখন কথা বলবে তখন সত্য বলবে, যখন ওয়াদা করবে তখন তা পূরণ করবে, যখন আমানত সমর্পণ করা হবে তখন ঠিকমত তা আদায় করে দেবে, নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাযত করবে, নিষিদ্ধ বস্তু থেকে নিজের চোখকে হেফাযত রাখবে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিজের হাতকে ফিরিয়ে রাখবে। (অর্থাৎ, কাউকে অন্যায়ভাবে প্রহার করবে না, কষ্ট দেবে না এবং কারো মাল-সম্পদের দিকে হাত বাড়াবে না।) —মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তি যদি ঈমান নিয়ে আসে এবং ইসলামের বিধি-বিধান পালন করে, আর উল্লেখিত ছয়টি মৌলিক চরিত্রের প্রতিও পূর্ণ যত্নবান হয়, তাহলে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতী হবে। তার জন্য আল্লাহ্ ও রাসূলের পক্ষ থেকে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি ও সুসংবাদ রয়েছে।

ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা ও বিশ্বস্ততা

(১৯৭) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلتَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ * (رواه الترمذى والدارمى والدار قطنى)

১৯৭। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সত্যবাদী ও আমানতদার ব্যবসায়ী নবী-রাসূল, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথে থাকবে। —তিরমিযী, দারেমী, দারাকুতনী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটি স্পষ্টভাবে একথাও বলে দিয়েছে যে, আল্লাহ্র নৈকট্যের সুউচ্চ স্তর লাভ করার জন্যও দুনিয়া এবং দুনিয়ার কাজ-কারবার পরিত্যাগ করা জরুরী নয়; বরং একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা কেন্দ্রে বসে আল্লাহ্ ও রাসূলের বিধি-বিধান পালন এবং সততা ও আমানতদারীর মত ধর্মীয় নীতি অনুসরণের মাধ্যমে আখেরাতে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য পর্যন্ত লাভ করতে পারে।

(১৯৮) عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلتُّجَّارُ يُحْشَرُوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فُجَّارًا اِلَّا مَنِ اتَّقٰى وَبَرَّ وَ صَدَقَ * (رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى)

১৯৮। উবায়েদ ইবনে রেফা'আ তার পিতা রেফা'আ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ব্যবসায়ীদেরকে কেয়ামতের দিন পাপাচারী হিসাবে উঠানো হবে। (অর্থাৎ, সাধারণ ব্যবসায়ীদের হাশর হবে পাপাচারীদের মত।) তবে ঐসব ব্যবসায়ী এর ব্যতিক্রম, যারা আল্লাহ্কে ভয় করে চলে, পুণ্যপথের অনুসারী হয় এবং সত্য কথা বলে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্, দারেমী

মিথ্যা ও প্রতারণা ঈমানের পরিপন্থী

(১৯৯) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطْبَعُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلَالِ كُلِّهَا اِلَّا الْخِيَانَةَ وَالْكِذْبَ * (رواه احمد والبيهقى فى شعب الايمان)

১৯৯। হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিনের চরিত্রে সবকিছুর অবকাশ থাকতে পারে, কিন্তু প্রতারণা ও মিথ্যা তার মধ্যে থাকতে পারে না। —মুসনাদে আহমাদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, মু'মিন ব্যক্তি যদি বাস্তবেই মু'মিন হয়, তাহলে তার চরিত্রে মিথ্যা ও প্রতারণার কোন ঠাঁই থাকতে পারে না। অন্যান্য দোষ ও দুর্বলতা তার মধ্যে থাকতে পারে; কিন্তু প্রতারণা ও মিথ্যার মত মুনাফেকসুলভ বিষয় ঈমানের সাথে একত্রিত হতে পারে না।.অতএব, কারো মধ্যে যদি এসব মন্দ স্বভাব থাকে, তাহলে তাকে বুঝতে হবে যে, ঈমানের প্রকৃত স্বরূপ এখনও তার অর্জিত হয় নি। তাই সে যদি এ বঞ্চিত অবস্থায় নিশ্চিন্ত ও পরিতৃপ্ত হয়ে থাকতে না চায়, তাহলে তাকে এসব ঈমানবিরোধী স্বভাব থেকে নিজের জীবনকে পবিত্র করে নিতে হবে।

মিথ্যার দুর্গন্ধ

(٢٠٠) عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَذَبَ الْعَبْدُ تَبَاعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مِيْلًا مِنْ نَتْنِ مَاجَاءَ بِهِ ٭ (رواه الترمذى)

২০০। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন বান্দা মিথ্যা কথা বলে, তখন ফেরেশ্তা এ মিথ্যার দুর্গন্ধের কারণে এক মাইল দূরে চলে যায়। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ যেভাবে এ জগতের জড় পদার্থসমূহে সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ থাকে, তেমনিভাবে ভাল ও মন্দ কর্ম এবং বাক্যসমূহেও সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ থাকে, যা ফেরেশ্তারা ঠিক এভাবেই অনুভব করে, যেভাবে আমরা এখানকার সুগন্ধ ও দুর্গন্ধকে অনুভব করে থাকি। আর কোন কোন সময় আল্লাহ্র ঐসব বান্দাও তা অনুভব করে নিতে পারে, যাদের আত্মিক শক্তি তাদের জৈবিক শক্তির উপর প্রবল হয়ে যায়।

একটি মারাত্মক প্রতারণা

(٢٠١) عَنْ سُفْيَانَ بْنِ اَسِيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كَبُرَتْ خِيَانَةً اَنْ تُحَدِّثَ اَخَاكَ حَدِيْثًا وَهُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَاَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ ٭ (رواه ابوداؤد)

২০১। সুফিয়ান ইবনে আসীদ হাযরামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা বড়ই বিশ্বাসঘাতকতা যে, তুমি তোমার কোন ভাইকে কোন কথা বল, আর সে এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে নেয়, অথচ তুমি এতে মিথ্যাবাদী। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, মিথ্যা যদিও সর্বাবস্থায় গুনাহ্ এবং মারাত্মক গুনাহ্; কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এটা খুবই মারাত্মক ও সাংঘাতিক ধরনের পাপ হয়ে যায়। এসব ক্ষেত্রের একটি হচ্ছে এই যে, এক ব্যক্তি তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে এবং পূর্ণ নির্ভরযোগ্য মনে করে, আর তুমি তার এ বিশ্বাস ও সুধারণা থেকে অবৈধ ফায়দা লুটে তার সাথে মিথ্যা বল এবং প্রতারণা কর।

মিথ্যা সাক্ষ্য

(٢٠٢) عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّوْرِ بِالْاِشْرَاكِ بِاللّٰهِ ثَلٰثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَرَأَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوْا قَوْلَ الزُّوْرِ حُنَفَاءَ لِلّٰهِ غَيْرَ مُشْرِكِيْنَ بِهِ ٭ (رواه ابوداؤد وابن ماجة)

২০২। খুরাইম ইবনে ফাতেক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ফজরের নামায পড়লেন। তিনি নামায শেষে সোজা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন ঃ মিথ্যা সাক্ষ্যকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করার সমান সাব্যস্ত করে দেওয়া

হয়েছে। কথাটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। তারপর তিনি কুরআন মজীদের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন, যার অর্থ এই ঃ "তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাক— কেবল এক আল্লাহ্র হয়ে এবং কাউকে তাঁর সাথে শরীক না করে।" —আবূ দাঊদ, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ একটু আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রত্যেক মিথ্যাই গুনাহ্; কিন্তু এর কোন কোন প্রকার ও কোন কোন ক্ষেত্র গুনাহ্র দিক দিয়ে খুবই গুরুতর। এগুলোর মধ্য থেকেই একটি ক্ষেত্র হচ্ছে কোন মামলা-মোকদ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া এবং এর দ্বারা আল্লাহ্র কোন বান্দার ক্ষতি সাধন করা। সূরা হজ্জের উল্লেখিত আয়াতে মিথ্যার এ প্রকারটিকেই শিরক ও প্রতিমাপূজার সাথে উল্লেখ করা হয়েছে এবং উভয়টি থেকে বেঁচে থাকার জোর নির্দেশ দেওয়ার জন্য একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআন মজীদের এ বর্ণনাভঙ্গীর বরাত দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এরশাদ করেছেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য তার জঘন্যতা ও আল্লাহ্র অসন্তুষ্টি ও অভিশাপ ডেকে আনার ক্ষেত্রে শিরকের সমতুল্য। কথাটি তিনি তিনবার বললেন এবং দাঁড়িয়ে এক বিশেষ তেজদৃপ্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন।

তিরমিযী শরীফের অন্য এক হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সাহাবায়ে কেরামকে বললেন এবং তিনবার বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না যে, সবচেয়ে বড় গুনাহ্ কোন্গুলো ? তারপর বললেন ঃ এগুলো হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া ও মিথ্যা বলা। বর্ণনাকারী বলেন যে, প্রথমে তিনি হেলান দেওয়া অবস্থায় ছিলেন; কিন্তু পরে সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং এ শেষ কথাটি বারবার উচ্চারণ করতে লাগলেন। শেষে আমরা বলতে লাগলাম, এবার যদি তিনি নীরব হয়ে যেতেন। অর্থাৎ, এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর একটি বিশেষ অবস্থা বিরাজ করছিল এবং তিনি এমন উত্তেজনার সাথে কথাটি বলছিলেন যে, আমরা অনুভব করছিলাম যে, তাঁর অন্তরে তখন একটি বিরাট বোঝা পড়ে আছে। তাই মন চাচ্ছিল যে, তিনি যদি এখন নীরব হয়ে যেতেন এবং নিজের অন্তরে এ বোঝা না চাপাতেন।

মিথ্যা শপথ

(٢٠٣) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ صَبْرٍ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ * (رواه البخارى ومسلم)

২০৩। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিচারকের সামনে মিথ্যা শপথ করল, যাতে সে এর দ্বারা কোন মুসলমানের সম্পদ মেরে দেয়, কেয়ামতের দিন সে আল্লাহ্র সাথে এ অবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তিনি তার উপর খুবই অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত থাকবেন। —বুখারী, মুসলিম

(٢٠٤) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

بِيَمِيْنِهٖ فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ اَرَاكٍ * (رواه مسلم)

২০৪। হযরত আবূ উমামা বাহেলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে কোন মুসলমানের হক মেরে দিল, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দিবেন এবং জান্নাত তার উপর হারাম করে দিবেন। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেটা যদি কোন সামান্য জিনিসও হয় ? (অর্থাৎ, কেউ যদি কারো সামান্য ও তুচ্ছ জিনিসও কসম খেয়ে মেরে দেয়, তাহলেও কি তার এ পরিণতি হবে ?) তিনি উত্তরে বললেন ঃ হ্যাঁ, সেটা যদি বনজ পিলু বৃক্ষের একটি ডালও হয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, অতি সামান্য ও তুচ্ছ মানের কোন জিনিসও যদি কেউ কসম খেয়ে নিজের ভাগে নিয়ে নেয়, তাহলেও সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

(٢٠٥) عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْتَطِعُ اَحَدٌ مَالًا بِيَمِيْنٍ اِلَّا لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ اَجْذَمُ * (رواه ابوداؤد)

২০৫। আশআছ ইবনে কায়েস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম খেয়ে কারো সম্পদ মেরে দেয়, সে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাত করবে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ তিনটি হাদীসেই ঐ ব্যক্তির পরিণাম বর্ণনা করা হয়েছে, যে কোন মামলা ও বিচারে মিথ্যা কসম খেয়ে অন্য পক্ষের সম্পদ মেরে দেয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বর্ণিত প্রথম হাদীসটিতে বলা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন যখন তাকে আল্লাহ্র দরবারে হাজির করা হবে, তখন তার উপর আল্লাহ্র প্রচণ্ড ক্রোধ থাকবে। আবূ উমামা বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীসে বলা হয়েছে যে, এমন ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম এবং জাহান্নামই তার আবাস হিসাবে অবধারিত। আর আশআছ ইবনে কায়েস বর্ণিত এ হাদীসটিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন ব্যক্তি কেয়ামতের দিন কুষ্ঠাক্রান্ত হয়ে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হবে। আল্লাহ্র আশ্রয় চাই! কী ভীষণ এ শাস্তিত্রয়। আর এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। তাই এ ব্যক্তি যদি এ বিরাট পাপ থেকে তওবা করে পবিত্র হয়ে দুনিয়া থেকে না যায়, তাহলে এ হাদীসসমূহের চাহিদা এটাই যে, তার সামনে এসব শাস্তি আসবেই এবং এর সবগুলোই তাকে ভোগ করতে হবে।

বাস্তব সত্য এই যে, কোন বিচারকের আদালতে আল্লাহ্র নামে শপথ করে এবং আল্লাহ্কে নিজের সাক্ষী বানিয়ে মিথ্যা বলা এবং কোন বান্দার সম্পদ মেরে খাওয়ার জন্য অথবা তাকে বেইজ্জতি করার জন্য আল্লাহ্র পবিত্র নাম ব্যবহার করা আসলেই এমন বিরাট গুনাহ্ যে, এর শাস্তি যত কঠিনই দেওয়া হোক, যথার্থ সেটাই।

(٢٠٦) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلَا يَنْظُرُ

اِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ قَالَ اَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنْفِقُ سِلْعَةً بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ * (رواه مسلم)

২০৬। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের মানুষ এমন যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দয়াদৃষ্টি দেবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবূ যর আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরা তো খুবই ব্যর্থ ও চরম ক্ষতিগ্রস্ত! এরা কারা ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ যারা গোড়ালীর নীচে ঝুলিয়ে লুঙ্গি পরিধান করে, (যেমন অহংকারী ও উদ্ধত লোকেরা করে থাকে।) উপকার করে যারা খোঁটা দেয় এবং মিথ্যা কসম খেয়ে যারা নিজেদের পণ্য চালিয়ে দেয়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ যেভাবে বিচারকের সামনে আদালতে কোন মামলায় মিথ্যা কসম খাওয়া আল্লাহ্ তা'আলার পবিত্র নামের চরম অপব্যবহার, তেমনিভাবে নিজের পণ্য বিক্রির জন্য গ্রাহকের সামনে মিথ্যা কসম খেয়ে নিজের বিশ্বস্ততা প্রমাণ করাও আল্লাহ্র নামের চরম অপব্যবহার এবং নিতান্তই হীন কর্ম। এ জন্য এটাও মিথ্যার জঘন্য প্রকারের অন্তর্ভুক্ত এবং কেয়ামতের দিন এ ধরনের মানুষকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে। আর এ মিথ্যাবাদী ব্যবসায়ী তার এ অপকর্মের দরুন আখেরাতে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলা, তাঁর দয়াদৃষ্টি লাভ এবং পাপমুক্তি থেকে বঞ্চিত থাকবে।

মিথ্যার কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রকার

মিথ্যার কয়েকটি জঘন্য প্রকারের উল্লেখ তো উপরে করা হয়েছে। কিন্তু কোন কোন মিথ্যা এমনও হয়ে থাকে, যেগুলোকে অনেক মানুষ মিথ্যাই মনে করে না, অথচ এগুলোও মিথ্যারই অন্তর্ভুক্ত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো থেকেও বেঁচে থাকার জোর নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নের হাদীসগুলোতে মিথ্যার এ প্রকারের কিছুটা আলোচনা রয়েছে ঃ

(٢٠٧) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ دَعَتْنِيْ اُمِّيْ يَوْمًا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِيْ بَيْتِنَا فَقَالَتْ هَاتَعَالِ اُعْطِيْكَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَرَدْتِّ اَنْ تُعْطِيَهُ ؟ قَالَتْ اَرَدْتُّ اَنْ اُعْطِيَهُ تَمْرًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا اَنَّكِ لَوْ لَمْ تُعْطِهِ شَيْئًا كُتِبَتْ عَلَيْكِ كَذْبَةٌ * (رواه ابوداؤد والبيهقى فى شعب الايمان)

২০৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমাদের বাড়ীতে বসা ছিলেন, তখন আমার মা আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, এদিকে আস, আমি তোমাকে একটি জিনিস দেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি তাকে কি জিনিস দেওয়ার ইচ্ছা করেছ ? মা বললেন, আমি তাকে একটি খেজুর দেওয়ার ইচ্ছা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন ঃ মনে রেখো! একথা বলার পর তুমি যদি তাকে কিছু না দিতে, তাহলে তোমার আমলনামায় একটি মিথ্যা লিখে দেওয়া হত। —আবূ দাঊদ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্যও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া যাবে না। কেননা, মুসলমানের জিহ্বা মিথ্যার দ্বারা কলুষিত হওয়াই চাই না। তাছাড়া এর একটি বিরাট রহস্য এই যে, পিতা-মাতা যদি সন্তানদের সাথে মিথ্যা বলে— যদিও এর উদ্দেশ্য কেবল মনোরঞ্জনই হোক, তবুও সন্তানরা তাদের কাছ থেকে মিথ্যা বলা শিখবে এবং মিথ্যা বলাকে তারা দোষের কিছু মনে করবে না।

(٢٠٨) عَنْ بَهْزِبْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْلٌ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ * (رواه احمد والترمذى وابوداؤد والدارمى)

২০৮। বাহ্য ইবনে হাকীম স্বীয় পিতার মাধ্যমে আপন দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে হাসানোর জন্য কথা বলার সময় মিথ্যা বলে, তার উপর আক্ষেপ! তার উপর বড়ই আক্ষেপ! —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, আবূ দাঊদ, দারেমী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, শুধু মজলিসকে আনন্দ দান করার জন্য এবং হাসাহাসি করার জন্য মিথ্যা বলাও দোষের কথা ও খারাপ অভ্যাস। এতে যদিও কারো কোন ক্ষতি হয় না; কিন্তু প্রথমতঃ এর দ্বারা কথকের মুখ মিথ্যা দ্বারা কলুষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ মিথ্যার প্রতি ঈমানদার মানুষের অন্তরে যে ঘৃণা থাকা চাই, তা কমে যায়। আর তৃতীয় ক্ষতি এই যে, মানুষের মধ্যে মিথ্যা বলার সাহস বেড়ে যায় এবং এর দ্বারা মিথ্যার প্রচলনে সহায়তা হয়।

(٢٠٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ * (رواه مسلم)

২০৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের জন্য এতটুকু মিথ্যাই যথেষ্ট যে, সে যাই শুনে তাই বলে বেড়ায়। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, প্রত্যেক শোনা কথাই যাচাই বাছাই ছাড়া বলে বেড়ানোও এক পর্যায়ের মিথ্যা। যেভাবে জেনে বুঝে মিথ্যা বলায় অভ্যস্ত ব্যক্তি বিশ্বাসযোগ্য থাকে না, তেমনিভাবে এ ব্যক্তিও নির্ভরযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। যাহোক, মু'মিন ব্যক্তির উচিত, সে যেন এসব সূক্ষ্ম ধরনের মিথ্যা থেকেও নিজের রসনার হেফাযত করে।

প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার কয়েকটি সূক্ষ্ম প্রকার

যেভাবে মিথ্যার কোন কোন প্রকার এমন রয়েছে যে, মানুষ এগুলোকে মিথ্যাই মনে করে না, তেমনিভাবে খেয়ানতেরও এমন কিছু ধরন রয়েছে যেগুলোকে অনেক মানুষ খেয়ানত বলে গণ্য করে না। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো সম্পর্কেও উম্মতকে স্পষ্টভাবে সতর্ক করেছেন। নিম্নে এ ধরনের কিছু হাদীস পাঠ করুন ঃ

(٢١٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِاَبِى الْهَيْثَمِ بْنِ التَّيْهَانِ اِنَّ الْمُسْتَشَارَ مُؤْتَمَنٌ * (رواه الترمذى)

২১০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আবুল হাইসামকে বলেছিলেন ঃ যার কাছে কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়, তার কাছে যেন আমানত রাখা হয়। (তাই তাকে বিশ্বস্ততার পরিচয় দিতে হবে।) —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ আবুল হাইসাম ইবনে তাইহান কোন এক ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পরামর্শ চেয়েছিলেন, সে সময় তিনি এ কথাটি বলেছিলেন। কথাটির অর্থ এই যে, যার কাছে কোন বিষয়ে পরামর্শ চাওয়া হয়, তার উচিত সে যেন একথা ভাবে যে, পরামর্শ গ্রহণকারী তাকে নির্ভরযোগ্য মনে করেই পরামর্শের জন্য তার কাছে এসেছে এবং নিজের একটি আমানত তার কাছে সমর্পণ করেছে। অতএব তার উচিত, সে যেন এ আমানতের হক আদায়ে ত্রুটি না করে। অর্থাৎ, সে যেন ভালভাবে চিন্তা-ভাবনা করে তাকে পরামর্শ দেয় এবং বিষয়টির গোপনীয়তা রক্ষা করে। যদি এমনটি না করে, তাহলে সে এক ধরনের খেয়ানতের জন্য অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

(٢١١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ الْحَدِيْثَ ثُمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ اَمَانَةٌ * (رواه الترمذى وابوداؤد)

২১১। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার কোন কথা কারো কাছে বলে, তারপর সে এদিক ওদিক তাকায় তখন এটা আমানত হয়ে যায়। —তিরমিযী, আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম হচ্ছে ঃ যদি কোন ব্যক্তি আপনার কাছে কোন কথা বলে এবং সে মৌখিকভাবে একথা নাও বলে যে, এটা অন্য কারো কাছে বলবেন না; কিন্তু তার কোন ভাব-ভঙ্গিতে যদি আপনি বুঝেন যে, সে এটা চায় না যে, কথাটি সাধারণের গোচরে আসুক, তাহলে তার এ কথাটি আমানত স্বরূপ থাকবে এবং আপনাকে আমানতের মতই এর হেফাযত করতে হবে। যদি এমন না করেন; বরং অন্যের কানে পৌঁছিয়ে দেন, তাহলে এটা আপনার পক্ষ থেকে আমানতে খেয়ানত হবে এবং এর জন্য আল্লাহ্‌র সামনে জবাবদিহি করতে হবে।

তবে অন্য এক হাদীসে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, যদি কারো অন্যায় হত্যা বা তার মানহানি অথবা তার কোন আর্থিক ক্ষতির আশংকার কথা আপনি জানতে পারেন, তাহলে এটা কখনো গোপন রাখা যাবে না; বরং সংশ্লিষ্ট লোকদেরকে এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে। ঐ হাদীসটিও এখানে পড়ে নিন।

(٢١٢) عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَجَالِسُ بِالْاَمَانَةِ اِلَّا ثَلٰثَةَ مَجَالِسَ سَفْكُ دَمٍ حَرَامٍ اَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ اَوْ اِقْتِطَاعُ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ * (رواه ابوداؤد)

২১২। হযরত জাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মজলিসসমূহ আমানতদারীর সাথে হওয়া চাই। (অর্থাৎ, কোন মজলিসে গোপনীয়তার সাথে যে পরামর্শ অথবা সিদ্ধান্ত হয়, মজলিসে উপস্থিত লোকজন যেন এটাকে আমানত মনে করে গোপন রাখে।) কিন্তু তিনটি মজলিসের বিধান এর ব্যতিক্রম। (১) যে মজলিসের সম্পর্ক কারো অন্যায় হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে থাকে। (২) যে মজলিসে কারো

সম্ভ্রমহানির পরামর্শ করা হয়। (৩) যে মজলিসের সম্পর্ক অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ কেড়ে নেওয়ার সাথে থাকে। —আবূ দাঊদ

ব্যাখ্যা ঃ এ তিনটি বিষয়কে কেবল উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যথায় উদ্দেশ্য এই যে, যদি কোন মজলিসে কোন গুনাহ্ ও অন্যায় কাজের ষড়যন্ত্র ও পরামর্শ হয়, আর তোমাকেও সেখানে শরীক রাখা হয়, তাহলে কখনো এটা গোপন রাখবে না; বরং এ অবস্থায় তোমার দ্বীনদারী ও আমানতদারীর দাবী এটাই হবে যে, গুনাহ্ ও অপকর্মের এ পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে দেওয়ার জন্য বিষয়টি যাদের গোচরে আনা তুমি জরুরী মনে কর, তাদেরকে অবশ্যই অবহিত করে দেবে। যদি এমনটি না কর, তাহলে আল্লাহ্র সাথেও খেয়ানত হবে এবং আল্লাহ্র বান্দাদের সাথেও।

বিবাদ ও ফেতনা দূর করার জন্য নিজের থেকে কিছু বলে দেওয়া মিথ্যার মধ্যে শামিল নয়

(٢١٣) عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُوْلُ خَيْرًا وَيَنْمِىْ خَيْرًا *(رواه البخارى ومسلم)

২১৩। উম্মে কুলসূম বিনতে উক্‌বা ইবনে আবী মুআইত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী নয়, যে মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি কায়েম করতে গিয়ে (এক পক্ষের তরফ থেকে অন্য পক্ষের কাছে) ভাল কিছু বলে এবং সদ্ভাব সৃষ্টি হয় এমন কথা আদান-প্রদান করে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ কখনো এমন হয় যে, দু'ব্যক্তি অথবা দু'পক্ষের মধ্যে ভীষণ বিবাদ ও ক্ষোভ। প্রত্যেক পক্ষই অপর পক্ষকে নিজের শত্রু মনে করে এবং এর ফলে বিরাট বিরাট ফেতনা সৃষ্টি হয়। কখনো কখনো তো খুন-খারাবী এবং হত্যা, লুণ্ঠন ও সম্ভ্রমহানির ঘটনাও ঘটে যায় এবং শত্রুতার উত্তেজনায় উভয় পক্ষ থেকেই জুলুম ও অন্যায় বাড়াবাড়িকে নিজের অধিকার মনে করা হয়। এ পরিস্থিতিতে যদি কোন কল্যাণকামী ও নিঃস্বার্থ বান্দা এ বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টির প্রয়াসী হয় এবং সে এ প্রয়োজন অনুভব করে যে, এক পক্ষের তরফ থেকে অন্য পক্ষের নিকট এমন হিতকামনামূলক কিছু কথাবার্তা পৌছানো দরকার, যার দ্বারা বিবাদ ও শত্রুতার আগুন নিভে যায় এবং সমঝোতা ও সুধারণার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, তাহলে সে এক পক্ষের তরফ থেকে অন্য পক্ষের কাছে এ ধরনের কথা নিজে বানিয়ে বললেও এটা ঐ মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত হবে না, যা অন্যায় ও কবীরা গুনাহ্।

এটাই হচ্ছে এ হাদীসের উদ্দেশ্য এবং এটাই হচ্ছে শেখ সা'দী শীরাযী (রহঃ)-এর এ কথার তাৎপর্য ঃ "বিভ্রান্তির সত্যের চেয়ে কল্যাণকর অসত্যও ভাল।"

ওয়াদা পূরণ ও ওয়াদা ভঙ্গ করা

প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদা করে তা পূরণ করা আসলে সত্যবাদিতারই একটি ব্যবহারিক রূপ, আর ওয়াদা ভঙ্গ করা মিথ্যার একটি বাস্তব প্রতিফলন। এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নৈতিক শিক্ষায় ওয়াদাভঙ্গ থেকে বেঁচে থাকার এবং সর্বদা ওয়াদা পূরণ করার ব্যাপারেও কঠোর তাকীদ দিয়েছেন।

মাত্র কয়েক পৃষ্ঠা পূর্বে ঐ হাদীস অতিক্রান্ত হয়েছে, যেখানে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকটি উত্তম চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলোর সঠিক অনুসরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, আমি তার জন্য জান্নাতের দায়িত্ব নিচ্ছি।" এগুলোর মধ্যে তিনি ওয়াদা পূরণের বিষয়টিও উল্লেখ করেছিলেন।

কিতাবুল ঈমানে বায়হাকীর বরাতে হযরত আনাস (রাঃ)-এর ঐ হাদীস উল্লিখিত হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পালন করে না, দ্বীনের মধ্যে তার কোন অংশ নেই।

এখানে এ ধারার আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করা হচ্ছে ঃ

(٢١٤) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلٰثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ * (رواه البخارى ومسلم)

২১৪। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফেকের তিনটি নিদর্শন রয়েছে ঃ (১) যখন কথা বলে, তখন মিথ্যা বলে। (২) যখন ওয়াদা করে, তা ভঙ্গ করে। (৩) যখন তার কাছে আমানত সমর্পণ করা হয়, তখন খেয়ানত করে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ প্রায় এ বিষয়েরই কাছাকাছি একটি হাদীস হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বরাতে কিতাবুল ঈমানে উল্লিখিত হয়েছে এবং সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করে বলা হয়েছে যে, এগুলো মুনাফেকের নিদর্শন হওয়ার অর্থ কি। সেখানকার আলোচনার সারসংক্ষেপ এই যে, মিথ্যা, খেয়ানত ও ওয়াদা ভঙ্গ করা আসলে মুনাফেকের চরিত্র। যার মধ্যে এ মন্দ স্বভাবগুলো থাকবে, সে আকীদা-বিশ্বাসের দিক দিয়ে মুনাফেক না হলেও কর্ম ও চরিত্রে মুনাফেক গণ্য হবে।

মুসলিম শরীফের বর্ণনায় এ হাদীসেই এ বাক্যগুলো অতিরিক্ত রয়েছে ঃ "সে ব্যক্তি যদি নামাযও পড়ে, রোযাও রাখে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবীও করে, তবুও এ মন্দ স্বভাবগুলোর কারণে সে এক প্রকারের মুনাফেক। যাহোক, এ হাদীসে ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর নিদর্শন ও মুনাফেকসুলভ স্বভাব বলা হয়েছে।

(٢١٥) عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْعِدَةُ دَيْنٌ * (رواه الطبرانى فى الاوسط)

২১৫। হযরত আলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ওয়াদাও এক ধরনের ঋণ। (তাই এটা শোধ করতে হবে।) —তাবরানী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, কাউকে যদি কোন কিছু দেওয়ার বা তার প্রতি অনুগ্রহ করার অথবা এ প্রকার কোন ওয়াদা করা হয়ে থাকে, তাহলে ওয়াদাকারীকে ভাবতে হবে যে, এটা আমার উপর ঋণ বিশেষ। তাই আমাকে তা শোধ করতে হবে।

তবে যদি কোন অন্যায় কাজে সহযোগিতা বা শরীঅতবিরোধী কোন কাজের অথবা এমন কাজের ওয়াদা করা হয়, যাতে অন্য কারো হক বিনষ্ট হয়, তাহলে এসব ক্ষেত্রে ওয়াদা পূরণ

করা জরুরী হবে না; বরং এর বিপরীত করাই জরুরী হবে। এ ওয়াদা ভঙ্গ করায় কোন গুনাহ্ হবে না; বরং শরীঅতের অনুসরণের কারণে সওয়াব হবে।

(٢١٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِى الْحَمْسَاءِ قَالَ بَايَعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ اَنْ يُّبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ اَنْ اٰتِيَهُ بِهَا فِىْ مَكَانِهِ فَنَسِيْتُ فَذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَاِذَا هُوَ فِىْ مَكَانِهِ فَقَالَ لَقَدْ شَقَقْتَ عَلَىَّ اَنَا هٰهُنَا مُنْذُ ثَلٰثٍ اَنْتَظِرُكَ * (رواه ابوداؤد)

২১৬। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আবুল হামসা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়তপ্রাপ্তির আগে আমি একবার তাঁর সাথে বেচা-কেনার একটি কারবার করেছিলাম। (তারপর আমার যা কিছু দেয়ার ছিল, এর একটা অংশ তো তখনই পরিশোধ করে দিয়েছিলাম।) আর কিছু পরিশোধ করা বাকী ছিল। আমি কথা দিয়েছিলাম যে, তিনি যেখানে আছেন সেখানেই তা নিয়ে আসছি। কিন্তু আমি এ ওয়াদার কথা ভুলে গেলাম। তিন দিন পর আমার স্মরণ হল। (আমি তৎক্ষণাৎ তা নিয়ে এসে দেখি,) তিনি সেখানেই আছেন। তিনি (তখন কেবল এতটুকু) বললেন ঃ তুমি আমাকে বড় সমস্যায় ফেলে দিলে, আমি এখানে তিন দিন যাবত তোমার অপেক্ষায় আছি। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ নবুওয়ত লাভের পূর্বেও রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিশ্রুতি রক্ষায় এতটুকু যত্নবান ছিলেন যে, তিন দিন পর্যন্ত এক জায়গায় অবস্থান করে এক ব্যক্তির অপেক্ষা করছিলেন।

এখানে বলে রাখা ভাল যে, ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে এ পর্যায়ের কষ্ট ভোগ করা শরীঅতের দৃষ্টিতে সবসময় অপরিহার্য নয়। (যেমন, পরবর্তী হাদীস দ্বারা বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানা যাবে।) কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে "মহত্তম চরিত্র" দান করে রেখেছিলেন, এ ছিল তারই ফল।

(٢١٧) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ وَعَدَ رَجُلًا فَلَمْ يَأْتِ اَحَدُهُمَا اِلَى وَقْتِ الصَّلٰوةِ وَذَهَبَ الَّذِىْ جَاءَ لِيُصَلِّىْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ * (رواه رزين)

২১৭। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কারো সাথে (কোন স্থানে এসে সাক্ষাত করার) ওয়াদা করল, তারপর (পরবর্তী) নামাযের সময় পর্যন্ত তাদের একজন আসল না। (আর অপরজন নির্দিষ্ট সময়ে ঐ স্থানে পৌঁছে অপেক্ষা করতে থাকল এবং নামাযের সময় হয়ে গেল।) তখন উপস্থিত লোকটি নামায পড়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থান থেকে চলে গেল। এমতাবস্থায় তার উপর কোন গুনাহ্ বর্তাবে না। —রযীন

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যখন এ ব্যক্তি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল এবং নির্দিষ্ট কিছু সময় অন্য জনের অপেক্ষাও করল, তখন সে নিজের দায়িত্ব পালন করে নিল। এখন যদি নামাযের সময় এসে যাওয়ার কারণে অথবা অন্য কোন প্রয়োজনে সে এখান

থেকে চলে যায়, তাহলে তার উপর ওয়াদা ভঙ্গের অভিযোগ আসবে না এবং সে গুনাহ্গার হবে না।

(২১৮) عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ اَخَاهُ وَمِنْ نِيَّتِهِ اَنْ يَّفِيَ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيْعَادِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ * (رواه ابوداؤد والترمذى)

২১৮। হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার কোন ভাইকে কোন স্থানে আসার প্রতিশ্রুতি দিল এবং তার নিয়্যত এটাই ছিল যে, সে প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে, কিন্তু (বাস্তব কোন কারণে) সে নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে আসতে পারল না, এতে তার উপর কোন গুনাহ্ বর্তাবে না। —আবূ দাঊদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, যদি কোন ব্যক্তি কোন ওয়াদা করে এবং তার নিয়্যত এটা পূরণ করারই থাকে, কিন্তু কোন কারণে নিজের ওয়াদা পূরণ করতে না পারে, তাহলে আল্লাহ্র নিকট সে গুনাহ্গার সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু নিয়্যতই যদি এ থাকে যে, সে ওয়াদা পূরণ করবে না; তাহলে এটা এক ধরনের প্রতারণা হবে এবং এ জন্য সে নিঃসন্দেহে গুনাহ্গার হবে।

বিনয়-নম্রতা ও গর্ব-অহংকার

বিনয় ও নম্রতা ঐসব সদগুণের অন্যতম, কুরআন ও হাদীসে যেগুলোর প্রতি সবিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে এবং এসবের প্রতি খুবই উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এর কারণ এই যে, মানুষ হচ্ছে বান্দা। আর বান্দার সৌন্দর্য ও কৃতিত্ব এটাই যে, তার প্রতিটি কর্মে দাসত্ব ও বিনয় ফুটে উঠবে। বস্তুতঃ বিনয় ও নম্রতা দাসত্বেরই পরিচায়ক। পক্ষান্তরে অহংকার ও গর্ব হচ্ছে বড়ত্ব ও প্রভুত্বের দাবী। এ জন্যই এটা বান্দাসুলভ আচরণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই শোভনীয়।

(২১৯) عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ اَوْحٰى اِلَىَّ اَنْ تَوَاضَعُوْا حَتّٰى لَا يَبْغِىْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ وَلَا يَفْخَرْ اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ * (رواه ابوداؤد)

২১৯। আয়ায ইবনে হিমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করেছেন যে, বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন কর, যার ফল এই হওয়া চাই যে, কেউ কারো উপর অবিচার করবে না এবং কেউ কারো উপর অহংকার করবে না। —আবূ দাঊদ

(২২০) عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَا اَيُّهَا النَّاسُ تَوَاضَعُوْا فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ وَفِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِىْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَفِىْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

২২০। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদিন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে বললেন, লোকসকল! তোমরা বিনয় অবলম্বন কর। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য (অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র হুকুম মনে করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে) বিনয় অবলম্বন করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মর্যাদা বুলন্দ করে দেন। যার ফলে, সে নিজের দৃষ্টিতে তো ছোট থাকে; কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে হয় মহান। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অহংকারী হয়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে হেয় করে দেন। যার ফলে, সে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যায়— যদিও নিজের ধারণায় সে অনেক বড়। এমনকি মানুষের চোখে সে কুকুর কিংবা শূকরের চেয়েও ঘৃণিত ও হীন হয়ে যায়। —বায়হাকী

(٢٢١) عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَبَرَّهُ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلَّ عُتُلٍّ جَوَاظٍ مُسْتَكْبِرٍ * (رواه البخارى ومسلم)

২২১। হযরত হারেসা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না যে, বেহেশতী মানুষ কারা ? প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, যে (ব্যবহার ও আচরণে গর্বিত ও কঠোর নয়; বরং) অক্ষম ও দুর্বলদের মত আচরণ করে এবং এ জন্য মানুষ তাকে দুর্বল ভাবে। (আর আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্ক এ পর্যায়ের যে,) সে যদি আল্লাহ্‌র উপর কোন কসম খেয়ে বসে, তাহলে তিনি তা পূরণ করে দেখান। আমি কি তোমাদেরকে বলে দেব না যে, জাহান্নামী কারা ? প্রত্যেক কঠোর-স্বভাব, দুশ্চরিত্র ও অহংকারী ব্যক্তি। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে গিয়ে "দুর্বল" শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু এর অর্থ ঐ দুর্বলতা নয়, যা শক্তি ও সাহসের বিপরীতে বলা হয়ে থাকে। কেননা, ঐ দুর্বলতা কোন প্রশংসনীয় গুণ নয়; বরং এক হাদীসে তো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে ঃ "শক্তিমান মুসলমান আল্লাহ্‌র নিকট দুর্বল মুসলমানের চেয়ে অনেক উত্তম ও প্রিয়।" তাই এখানে দুর্বল দ্বারা ঐ ভদ্র, বিনয়ী ও কোমল স্বভাব মানুষ উদ্দেশ্য, যে লেনদেন ও আচার আচরণে শক্তিহীন ও দুর্বলদের মত অন্যের সামনে দমে যায় এবং এ কারণে মানুষ তাকে দুর্বল মনে করে এবং দাবিয়ে রাখে। (অনুবাদের মধ্যেও এ অর্থটি বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।) এ জন্যই এ হাদীসে দুর্বলের বিপরীতে কঠোর-স্বভাব, দুশ্চরিত্র ও অহংকারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। (শক্তিশালী ও সক্ষম নয়।) যাহোক, হাদীসের সারকথা এই যে, বিনয় ও নম্রতা জান্নাতবাসীদের বৈশিষ্ট্য, আর অহংকার ও ঔদ্ধত্য জাহান্নামীদের চরিত্র।

এ হাদীসে জান্নাতী মানুষের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা যদি আল্লাহ্ তা'আলার উপর কোন কসম খেয়ে বসে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের কসম পূর্ণ করে দেন। বাহ্যতঃ এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দিকে ইশারা করেছেন যে, যখন কোন বান্দা আল্লাহ্‌র জন্য নিজের আত্মগর্বকে মিটিয়ে দিয়ে তাঁর বান্দাদের সাথে বিনয় ও নম্রতার ভূমিকা পালন করে, তখন সে আল্লাহ্‌র দরবারে এত নৈকট্যশীল হয়ে যায় যে, সে যদি কসম খেয়ে ফেলে, এ ব্যাপারটি এমনই হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা তার এ

কসমের মর্যাদা রক্ষা করেন এবং তার কথা বাস্তবায়ন করে দেখান। অথবা অর্থ এই যে, তারা যদি কোন বিশেষ ব্যাপারে আল্লাহ্কে কসম দিয়ে কোন বিশেষ দো'আ করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তার দো'আ অবশ্যই কবূল করেন।

(২২২) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ * (رواه البخارى ومسلم)

২২২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) সূত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ মহত্ত্ব ও বড়ত্ব প্রকৃতপক্ষে ঐ মহান সত্তার হক, যার হাতে রয়েছে সবার জীবন-মৃত্যু এবং সম্মান ও অসম্মান। যে সত্তার কোন ক্ষয় নেই, লয় নেই। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ তাঁর জন্যই রয়েছে বড়ত্ব ও গৌরব আসমান ও যমীনে। আর তিনিই পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়। (সূরা জাছিয়া ঃ আয়াত-৩৭)

অতএব, এখন যে বিভ্রান্ত মানুষটি গৌরব ও বড়ত্বের দাবীদার হয়ে যায় এবং আল্লাহ্র বান্দাদের সাথে অহংকার ও প্রভুসুলভ আচরণ করে, সে যেন নিজের স্বরূপ ভুলে গিয়ে আল্লাহ্র সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। এ জন্য সে বড়ই অপরাধী এবং তার অপরাধ খুবই মারাত্মক। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে ঘোষণা করেছেন যে, এ ফেরআউনী স্বভাবের কারণে সে জান্নাতে যেতে পারবে না।

এ মৌলিক কথাটি আগেই সবিস্তার উল্লেখ করা হয়েছে যে, যেসব হাদীসে কোন খারাপ কর্ম অথবা মন্দ স্বভাবের পরিণতি এই বলা হয় যে, এতে লিপ্ত ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে না, এগুলোর মর্ম সাধারণত এই হয়ে থাকে যে, এ খারাপ কর্ম অথবা মন্দ স্বভাব তার নিজস্ব প্রভাবের দিক দিয়ে মানুষকে জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে দিতে পারে এবং জাহান্নামে নিয়ে যেতে পারে। অথবা এ অর্থ হয় যে, এগুলোতে লিপ্ত মানুষ খাঁটি ঈমানদারদের সাথে এবং তাদের মত সহজে জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করে নিতে হবে। এ জন্য এ হাদীসটির মর্মও ঐ মূলনীতির আলোকে এটাই বুঝতে হবে যে, অহংকার ও গৌরব তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসাবে জান্নাত থেকে বঞ্চিতকারী এবং জাহান্নামে নিক্ষেপকারী একটি স্বভাব। অথবা অর্থ এই যে, অহংকারী ও আত্মগৌরবে লিপ্ত ব্যক্তি সরাসরি জান্নাতে যেতে পারবে না; বরং জাহান্নামে তাকে এ অহংকারের শাস্তি ভোগ করে নিতে হবে। জাহান্নামের আগুনে যখন তার অহংকার জ্বালিয়ে দেওয়া হবে এবং অহংকারের ময়লা থেকে তাকে পাক-পবিত্র করে নেওয়া হবে, তখন সে যদি ঈমানদার হয়, তাহলে জান্নাতে যেতে পারবে।

(২২৩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلٰثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ — وَفِيْ رِوَايَةٍ وَلاَ يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ — وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ * (رواه مسلم)

২২৩। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ধরনের মানুষ রয়েছে, যাদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা কেয়ামতের দিন কথা বলবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তাদের প্রতি তিনি দৃষ্টিও দেবেন না। আর কেয়ামতের দিন তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১) বৃদ্ধ ব্যভিচারী, (২) মিথ্যাবাদী শাসক, (৩) অহংকারী দরিদ্র। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অনেক গুনাহ্ নিজস্ব বিবেচনায়ই মারাত্মক ও কবীরা গুনাহ্ হয়ে থাকে। কিন্তু কোন কোন অবস্থায় এবং বিশেষ ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে যদি এটা প্রকাশ পায়, তাহলে খুবই মারাত্মক ও চরম আকার ধারণ করে। যেমন, চুরি নিজস্ব বিবেচনায়ই বড় পাপ; কিন্তু চোর যদি ধনী হয় যার চুরি করার কোন প্রয়োজন নেই অথবা সরকারী কর্মকর্তা, সৈনিক বা নিরাপত্তা প্রহরী হয়, তাহলে তার চুরি করা আরো মারাত্মক অপরাধ হবে এবং তাকে ক্ষমার যোগ্য মনে করা হবে না।

এ হাদীসে এ ধরনেরই তিন অপরাধীর বেলায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ হতভাগাদের সাথে কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। আর আখেরাতে এ অপরাধীরা দয়াময় প্রভুর কৃপাদৃষ্টি থেকেও সম্পূর্ণ বঞ্চিত থাকবে। এরা হচ্ছে বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যাবাদী শাসক ও নিঃস্ব অহংকারী। এটা এ জন্য যে, যৌবনকালে যদি কোন ব্যক্তি শয়তানের প্ররোচনায় ব্যভিচারে লিপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এটা মারাত্মক কবীরা গুনাহ্ হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃত তওবার দ্বারা সে ক্ষমাযোগ্যও হতে পারে। কেননা, যৌবনে কামভাবের কাছে পরাজিত হয়ে যাওয়া তথা দুর্ভাগ্য বশত প্রকৃতিগত দুর্বলতার শিকার হওয়ার একটা বোধগম্য কারণ থাকে। কিন্তু কোন বৃদ্ধ যদি বৃদ্ধাবস্থায় এ কাজ করে, তাহলে এটা তার চরিত্রের চরম নষ্টামির পরিচায়ক। অনুরূপভাবে যদি কোন সাধারণ মানুষ নিজের কাজ উদ্ধারের জন্য মিথ্যা কথা বলে ফেলে, তাহলে তার এ গুনাহ্ও কবীরা হওয়া সত্ত্বেও ক্ষমাযোগ্য হতে পারে। কিন্তু কোন ক্ষমতাসীন শাসক যদি মিথ্যা বলে, তাহলে এটা তার চরিত্রের চরম অধঃপতন ও তার মধ্যে আল্লাহ্র ভয় না থাকার প্রমাণ সাব্যস্ত হবে। ঠিক তদ্রূপ যদি কোন সম্পদশালী ব্যক্তি অহংকার করে, তাহলে মানুষের সাধারণ স্বভাবের বিবেচনায় এটা খুব আশ্চর্যের বিষয় নয়। কারণ, অর্থের গৌরবে মানুষ এমনটি করতেও পারে। কিন্তু ঘরে খাবার নেই, এ অবস্থা সত্ত্বেও যদি কেউ অহংকার প্রদর্শন করে বেড়ায়, তাহলে নিঃসন্দেহে এটা তার চরম হীনতা ও নীচতা বলেই গণ্য হবে। মোটকথা, এ তিন ধরনের অপরাধীরাই কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কথা বলার সৌভাগ্য, তাঁর কৃপাদৃষ্টি লাভ ও পবিত্রকরণ থেকে বঞ্চিত থাকবে। পবিত্র না করার অর্থ বাহ্যতঃ এই যে, তাদের গুনাহ্ মাফ করা হবে না এবং কেবল আকীদা-বিশ্বাস ও অন্যান্য নেক আমলের ভিত্তিতে তাদেরকে পুণ্যবান মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে না; বরং শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতেই হবে। সর্বোপরি, সব বিষয়ে আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

শরম ও লজ্জাশীলতা

শরম ও লজ্জা এমন একটি স্বভাবজাত ও মৌলিক সদগুণ, মানুষের চরিত্র গঠনে যার বিরাট দখল ও প্রভাব রয়েছে। এটাই ঐ গুণ ও চরিত্র যা মানুষকে অনেক মন্দ কাজ থেকে ও মন্দ কথা থেকে ফিরিয়ে রাখে। এটা মানুষকে অশ্লীলতা ও অন্যায় থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং ভাল ও ভদ্রোচিত কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এক কথায় শরম ও লজ্জা মানুষের অনেক

সৌন্দর্যের মূল এবং অশ্লীলতা ও অপকর্ম থেকে রক্ষাকারী। এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের শিক্ষা ও দীক্ষা কার্যক্রমে এর উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। নিম্নে এ প্রসঙ্গের কয়েকটি হাদীস পাঠ করুন এবং নিজের মধ্যে এ গুণ সৃষ্টি ও তা আরো উন্নীত করতে সচেষ্ট হোন।

(٢٢٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِكُلِّ دِيْنٍ خُلُقًا وَخُلُقُ الْاِسْلَامِ الْحَيَاءُ * (رواه مالك مرسلا ورواه ابن ماجة والبيهقى فى شعب الايمان عن انس وابن عباس)

২২৪। যায়েদ ইবনে তালহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ধর্মের একটা বিশেষ গুণ থাকে। আর দ্বীন ইসলামের বিশেষ গুণ হচ্ছে লজ্জাশীলতা। —মোয়াত্তা মালেক, ইবনে মাজাহ্, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, প্রত্যেক ধর্ম ও শরীঅতে মানুষের চরিত্রের কোন একটি বিশেষ দিকের উপর তুলনামূলকভাবে অধিক জোর দেওয়া হয়ে থাকে এবং মানব জীবনে সেটাকেই ফুটিয়ে তোলার এবং প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। যেমন, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের শিক্ষা ও তাঁর আনীত শরীঅতে নম্র-চিত্ততা ও ক্ষমার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। (এমনকি ঈসা [আঃ]-এর শিক্ষা ও দর্শনের যে কোন পাঠক স্পষ্টতঃই অনুভব করবে যে, নম্রচিত্ততা এবং ক্ষমাই যেন তাঁর শরীঅতের মূল বিষয় ও প্রাণ।) অনুরূপভাবে ইসলাম তথা হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীঅতে লজ্জাশীলতার উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে।

এখানে এ বিষয়টিও জেনে নিতে হবে যে, কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় লজ্জাশীলতার মর্ম খুবই ব্যাপক। আমাদের পরিভাষায় তো লজ্জার দাবী এতটুকুই মনে করা হয় যে, মানুষ অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাকবে অর্থাৎ, লজ্জাজনক কথাবার্তা এবং লজ্জাজনক কর্ম পরিহার করে চলবে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসে এ শব্দটির ব্যবহার ও প্রয়োগের উপর চিন্তা-ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, লজ্জা মানব চরিত্রের ঐ বিশেষ অবস্থার নাম, যার বর্তমানে একজন মানুষ কোন অশোভনীয় কাজ ও বিষয়ে লিপ্ত হতে সংকোচবোধ করে এবং এর দ্বারা তার কষ্ট হয়। কুরআন-হাদীস দ্বারাই এটাও জানা যায় যে, লজ্জার সম্পর্ক কেবল মানব সমাজের সাথেই নয়; বরং লজ্জার সবচেয়ে বেশী হকদার হচ্ছেন ঐ মহান খালেক ও মালেক, যিনি মানুষকে অস্তিত্ব দান করেছেন এবং যার প্রতিপালন-প্রক্রিয়া থেকে মানুষ প্রতি মুহূর্ত অংশ পেয়ে চলেছে। আর যার দৃষ্টি থেকে তার কোন কাজ ও অবস্থা গোপন নয়।

বিষয়টি এভাবেও বুঝে নেওয়া যায় যে, লজ্জাশীল মানুষের সবচেয়ে বেশী লজ্জা হয়ে থাকে নিজের পিতা মাতা, নিজের উপকারকারী ও বড়দের প্রতি। আর একথা স্পষ্ট যে, আল্লাহ্ তা'আলা সব বড়দের চাইতে বড় এবং সকল উপকারকারীর বড় উপকারকারী। তাই একজন বান্দার সবচেয়ে বেশী লজ্জা তাঁর প্রতিই হওয়া উচিত। আর এ লজ্জার দাবী এই হবে যে, যে কাজ ও যে বিষয়ই আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি ও তাঁর বিধানের খেলাফ হবে, মানুষের মন নিজে নিজেই এ বিষয়ে সংকোচ ও মর্মপীড়া অনুভব করবে এবং সে এ থেকে বিরত থাকবে। কোন

বান্দার মনের অবস্থা যখন এমন হয়ে যাবে, তখন তার জীবন কত পবিত্র ও তার চরিত্র কেমন সুন্দর আর আল্লাহ্র মর্জি অনুযায়ী হয়ে যাবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

(٢٢٥) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلٰى رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ وَهُوَ يَعِظُ اَخَاهُ فِى الْحَيَاءِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ فَاِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْاِيْمَانِ * (رواه البخارى ومسلم)

২২৫। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার জনৈক আনুসারী ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন তার ভাইকে লজ্জার ব্যাপারে কিছু উপদেশ দিচ্ছিল এবং ভর্ৎসনা করছিল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ একে নিজের অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। কেননা, লজ্জা তো ঈমানের অঙ্গ। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, আনসারদের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা শরম ও লজ্জার গুণ বিশেষভাবে দান করেছিলেন। যার ফলে সে নিজের কায়-কারবারে খুব নরম ছিল, কঠোরতার সাথে মানুষের কাছে নিজের অধিকারের দাবীও করতে পারত না। অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এ লজ্জার কারণে মুখ খুলে কথাও বলতে পারত না— যেমন সাধারণভাবে লজ্জাশীল মানুষের অবস্থা হয়ে থাকে। অপর দিকে তার এক ভাই ছিল, যে তার এ অবস্থা ও রীতিনীতি পছন্দ করত না। একদিন এ ভাই তার ঐ লজ্জাশীল ভাইকে এ বিষয়ের উপর ভর্ৎসনা করছিল যে, তুমি এত লজ্জা কেন কর ? এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ দুই ভাইয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাদের কথাবার্তা শুনে তিরস্কারকারী ভাইকে বললেন ঃ তোমার এ ভাইকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দাও। তার এ অবস্থাটি তো খুবই কল্যাণময়। শরম ও লজ্জা তো ঈমানের একটি শাখা অথবা ঈমানের ফল। এর কারণে যদি দুনিয়ার স্বার্থ কিছুটা ক্ষুণ্নও হয়ে যায়, আখেরাতে তো এর মর্যাদা অনেক।

(٢٢٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ * (رواه احمد والترمذى)

২২৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জা ঈমানের একটি শাখা (অথবা ঈমানের ফল।) আর ঈমানের স্থান হচ্ছে জান্নাত। পক্ষান্তরে নির্লজ্জতা দুশ্চরিত্রতার অন্তর্ভুক্ত। আর দুশ্চরিত্রতা জাহান্নামে নিয়ে যায়। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে এবং এর পূর্ববর্তী হাদীসেও যে বলা হয়েছে, "লজ্জা ঈমানের অঙ্গ" বাহ্যতঃ এর মর্ম এই যে, লজ্জা ও শরম ঈমান বৃক্ষের বিশেষ শাখা অথবা এর ফল। বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় (যা কিতাবুল ঈমানে এসেছে,) বলা হয়েছে, লজ্জা ঈমানেরই একটি শাখা। যাহোক, লজ্জা ও ঈমানের মধ্যে একটা বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে, আর এগুলো সবই এর বিভিন্ন শিরোনাম। এর আরেকটি শিরোনাম এটিও, যা পরের হাদীসটিতে আসছে।

(٢٢٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْحَيَاءَ وَالْاِيْمَانَ قُرَنَاءُ جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الْاٰخَرُ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

২২৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জা ও ঈমান সর্বদা একত্রে একসাথে থাকে। যখন এর একটিকে উঠিয়ে নেওয়া হয়, তখন দ্বিতীয়টিকেও উঠিয়ে নেওয়া হয়। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ কথাটির মর্ম এই যে, ঈমান এবং লজ্জার মধ্যে এমন গভীর সম্পর্ক যে, কোন ব্যক্তি অথবা কোন সম্প্রদায় থেকে যদি এ দু'টির একটি উঠিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে দ্বিতীয়টিও বিদায় নিয়ে যায়। মোটকথা, কোন ব্যক্তি অথবা কোন জনগোষ্ঠীর মধ্যে লজ্জা ও ঈমান হয়তো উভয়টিই থাকবে, অথবা দু'টির একটিও থাকবে না।

(٢٢٨) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ لَا يَاتِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ * (رواه البخارى ومسلم)

২২৮। হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লজ্জা কেবল কল্যাণকেই ডেকে আনে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ অনেক সময় স্থূল দৃষ্টিতে এ সন্দেহ হয় যে, লজ্জার কারণে মানুষের কখনো কখনো ক্ষতিও হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে এ সন্দেহটিরই অপনোদন করেছেন। হাদীসটির মর্ম এই যে, শরম ও লজ্জার ফলে কখনো কোন ক্ষতি হয় না; বরং সর্বদা লাভই হয়ে থাকে। এমনকি যেসব ক্ষেত্রে একজন সাধারণ মানুষের স্থূলদৃষ্টিতে ক্ষতির বিভ্রম হয়, সেখানেও যদি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করা যায়, তাহলে ক্ষতির স্থলে লাভই লাভ দেখা যাবে।

এখানে কোন কোন মানুষের মনে আরো একটি সংশয় সৃষ্টি হয় যে, শরম ও লজ্জার আধিক্য কখনো কখনো দ্বীনী কর্তব্য পালনে বাধা হয়ে যায়। যেমন, যে ব্যক্তির মধ্যে শরম ও লজ্জার মাত্রা বেশী থাকে, সে সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা দানের দায়িত্ব পালনে, আল্লাহ্র বান্দাদেরকে উপদেশ দানে এবং অপরাধীদের শাস্তি বিধানেও দুর্বল হয়ে থাকে। কিন্তু এ সংশয়টি আসলে একটি ভুল বোঝাবুঝির কারণে সৃষ্টি হয়। কেননা, মানুষের প্রকৃতির যে অবস্থাটি এ ধরনের কাজ আঞ্জাম দিতে প্রতিবন্ধক হয়, এটা প্রকৃতপক্ষে লজ্জা নয়; বরং এটা মানুষের একটা সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত দুর্বলতা। অনেক মানুষ অজ্ঞতার কারণে এর মধ্যে এবং লজ্জার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না।

(٢٢٩) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِمَّا اَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الْاُوْلٰى اِذَا لَمْ تَسْتَحْىِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ * (رواه البخارى)

২২৯। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পূর্ববর্তী নবুওয়তের বাণীসমূহের মধ্যে মানুষ যা পেয়েছে, এর

মধ্যে একটি বাণী এই ঃ যখন তুমি লজ্জা বিসর্জন দিয়ে দাও, তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পার। —বুখারী

ব্যাখ্যা ঃ পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের সম্পূর্ণ শিক্ষা যদিও সংরক্ষিত নয়; কিন্তু তাদের কিছু সত্য ও বাস্তব উক্তি প্রবাদ বাক্যের মত সাধারণ্যে এমন গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত হয়ে গিয়েছে যে, হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরও সেগুলো সংরক্ষিত ও মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হয়ে আছে। এগুলোর মধ্য থেকে একটি শিক্ষা এটিও, যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ পর্যন্ত প্রবাদ বাক্যের মত মানুষের মুখে উচ্চারিত ছিল। উক্তিটি হচ্ছে ঃ যখন লজ্জা বিসর্জন দিয়ে দাও, তখন যা ইচ্ছা তাই করতে পার। ফারসী ভাষায়ও প্রবাদটি এভাবে চালু আছে ঃ নির্লজ্জ হয়ে যাও, যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে সত্যায়ন করেছেন যে, এ উপদেশমূলক উক্তিটি পূর্ববর্তী নবুওয়তের শিক্ষারই অংশ।

(٢٣٠) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَحْيُوْا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ قُلْنَا اِنَّا نَسْتَحْيِيْ مِنَ اللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ قَالَ لَيْسَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ الْاِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ اَنْ تَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعٰى وَالْبَطْنَ وَمَا حَوٰى وَتَذْكُرَ الْمَوْتَ وَالْبِلٰى وَمَنْ اَرَادَ الْاٰخِرَةَ تَرَكَ زِيْنَةَ الدُّنْيَا وَاٰثَرَ الْاٰخِرَةَ عَلَى الْاُوْلٰى فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيٰى مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَاءِ * (رواه الترمذى)

২৩০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলাকে এভাবে লজ্জা কর, যেভাবে লজ্জা করা উচিত। আমরা নিবেদন করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র শোকর যে, আমরা আল্লাহ্‌কে লজ্জা করে থাকি। তিনি বললেন, এটা নয়। (অর্থাৎ, লজ্জার অর্থ এত সীমাবদ্ধ নয়, যতটুকু তোমরা মনে করছ।) বরং আল্লাহ্‌কে যথার্থ লজ্জা করার অর্থ হচ্ছে এই যে, তুমি তোমার মস্তিষ্ক এবং মস্তিষ্কে যেসব চিন্তার উদয় হয়, এর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। তোমার পেট এবং পেটের ভিতর যা প্রবেশ করে, এর প্রতি খেয়াল রাখবে। (অর্থাৎ, কুচিন্তা থেকে মন-মস্তিষ্ককে এবং হারাম ও নাজায়েয খাদ্য থেকে পেটকে হেফাযত করবে।) মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর কবরে যে অবস্থা হবে সেটা স্মরণ করবে। আর যে ব্যক্তি আখেরাত কামনা করে, সে দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য পরিত্যাগ করে আখেরাতকেই দুনিয়ার উপর প্রাধান্য দেবে। অতএব, যে ব্যক্তি এগুলো করে নিল, সে-ই আল্লাহ্‌কে যথার্থ লজ্জা করল। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ প্রসঙ্গের প্রথম হাদীসটির ব্যাখ্যায় লজ্জার অর্থের ব্যাপকতার দিকে যে ইঙ্গিত করা হয়েছিল, তিরমিযী শরীফের এ হাদীস দ্বারা কেবল এর সমর্থনই পাওয়া যায় না; বরং অধিকন্তু এর স্পষ্ট ব্যাখ্যাও পাওয়া যায়। তাছাড়া হাদীসের শেষ অংশটি দ্বারা একটি মৌলিক কথা এও জানা গেল যে, আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে লজ্জা করার দাবী সে বান্দারাই করতে পারে, যাদের দৃষ্টিতে এ জগত এবং এর ভোগ-বিলাসের কোন মূল্য নেই এবং যারা দুনিয়াকে

পশ্চাতে রেখে আখেরাতকে নিজেদের লক্ষ্যস্থল বানিয়ে নিয়েছে। যারা মৃত্যু এবং মৃত্যুপরবর্তী অবস্থানসমূহের কথা সর্বদা স্মরণ রাখে। আর যার মধ্যে এ অবস্থা সৃষ্টি হবে না, সে যত কথাই বলুক, এ হাদীসের দৃষ্টিতে এটাই সাব্যস্ত হবে যে, সে আল্লাহ্কে লজ্জা করার যথার্থ হক আদায় করে নাই।

অল্পেতুষ্টি ও লোভ-লালসা

যেসব সদগুণের দ্বারা মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার প্রিয়পাত্র এবং এ দুনিয়াতেও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হয় এবং অন্তরের অস্থিরতা ও মনের জ্বালা থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, এগুলোর মধ্যে একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে অল্পেতুষ্টি। অল্পেতুষ্টির মর্ম এই যে, মানুষ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে যা পাবে, তার উপরই সন্তুষ্ট ও খুশী থাকবে এবং বেশী পাওয়ার লোভ করবে না। আল্লাহ্ তা'আলা যে বান্দাকে অল্পেতুষ্টির এ সম্পদ দান করেন, তাকে মনে করতে হবে যে, নিঃসন্দেহে আমাকে বিরাট সম্পদ ও নেয়ামত দান করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি বাণী নিম্নে পাঠ করুন ঃ

(٢٣١) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا اٰتَاهُ * (رواه مسلم)

২৩১। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ বান্দা সফলকাম, প্রকৃত অর্থেই যে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক বা জীবনোপকরণও তাকে প্রদান করা হয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এ পরিমিত রিযিকের উপর তুষ্টও করে দিয়েছেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ যে বান্দার ভাগ্যে ঈমানের মহাসম্পদ জুটে যায় এবং এর সাথে সে এ দুনিয়ার জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণও পেয়ে যায়, তারপর আল্লাহ্ তা'আলা তাকে অল্পেতুষ্টির গুণও দান করে দেন, তাহলে তার জীবন বড়ই ধন্য ও খুবই সুখের। এ অল্পেতুষ্টি ও মনের প্রশান্তি এমন পরশমণি, যার দ্বারা নিঃস্বের জীবন রাজা-বাদশাহদের জীবনের চাইতেও বেশী স্বাদপূর্ণ ও আনন্দময় হয়ে যায়। এ পরশমণি একজন মিসকীনকে ধনীর চেয়েও ধনী বানিয়ে দেয়।

মানুষের কাছে যদি সম্পদের পাহাড়ও থাকে, কিন্তু তার মধ্যে আরো বেশী পাওয়ার লোভ থাকে এবং সে এতে আরো বৃদ্ধি ঘটানোর চিন্তা ও চেষ্টায় লেগে থাকে, আর আরো চাই-আরো চাই, এর নেশায় পড়ে থাকে, তাহলে অন্তরের প্রশান্তি তার কখনো লাভ হবে না এবং সে অন্তরের দিক দিয়ে দীনতায়ই পড়ে থাকবে। পক্ষান্তরে কোন মানুষের কাছে যদি কেবল জীবন ধারণ করার মত সামান্য উপকরণ থাকে, কিন্তু সে এতেই পরিতৃপ্ত ও সন্তুষ্ট থাকে, তাহলে দারিদ্র্য ও অভাব সত্ত্বেও সে অন্তরের দিক দিয়ে ধনী থাকবে এবং তার জীবন বড়ই তৃপ্তি ও স্বস্তির জীবন হবে। এ সত্যটিই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য এক হাদীসে এ শব্দমালায় বর্ণনা করেছেন ঃ

(٢٣٢) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْغِنٰى عَنْ كَثْرَةِ الْعُرُوْضِ وَلٰكِنَّ الْغِنٰى غِنَى النَّفْسِ * (رواه البخارى)

২৩২। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সম্পদের প্রাচুর্যের দ্বারা ধনী হওয়া যায় না; বরং ধনী হওয়ার অর্থ হচ্ছে অন্তরের পরিতৃপ্তি তথা অমুখাপেক্ষিতা। —বুখারী

এ বাস্তব সত্যটি আরো স্পষ্টভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে এভাবে বুঝিয়েছিলেন ঃ

(٢٣٣) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ تَقُوْلُ كَثْرَةُ الْمَالِ الْغِنٰى قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ تَقُوْلُ قِلَّةُ الْمَالِ اَلْفَقْرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ، قَالَ ذٰلِكَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ الْغِنٰى فِى الْقَلْبِ وَالْفَقْرُ فِى الْقَلْبِ * (رواه الطبرانى فى الكبير)

২৩৩। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে আবূ যর! তুমি কি মনে কর যে, সম্পদ বেশী হওয়ার নামই ধনী হওয়া ? আমি উত্তর দিলাম, হ্যাঁ। (এমনই তো মনে করা হয়।) তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মনে কর যে, সম্পদ কম হওয়ার অর্থই দরিদ্রতা ? আমি উত্তরে বললাম, হ্যাঁ। (তাই তো মনে করা হয়।) কথাটি তিনি তিনবার জিজ্ঞাসা করলেন। তারপর বললেন ঃ প্রকৃত ঐশ্বর্য মনের মধ্যে থাকে, আর প্রকৃত দৈন্যও মনের মধ্যে থাকে। —তাবরানী

ব্যাখ্যা ঃ বাস্তব সত্য এটাই যে, ধনী হওয়া, গরীব হওয়া এবং সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার সম্পর্ক টাকা পয়সার চেয়ে মানুষের অন্তরের সাথে বেশী থাকে। অন্তর যদি ধনী ও অমুখাপেক্ষী থাকে, তাহলে মানুষ নিশ্চিন্ত ও সুখী। পক্ষান্তরে অন্তর যদি লোভ-লালসার শিকার হয়, তাহলে সম্পদের স্তূপের মধ্যে পড়ে থেকেও সে সুখ থেকে বঞ্চিত এবং অভাবগ্রস্ত। শেখ সা'দী (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে ঃ মানুষ ধনী হয় অন্তরের দ্বারা সম্পদের দ্বারা নয়। এ ক্ষেত্রে বাংলা ভাষার একটি কবিতাংশের উল্লেখ খুবই সমীচীন বোধ হবে। জনৈক কবি বলেন, "ধনের, গৌরব যার মিছে অহমিকা, মনের ঐশ্বর্য বিনে সবি তার ফাঁকা।" অনুবাদক

(٢٣٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ نَاسًا مِنَ الْاَنْصَارِ سَاَلُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَاَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى اِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهٗ قَالَ مَا يَكُوْنُ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهٗ عَنْكُمْ وَمَنْ يَّسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ اَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ * (رواه ابوداؤد)

২৩৪। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আনসারদের মধ্য থেকে কিছু লোক একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু চাইল। তিনি তাদেরকে দিলেন। (কিন্তু তাদের চাওয়া শেষ হল না।) তাই তারা আবার চাইল এবং তিনি আবারো দিলেন। পরিশেষে যখন তাঁর কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না, তখন তিনি তাদেরকে বললেন ঃ আমার কাছে যে অর্থ-সম্পদ আসবে, তা তোমাদেরকে না দিয়ে আমি সঞ্চিত রাখব

না; (বরং তোমাদেরকে দিতেই থাকব। কিন্তু এ কথাটি ভালভাবে বুঝে নাও যে, এভাবে সওয়াল করে করে অর্থ উপার্জন করলে সচ্ছলতা ও সুখের জীবন আসবে না; বরং আল্লাহ্ তা'আলার নিয়ম হচ্ছে এই যে,) যে ব্যক্তি নিজে সওয়ালবিমুখ হয়ে থাকতে চায়, (অর্থাৎ, কারো সামনে হাত পাতা থেকে বাঁচতে চায়,) আল্লাহ্ তা'আলা তার সাহায্য করেন এবং সওয়ালের অপমান থেকে তাকে রক্ষা করেন। আর যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বাঁচতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মানুষ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন কঠিন ক্ষেত্রে নিজের মনকে শক্ত করে ধৈর্যধারণ করতে চায়, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে ছবর ও ধৈর্যের তওফীক দান করেন। আর ধৈর্যের চেয়ে ব্যাপক ও বিশাল কোন নেয়ামত কাউকে দেওয়া হয় নাই। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসটির বিশেষ শিক্ষা ও আবেদন এই যে, কোন বান্দা যদি চায় যে, সে অন্যের মুখাপেক্ষী হবে না এবং কারো সামনে হাত পাতবে না এবং বিপদে সে টলবে না, তাহলে তার জন্য উচিত সে যেন নিজের সাধ্য অনুযায়ী এ ভাবেই চলতে চেষ্টা করে। সে যদি এমন করে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে পূর্ণরূপে সাহায্য করবেন এবং এসব কিছুই তার ভাগ্যে জুটবে।

হাদীসটির শেষ অংশে বলা হয়েছে, "কোন বান্দাকে ছবর ও ধৈর্যের চেয়ে ব্যাপক ও বিশাল কোন নেয়ামত দান করা হয় নাই।" বাস্তব সত্য এটাই যে, ছবর ও ধৈর্য অন্তরের যে অবস্থাটির নাম সেটি আল্লাহ্ তা'আলার বিশাল ও বিরাট নেয়ামত। এ জন্য কুরআন মজীদে "তোমরা ধৈর্য ও নামায দ্বারা আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা কর" এ বাণীতে ধৈর্যকে নামাযের পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

(٢٣٥) عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَاَعْطَانِىْ ثُمَّ قَالَ لِىْ يَا حَكِيْمُ اِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلْوٌ فَمَنْ اَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ وَمَنْ اَخَذَهُ بِاِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيْهِ وَكَانَ كَالَّذِىْ يَاْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا اَرْزَأُ اَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتّٰى اُفَارِقَ الدُّنْيَا *

(رواه البخارى ومسلم)

২৩৫। হযরত হাকীম ইবনে হেযাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আমি একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কিছু সম্পদ চাইলাম। তিনি আমাকে তা দিয়ে দিলেন। তারপর আবার চাইলাম। এবারও তিনি দিলেন। তারপর আমাকে বললেন, হে হাকীম! এ মাল-সম্পদ সবার কাছেই বড় আকর্ষণীয় এবং মিষ্ট বস্তু। অতএব, যে ব্যক্তি এটা লোভ-লালসা ছাড়া উদার চিত্তে গ্রহণ করবে, তাকে এতে বরকত প্রদান করা হবে। আর যে ব্যক্তি মনের লোভে এটা গ্রহণ করবে, তাকে এতে বরকত দেওয়া হবে না। তার অবস্থা ঐ ক্ষুধাকাতর রোগীর মত হবে, যে খুব খায়; কিন্তু পরিতৃপ্ত হয় না। আর উপরের হাত নীচের হাতের চেয়ে উত্তম। হাকীম ইবনে হেযাম বলেন ঃ (হুযূর [সাঃ]-এর এ উপদেশবাণী শুনে) আমি নিবেদন

করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐ মহান সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন, আমি আপনার পরে মৃত্যু পর্যন্ত আর কারো কাছ থেকে কোন কিছু গ্রহণ করব না। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসেরই বুখারীর বর্ণনায় একথাও রয়েছে যে, হাকীম ইবনে হেযাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সে প্রতিজ্ঞা তিনি এভাবে রক্ষা করেছিলেন যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) এবং ওমর ফারুক (রাঃ) নিজেদের খেলাফতকালে যখন সবাইকে ভাতা প্রদান করতেন, তখন তাকেও বার বার ভাতা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে রাজি হননি।

"ফতহুল বারী" গ্রন্থে হাফেয ইবনে হাজার "মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই"-এর বরাতে উল্লেখ করেছেন যে, প্রথম দুই খলীফার পর হযরত ওসমান ও হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফত ও শাসনকালেও তিনি কখনো কোন ভাতা অথবা অনুদান গ্রহণ করেননি। এভাবেই তিনি হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর শাসনকালে ১২০ বছর বয়সে ৫৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

(٢٣٦) عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَطَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ فَاِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ اَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْقَطِيْعَةِ فَقَطَعُوْا وَاَمَرَهُمْ بِالْفُجُوْرِ فَفَجَرُوْا * (رواه ابوداؤد)

২৩৬। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে 'আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ভাষণ দিলেন এবং এতে বললেন ঃ তোমরা লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী সম্প্রদায়সমূহ এ লোভের কারণেই ধ্বংস হয়েছে। এ লোভই তাদেরকে কৃপণতা করতে বলেছে। ফলে তারা কৃপণতা অবলম্বন করেছে। এটাই তাদেরকে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলেছে, আর তারা তাই করেছে। এ জিনিসই তাদেরকে পাপাচারে লিপ্ত হতে বলেছে, আর তারা পাপাচারে লিপ্ত হয়েছে। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ অর্থাৎ, লোভ-লালসা কেবল একটি মন্দ স্বভাবই নয়; বরং এর কারণে মানুষের জীবনে অন্যান্য ধ্বংসাত্মক বিপর্যয়ও সৃষ্টি হয়, যা শেষ পর্যন্ত সমাজ ও জাতিকে ডুবিয়ে ছাড়ে। এ জন্য মুসলমানদের উচিত, তারা যেন এ ভয়াবহ ও ধ্বংসকর মনোবৃত্তি থেকে নিজেদের অন্তরকে হেফাযত করে।

(٢٣٧) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ مَا فِىْ رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ * (رواه ابوداؤد)

২৩৭। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ বিষয় হচ্ছে অতি লোভ ও চরম ভীরুতা। —আবূ দাউদ

ব্যাখ্যা ঃ এটা এক বাস্তব সত্য যে, লোভী ও লালসাপ্রবণ মানুষ সবসময় এ চিন্তায় অস্থির ও উৎকণ্ঠিত থাকে যে, এটা পাই নাই, ওটা পাই নাই, অমুকের কাছে এটা আছে, আমার কাছে এটা নেই। অনুরূপভাবে অধিক ভীরু মানুষ অহেতুক ও কাল্পনিক আশংকায় সর্বদা বিচলিত থাকে এবং তার স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার ভাগ্য হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মানুষের অন্তরের এ দু'টি অবস্থাকে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। আর বাস্তবেও এগুলো সবচেয়ে মন্দ ও নিন্দনীয় স্বভাব।

ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা

এ দুনিয়ায় দুঃখ-কষ্টও আছে, আরাম এবং সুখও আছে। আনন্দও আছে, দুশ্চিন্তাও আছে। মিষ্টতাও আছে, তিক্ততাও আছে। ঠাণ্ডাও আছে, গরমও আছে। অনুকূল অবস্থাও আছে, প্রতিকূলতাও আছে। আর এসব কিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই এবং তাঁরই হুকুমে হয়ে থাকে। এ জন্য আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী বান্দাদের অবস্থা এই হওয়া চাই যে, যখন কোন দুঃখ-মুসীবত এসে যায়, তখন তারা যেন নৈরাশ্যের শিকার হয়ে ভেঙ্গে না পড়ে; বরং ঈমানী ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে তা যেন বরণ করে নেয় এবং অন্তরে এ বিশ্বাস তাজা করে নেয় যে, এসব কিছুই আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, যিনি আমাদের প্রজ্ঞাময় ও দয়াময় প্রভু এবং তিনিই আমাদেরকে এ দুঃখ ও বিপদ থেকে মুক্তি দানকারী।

অনুরূপভাবে যখন মানুষের অবস্থা অনুকূল ও যুৎসই থাকে, তাদের কামনা-বাসনা পূর্ণ হতে থাকে এবং সুখ ও আনন্দের সামগ্রী হাতে আসতে থাকে, তখনও যেন তারা এটাকে নিজেদের কৃতিত্ব এবং নিজেদের বাহুবলে অর্জিত ফসল মনে না করে; বরং এ সময় তারা যেন নিজেদের অন্তরে এ বিশ্বাস তাজা করে নেয় যে, এসব কিছুই কেবল আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অনুগ্রহ ও তাঁর দান। তিনি যখন ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর দেওয়া সব নেয়ামত ছিনিয়েও নিতে পারেন। এ জন্য প্রতিটি নেয়ামতের উপর তাঁর কৃতজ্ঞতা ও শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

এটা ইসলামের এক বিশেষ শিক্ষা এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্নভাবে এর প্রতি উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। এ শিক্ষার উপর আমল করার একটি ফল তো এই হয় যে, একজন বান্দা সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্ক ধরে রাখতে পারে। দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, সে বিপদে ও ব্যর্থতায় কখনো ভেঙ্গে পড়ে না, অব্যাহত দুঃখ ও শোকে সে মুষড়ে যায় না এবং নৈরাশ্য ও ভঙ্গুরতা তার কর্মক্ষমতাকে নিঃশেষ করতে পারে না। এ প্রসঙ্গের কয়েকটি হাদীস নিম্নে পাঠ করে নিন ঃ

(٢٣٨) عَنْ صُهَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلَّا لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ * (رواه مسلم)

২৩৮। হযরত সুহাইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন বান্দার ব্যাপারটি খুবই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি ব্যাপার ও প্রত্যেকটি অবস্থাই তার জন্য কল্যাণকর। আর এমনটি মু'মিন ছাড়া অন্য কারো জন্য হয় না। তার জীবনে

যদি সুখ ও আনন্দ আসে, তাহলে সে শুকরিয়া আদায় করে। আর এটা তার জন্য কল্যাণই কল্যাণ। তার জীবনে যদি কোন দুঃখ-কষ্ট আসে, তাহলে সে এতে ছবর ও ধৈর্য ধারণ করে। আর এটা তার জন্য মঙ্গলজনক হয়ে থাকে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ দুনিয়ার দুঃখ ও শান্তি তো সবার জীবনেই আসে; কিন্তু এ কষ্ট ও সুখের দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য অর্জন ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভ কেবল ঐসব ঈমানদারদের ভাগ্যে জুটে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে এমন ঈমানী সম্পর্ক স্থাপন করে নিয়েছে যে, তারা সুখ, শান্তি ও আনন্দের প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। আর যখন তারা কোন দুঃখ-কষ্টে পতিত হয় এবং কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়, তখন বান্দাসুলভ অবস্থা নিয়ে তারা ধৈর্য ধারণ করে। যেহেতু সুখ-দুঃখ এবং আনন্দ ও বিষাদ থেকে মানুষের জীবন কখনো মুক্ত থাকে না, এজন্য আল্লাহ্র এসব বান্দার অন্তরও ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে সর্বদা পূর্ণ থাকে।

(٢٣٩) عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ اِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى لَمْ اَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ * (رواه ابن ماجة)

২৩৯। হযরত আবূ উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ হে আদম-সন্তান! তুমি যদি প্রথম আঘাতের সময় ধৈর্য ধারণ কর এবং আমার সন্তুষ্টি ও পুণ্যের প্রত্যাশা রাখ, তাহলে আমি তোমার জন্য জান্নাত ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদানে সন্তুষ্ট হব না। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ মানুষের জীবনে যখন কোন আঘাত ও ব্যথা আসে, তখন এর প্রতিক্রিয়া শুরুতেই বেশী হয়ে থাকে। অন্যথায় কিছু দিন পার হয়ে গেলে তো এর প্রভাব আপনা আপনিই দূর হয়ে যায়। এ জন্য প্রকৃত ধৈর্য সেটাই, যা আঘাতের চোট লাগার সময়ই আল্লাহ্ তা'আলার কথা স্মরণ করে এবং তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশায় করা হয়ে থাকে। এ ধৈর্যেরই মর্যাদা রয়েছে এবং এরই উপর সওয়াবের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। পরবর্তীতে স্বাভাবিকভাবে যে ধৈর্য ও সবর এসে যায়, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এর বিশেষ কোন মূল্য নেই।

আবূ উমামা (রাঃ)-এর বর্ণিত এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ঘোষণা শুনিয়ে দিয়েছেন যে, যে ঈমানদার বান্দা কোন আঘাত পাওয়ার সময়ই আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও প্রতিদান লাভের আশায় ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তাকে জান্নাত দান করবেন এবং জান্নাত ছাড়া অথবা এর চেয়ে কম মর্যাদার কোন জিনিস এ ধৈর্যের প্রতিদান হিসাবে দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ্ই সন্তুষ্ট হবেন না। আল্লাহু আকবার! কত বড় অনুগ্রহের কথা! আল্লাহ্ স্বয়ং বান্দাকে সম্বোধন করে বলছেন যে, হে আদম-সন্তান! যখন আমার তকদীরের ফায়সালায় তোমার জীবনে কোন দুঃখ ও আঘাত আসে, তখন যদি তুমি আমার সন্তুষ্টি ও প্রতিদানের আশায় ধৈর্যের সাথে এটা বরণ করে নাও, তাহলে আমি তোমাকে জান্নাত না দিয়ে খুশী হব না। এ ধৈর্যের কারণে বান্দার সাথে আল্লাহ্র এমন বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়ে যাবে যে, তাকে জান্নাত না দিয়ে তিনি নিজেই খুশী হবেন না।

ফায়দা ঃ আল্লাহ্র কোন বান্দার উপর যখন কোন দুঃখ-যন্ত্রণা এসে যায়, তখন সে যদি এ হাদীসটি এবং আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতির কথাটি স্মরণ করে ধৈর্য অবলম্বন করে,

তাহলে এ ধৈর্যের মধ্যে সে ইন্‌শাআল্লাহ্ একটা বিশেষ স্বাদ ও মজা পেয়ে যাবে। আর আখেরাতে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে জান্নাত তো তাকে দেওয়াই হবে।

(٢٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ مَنْ اُصِيْبَ بِمُصِيْبَةٍ فِيْ مَالِهِ اَوْ فِيْ نَفْسِهِ فَكَتَمَهَا وَلَمْ يَشْكُهَا اِلَى النَّاسِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ * (رواه الطبرانى فى الاوسط)

২৪০। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি অর্থ-সম্পদের দিক দিয়ে কোন ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে গেল অথবা তার নিজের উপর কোন মুসীবত এসে গেল, আর সে তা গোপন রাখল এবং মানুষের নিকট এর কোন অভিযোগ করল না, আল্লাহ্ তা'আলা নিজ দায়িত্বে তাকে ক্ষমা করে দেবেন। —তাবরানী

ব্যাখ্যা ঃ সবর ও ধৈর্যের সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে এই যে, মানুষ তার বিপদ ও কষ্টের কথা কারো কাছে প্রকাশও করবে না। এ ধরনের ধৈর্যশীলদের জন্য এ হাদীসে ক্ষমার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'আলা নিজে তাদেরকে ক্ষমা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা এসব প্রতিশ্রুতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করার এবং এগুলো থেকে উপকৃত হওয়ার তওফীক দান করুন।

(٢٤١) عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِ اَنَّ ابْنًا لِيْ قُبِضَ فَأْتِنَا فَاَرْسَلَ يَقْرَءُ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَّرِجَالٌ فَرُفِعَ اِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِىُّ وَنَفْسُهُ يَتَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا هٰذَا فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللهُ فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ فَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ * (رواه البخارى ومسلم)

২৪১। হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কন্যা (হযরত যয়নব [রাঃ]) তাঁর কাছে সংবাদ পাঠালেন যে, আমার একটি ছেলে অন্তিম নিঃশ্বাস ফেলছে এবং তার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাই আপনি এক্ষুণি তশরীফ আনুন। তিনি এর উত্তরে সালাম ও এ বাণী পাঠালেন, আল্লাহ্ যা নিয়ে নেন এটাও তাঁর এবং তিনি যা দেন সেটাও তাঁর। এক কথায় প্রতিটি জিনিস সর্বাবস্থায় তাঁরই। (তাই তিনি যদি কাউকে কিছু দেন, তাহলে নিজের জিনিসই দেন, আর কারো নিকট থেকে যদি কিছু নিয়ে নেন, তাহলে নিজের জিনিসই ফেরত নেন।) আর প্রত্যেক জিনিসের জন্য তাঁর পক্ষ থেকে মেয়াদকাল নির্ধারিত রয়েছে। (ঐ সময় এসে গেলে দুনিয়া থেকে ঐ বস্তু উঠিয়ে নেওয়া হয়।) অতএব, তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর এবং প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখ। নবী-কন্যা আবার বার্তা পাঠালেন এবং কসম দিয়ে বললেন যে, এখন আপনাকে অবশ্যই আসতে হবে। এবার তিনি

উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁর সাথে সাহাবীদের মধ্য থেকে সা'দ ইবনে ওবাদা, মো'আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়েদ ইবনে ছাবেত প্রমুখও রওয়ানা হলেন। (সেখানে যাওয়ার পর) শিশু সন্তানটিকে তাঁর কোলে দেওয়া হল, তখন সে খুব কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছিল। তার এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। এ দেখে হযরত সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কী! তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটা হচ্ছে মায়া-মমতার প্রভাব, যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের অন্তরে রেখে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তাঁর ঐসব বান্দাকেই দয়া করবেন, যাদের মধ্যে দয়া-মায়ার অনুভূতি রয়েছে। (আর যাদের অন্তর পাষাণ এবং দয়ার অনুভূতিশূন্য, তারা আল্লাহ্র দয়া ও রহমতের অধিকারী হতে পারবে না।)

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের শেষ অংশটি দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন আঘাতে অন্তর আহত হওয়া এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া ধৈর্যের পরিপন্থী নয়। ধৈর্যের দাবী কেবল এতটুকু যে, বান্দা বিপদ এবং আঘাতকে আল্লাহ্র ইচ্ছা বিশ্বাস করে বান্দাসুলভ মানসিকতা নিয়ে একে বরণ করে নেবে, আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ এবং তাঁর প্রতি অভিযোগকারী হবে না; বরং আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমারেখার ভেতরে থাকবে। তারপর প্রকৃতিগতভাবে অন্তর আহত হওয়া এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া এটা তো অন্তরের কোমলতা এবং দয়ানুভূতির অনিবার্য ফল, যা আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তরে দিয়ে রেখেছেন। আর এটা আল্লাহ্ তা'আলার এক বিশেষ নেয়ামত। যে অন্তর এ নেয়ামত থেকে শূন্য, সে অন্তর আল্লাহ্র রহ্মত ও কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত।

হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে দেখে যে বিস্ময়ের সাথে প্রশ্ন করেছিলেন, এর কারণ এই ছিল যে, তিনি তখনও জানতেন না যে, অন্তর প্রভাবিত হওয়া এবং চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হওয়া ধৈর্যের পরিপন্থী নয়।

(٢٤٢) عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ مَاتَ لَهُ ابْنٌ فَكَتَبَ اِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّعْزِيَةَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى مُعَاذِبْنِ جَبَلٍ سَلَامٌ عَلَيْكَ فَاِنِّيْ اَحْمَدُ اِلَيْكَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعْظَمَ اللّٰهُ لَكَ الْاَجْرَ وَاَلْهَمَكَ الصَّبْرَ وَرَزَقَنَا وَاِيَّاكَ الشُّكْرَ فَاِنَّ اَنْفُسَنَا وَاَمْوَالَنَا وَاَهْلَنَا مِنْ مَوَاهِبِ اللّٰهِ الْهَنِيْئَةِ وَعَوَارِيْهِ الْمُسْتَوْدَعَةِ مَتَّعَكَ اللّٰهُ بِهٖ فِيْ غِبْطَةٍ وَسُرُوْرٍ وَقَبَضَهُ مِنْكَ بِاَجْرٍ كَبِيْرٍ اَلصَّلٰوةُ وَالرَّحْمَةُ وَالْهُدٰى اِنِ احْتَسَبْتَهُ فَاصْبِرْ وَلَا يُحْبِطُ جَزَعُكَ اَجْرَكَ فَتَنْدَمَ وَاعْلَمْ اَنَّ الْجَزَعَ لَا يَرُدُّ مَيْتًا وَّ لَا يَدْفَعُ حَزَنًا وَمَا هُوَ نَازِلٌ فَكَانَ قَدْ وَالسَّلَامُ * (رواه الطبرانى فى الكبير والاوسط)

২৪২। হযরত মো'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তাঁর এক পুত্র-সন্তান মারা গেলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাছে এ সমবেদনাপত্র লিখলেন ঃ

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পক্ষ থেকে মো'আয ইবনে জাবালের নামে। তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমার কাছে আল্লাহ্‌র প্রশংসাবাদ করছি, যিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই। তারপর এ কামনা করছি যে, আল্লাহ্ যেন তোমাকে বিরাট বিনিময় দান করেন, ধৈর্য ধারণের তওফীক দেন এবং আমাদেরকে এবং তোমাকে শুকরিয়া আদায় করার তওফীকও দান করেন। আমাদের জীবন, আমাদের সম্পদ এবং আমাদের পরিবার-পরিজন আল্লাহ্‌র সুখকর দান এবং তাঁর প্রদত্ত ক্ষণস্থায়ী আমানত বিশেষ। (তোমার পুত্রও একটি আমানত ছিল।) আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে তার দ্বারা খুশী এবং ঈর্ষণীয় সুখ দান করেছেন এবং এখন বিরাট পুণ্যের বিনিময়ে তাকে তোমার কাছ থেকে উঠিয়ে নিয়েছেন। তুমি যদি পুণ্যের প্রত্যাশায় ধৈর্য ধারণ কর, তাহলে তোমার জন্য থাকবে বিরাট পুরস্কার, অশেষ অনুগ্রহ এবং হেদায়াত। অতএব, তুমি ধৈর্য ধারণ কর। তোমার অস্থিরতা ও হা-হুতাশ যেন তোমার প্রতিদানকে বিনষ্ট করে না দেয়। এমন করলে তুমি শেষে অনুতপ্ত হবে। মনে রাখবে, অস্থিরতা ও হা-হুতাশ কোন মৃত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে আনতে পারে না এবং কোন শোককে দূর করতে পারে না। যা হবার তা হয়েই গিয়েছে। ওয়াস্‌সালাম। —তাবরানী

ব্যাখ্যা ঃ কুরআন মজীদে বিপদে ধৈর্য ধারণকারী বান্দাদেরকে তিনটি জিনিসের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ তাদের উপর থাকবে আল্লাহ্‌র অফুরন্ত অনুগ্রহ, তাদেরকে আল্লাহ্ রহমত দিয়ে ধন্য করবেন এবং তারা হেদায়াতপ্রাপ্ত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কুরআনী সুসংবাদের দিকে ইশারা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ তুমি যদি আখেরাতের প্রতিদান ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনায় এ বিপদে ধৈর্য অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তুমি অফুরন্ত অনুগ্রহ, রহমত এবং হেদায়াত লাভ করতে পারবে।

শিক্ষা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সমবেদনাপত্রে প্রত্যেক ঐ ঈমানদার বান্দার জন্য উপদেশ ও সান্ত্বনা রয়েছে, যার জীবনে কোন বিপদ ও আঘাত আসে। হায়! আমরা যদি নিজেদের বিপদের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ঈমানদীপ্ত সমবেদনা ও উপদেশ দ্বারা নিজেদের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে নিতাম এবং ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতাকে নিজেদের রীতি বানিয়ে নিতাম!

(٢٤٣) عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ سَمِعْتُ اَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَالَ يَا عِيْسٰى اِنِّيْ بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ اُمَّةً اِذَا اَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّوْنَ حَمِدُوا اللّٰهَ وَاِنْ اَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُوْنَ اِحْتَسَبُوْا وَصَبَرُوْا وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ فَقَالَ يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عَقْلَ قَالَ اُعْطِيْهِمْ مِنْ حِلْمِيْ وَعِلْمِيْ * (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

২৪৩। উম্মুদ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার স্বামী আবুদ দারদা বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ্ ঈসা (আঃ)কে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে ঈসা! আমি তোমার পরে এমন এক উম্মত পাঠাব, যাদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য হবে এই যে, যখন তারা তাদের চাহিদা অনুযায়ী সুখ ও নেয়ামত লাভ

করবে, তখন আল্লাহ্র প্রশংসা করবে, আর যখন কোন প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হবে, তখন তারা ধৈর্য সহকারে তা বরণ করে নেবে এবং সওয়াবের প্রত্যাশা করবে। অথচ তাদের মধ্যে (বিশেষ পর্যায়ের কোন) সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞান থাকবে না। ঈসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তাদের মধ্যে যখন সহিষ্ণুতা এবং জ্ঞান থাকবে না, তাহলে তাদের পক্ষে সুখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং বিপদে ধৈর্য ধারণ করা কি সম্ভব হবে? আল্লাহ্ তা'আলা উত্তর দিলেন ঃ আমি আমার সহিষ্ণুতা ও আমার জ্ঞান থেকে তাদেরকে কিছু অংশ দিয়ে দেব। —বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ বিপদে হতাশ হয়ে যাওয়া এবং একেবারে ভেঙ্গে পড়া আর আল্লাহ্র নেয়ামত লাভ ও সুখের সময় উন্মত্ত হয়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ এবং আল্লাহ্কেও ভুলে যাওয়া মানুষের একটি সহজাত দুর্বলতা। কুরআন মজীদে এ অবস্থাটিই এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ "মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে ভীরুরূপে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন হা-হুতাশ করতে থাকে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়।" তাই কোন উম্মত ও জনগোষ্ঠীর চরিত্র যদি এমন হয় যে, তারা বিপদে ধৈর্যশীল এবং কল্যাণপ্রাপ্তির সময় কৃতজ্ঞ, তাহলে এটা হবে তাদের উপর আল্লাহ্র এক বিশেষ অনুগ্রহ এবং তাদের বিরাট বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবা এবং পরবর্তী যুগের পুণ্যবান মু'মিনদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা যেসব আধ্যাত্মিক ও গুণাবলী দান করেছেন, এগুলোর মধ্যে একটি গুণ এও যে, তাদেরকে ধৈর্য এবং কৃতজ্ঞতার অমূল্য সম্পদ দ্বারা ভূষিত করা হয়েছে। আর তাদের এ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার মূল উৎস তাদের বিস্তর জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা নয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলা নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আপন প্রজ্ঞা ও স্থৈর্যের সামান্য ছিটেফোঁটা দান করে দিয়েছেন। এ ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা এরই ফল।

আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে এ উম্মতের অন্য আরো বহু বৈশিষ্ট্যের কথা পূর্ববর্তী নবীদের কাছে উল্লেখ করেছেন, তেমনিভাবে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার ক্ষেত্রে এ উম্মতের যে বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্ব থাকবে, সেটা হযরত ঈসা (আঃ)-এর কাছে ব্যক্ত করেছেন। ঈসা (আঃ) যাতে উপলব্ধি করতে পারেন যে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও চরিত্র গঠনের যে কাজ তিনি এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণ আনজাম দিয়েছেন, এর পরিপূর্ণতা তাঁর পরে আগমনকারী আল্লাহ্র শেষ নবীর দ্বারা হবে। এর ফলে এমন এক উম্মতের আবির্ভাব ঘটবে, যারা ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার চরম স্তরে উন্নীত এবং আল্লাহ্-প্রদত্ত জ্ঞান ও সহনশীলতার গুণে সমৃদ্ধ হবে।

আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরশীলতা ও ভাগ্যলিপিতে সন্তুষ্টি

নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যেসব বাস্তব সত্য আমরা জানতে পেরেছি, এগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য ও বাস্তবতা এও যে, এ অস্তিত্ব জগতে যা কিছু হয় এবং যে যা পায় ও পায় না, এ সব কিছুই সরাসরি আল্লাহ্র নির্দেশ ও তাঁর সিদ্ধান্তে হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ভূমিকা কেবল এতটুকুই যে, এগুলো হচ্ছে আমাদের কাছে ঐসব জিনিস পৌঁছার আল্লাহ্রই নির্ধারিত শুধু মাধ্যম ও পথ। যেমন, বাসা-বাড়ীতে যে পাইপ দিয়ে পানি আসে, এটা কেবল পানি সরবরাহের রাস্তা, পানি সরবরাহে এর নিজের কোন দখল ও ভূমিকা নেই। অনুরূপভাবে এ অস্তিত্ব জগতে কার্য পরিচালনা উপায়-উপকরণের হাতে নয়; বরং কর্ম পরিচালক ও ফলোৎপাদক কেবল মহান আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর নির্দেশ।

এ বাস্তবতার উপর অন্তরে বিশ্বাস স্থাপন করে নিজের সকল উদ্দেশ্য ও সকল কাজে কেবল আল্লাহ্র মহান সত্তার উপর আস্থা স্থাপন ও ভরসা করা, তাঁরই প্রতি ধ্যান রাখা, তাঁরই

অনুগ্রহের উপর দৃষ্টি রাখা, তাঁরই কাছে আশা পোষণ করা, তাঁকেই ভয় করা এবং তাঁরই কাছে দো'আ করা—এ কর্মপদ্ধতিরই নাম দ্বীনের পরিভাষায় "তাওয়াক্কুল" ও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা।

তাওয়াক্কুলের প্রকৃত স্বরূপ এটিই। বাহ্যিক উপায়-উপকরণ বর্জন করে দেওয়া তাওয়াক্কুলের জন্য জরুরী নয়। সকল নবী-রাসূলের বিশেষ করে সাইয়্যেদুল আম্বিয়া মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের, তাঁর সাহাবীদের এবং প্রত্যেক যুগের খোদাপ্রেমিক ওলীদের তাওয়াক্কুল এটাই ছিল। এসব পুণ্যবান ব্যক্তিরা এ অস্তিত্ব জগতের উপায়-উপকরণের ধারাকে আল্লাহ্ তা'আলার হুকুম ও নির্দেশের অধীনে এবং তাঁরই হেকমতের দাবী মনে করে সাধারণ অবস্থায় এগুলো ব্যবহার ও প্রয়োগ করতেন, কিন্তু অন্তরের আস্থা এবং ভরসা কেবল আল্লাহ্‌র হুকুমের উপরই থাকত। তাঁরা উপায়-উপকরণকে পানির পাইপ লাইনের মত কেবল একটি মাধ্যম ও রাস্তাই মনে করতেন। এ জন্য তাঁরা এসব আসবাব-উপকরণ ব্যবহারের সময়ও আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি ও তাঁর বিধানের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রাখতেন। তাছাড়া এ বিশ্বাসও রাখতেন যে, আল্লাহ্ তা'আলার কুদরত ও শক্তি এ আসবাব-উপকরণের অধীন নয়; বরং তিনি ইচ্ছা করলে এগুলো ছাড়াই সবকিছু করতে পারেন। আর তাঁরা কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'আলার এ কুদরত প্রত্যক্ষও করতেন এবং এর অভিজ্ঞতাও লাভ করতেন।

সারকথা, উপায় উপকরণ বর্জন করা তাওয়াক্কুলের হাকীকতের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং এর জন্য শর্তও নয়। হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র কোন বিশ্বাসী বান্দা যদি অন্তরের অবস্থার কাছে পরাভূত হয়ে উপায়-উপকরণ বর্জন করে দেয়, তাহলে এটা আপত্তিকর বিষয়ও নয়; বরং তাদের বেলায় এটা গুণ ও পরাকাষ্ঠাই হবে। অনুরূপভাবে আসবাব উপকরণ থেকে অন্তরের সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য এবং এগুলোর স্থলে আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস ও আস্থা সৃষ্টি করার জন্য অথবা অন্যদেরকে এটা প্রত্যক্ষ করানোর জন্য কেউ যদি আসবাব-উপকরণ বর্জনের নীতি গ্রহণ করে, তাহলে এটাও সম্পূর্ণ সঠিক হবে। কিন্তু তাওয়াক্কুলের প্রকৃত স্বরূপ কেবল তাই, যা উপরে বলা হয়েছে এবং কুরআন-হাদীসে এরই প্রতি উৎসাহ প্রদান ও এরই প্রতি আহ্বান করা হয়েছে, আর এরই ধারকদের প্রশংসা করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ তাওয়াক্কুল ঈমান ও তওহীদের পূর্ণতার অনিবার্য ফল। যার তাওয়াক্কুল নসীব হয়নি, নিঃসন্দেহে তার ঈমান ও তওহীদ পরিপূর্ণ নয়।

তারপর তওয়াক্কুলেরও উপরের স্তর হচ্ছে "রেজা বিল কাযা" বা ভাগ্যলিপির উপর সন্তুষ্টি। এর মর্ম এই যে, বান্দার উপর ভাল অথবা মন্দ যে কোন অবস্থাই আসুক, সে একথা বিশ্বাস করে তা অন্তর দিয়ে মেনে নেবে এবং এতে সন্তুষ্ট থাকবে যে, আমার মালিকই আমাকে এ অবস্থায় রেখেছেন। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিনগুলোর মত কষ্ট ও বিপদের মুহূর্তেও তার অন্তরের প্রতিধ্বনি এই হওয়া চাই ঃ "বন্ধুর পক্ষ থেকে যাই আসে সেটাই ভাল।"

এ ভূমিকামূলক কয়েকটি লাইনের পর এবার তাওয়াক্কুল ও ভাগ্যলিখনে সন্তুষ্টি প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হাদীস পাঠ করুন ঃ

(٢٤٤) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ اُمَّتِىْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ هُمُ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَرْقُوْنَ وَلَا يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ * (رواه البخارى ومسلم)

২৪৪। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার মানুষ বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। তারা হচ্ছে আল্লাহ্র ঐসব বান্দা, যারা মন্ত্র-তন্ত্র ব্যবহার করে না, অশুভ লক্ষণ বলে কিছু বিশ্বাস করে না এবং তারা কেবল নিজেদের প্রতিপালকের উপর ভরসা রাখে। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসের সঠিক মর্ম বুঝার জন্য প্রথমে একথা জেনে নেওয়া চাই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে যুগে প্রেরিত হয়েছিলেন, সে যুগে আরবের অধিবাসীদের মধ্যে অন্যান্য ছোট বড় সংশোধনযোগ্য মন্দ বিষয়সমূহ ছাড়া এ দু'টি মন্দ বিষয়ও ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল ঃ (১) যখন তারা নিজেরা অথবা তাদের সন্তানরা কোন রোগে আক্রান্ত অথবা দুঃখ-কষ্টে পতিত হত, তখন তারা ঐ যুগের মন্ত্র-সাধকদের দ্বারা মন্ত্র-তন্ত্র করাত এবং বিশ্বাস করত যে, এ মন্ত্র-তন্ত্র বিপদ ও দুঃখ তাড়াবার এক সহজ কৌশল। (আর এসব মন্ত্র-তন্ত্র সধারণতঃ জাহেলিয়্যত যুগেরই ছিল।) (২) তারা যখন এমন কোন কাজ করার ইচ্ছা করত, যাতে লাভ-লোকসান এবং হার-জিত উভয়টির সম্ভাবনা থাকত, তখন তারা শুভাশুভের ফাল বের করত। ফাল যদি অশুভ বের হয়ে আসত, তাহলে মনে করত যে, এ কাজ আমাদের জন্য ভাল হবে না। এ জন্য তারা আর এ কাজে অগ্রসর হত না। মোটকথা, এ ফাল বের করাকেও তারা ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার একটা সহজ পদ্ধতি মনে করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন স্থলে এতদুভয় বিষয়ের নিন্দাবাদ করেছেন এবং এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, রোগ দূর করার জন্য যেন মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ না করা হয় এবং অশুভ লক্ষণ ও এর প্রভাব গ্রহণের এ পদ্ধতিও যেন বর্জন করা হয়। মানুষ যেন এ বিশ্বাস রাখে যে, রোগ ও সুস্থতা এবং লাভ ও ক্ষতি সবকিছুই আল্লাহ্র ইচ্ছাধীন। তাই তাঁর উপর ভরসা রাখতে হবে এবং নিজের উদ্দেশ্যাবলী ও প্রয়োজন পূরণের জন্য শুধু ঐসব উপায় ও তদবীর কাজে লাগাতে হবে, যা আল্লাহ্র মর্জির পরিপন্থী না হয়। কেননা, প্রকৃত কার্যকারক ও ফলোৎপাদক এ আসবাব-উপকরণ নয়; বরং মহান আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর হুকুমই সবকিছুর নিয়ামক। অতএব, কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এমন উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা যা আল্লাহ্র নিকট অপছন্দনীয়— এটা খুবই নির্বুদ্ধিতার কথা। তাই এ হাদীসের মর্ম এটাই যে, বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী বান্দারা হবে তারাই, যারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে মন্ত্র-তন্ত্র ও শুভ-অশুভ ফাল গ্রহণের এ ভ্রান্ত পদ্ধতিগুলো পরিত্যাগ করেছে।

কেউ কেউ এ হাদীস দ্বারা এ অর্থ বুঝেছে যে, এসব লোক সব ধরনের আসবাব-উপকরণের ব্যবহার ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুলকারী হবে; কিন্তু এ ধারণা সঠিক নয়। কেননা, যদি এটাই উদ্দেশ্য হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবেই তা উল্লেখ করতেন। এ ক্ষেত্রে আসবাব-উপকরণের মধ্য থেকে কেবল এ দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করাতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, হাদীসের মর্ম এটাই যে, এসব বান্দা হবে তারাই, যারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন ও প্রয়োজন পূরণে আল্লাহ্র উপরই ভরসা করার কারণে এবং তাঁরই ইচ্ছা ও হুকুমকে আসল নিয়ামক বিশ্বাস করার কারণে ঐসব উপায় ও কৌশল ব্যবহার করে না, যা আল্লাহ্র নিকট অপছন্দনীয়। অতএব, এ হাদীসটি নিজেই একথার প্রমাণ যে, আল্লাহ্ তা'আলা যেসব আসবাব-উপকরণ যে সকল উদ্দেশ্যের জন্য নিজের হেকমত দ্বারা নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং শরীঅত যেগুলোর অনুমতি দিয়েছে, এগুলো বর্জন করা তাওয়াক্কুলের দাবী

নয়; বরং কেবল ঐসব উপায়-উপকরণ বর্জন করাই তাওয়াক্কুলের দাবী, যেগুলো আল্লাহ্‌র নিকট অপছন্দনীয় এবং শরীঅত যেগুলোকে ভ্রান্ত আখ্যা দিয়েছে। তবে তাওয়াক্কুলের জন্য এটা অবশ্যই জরুরী যে, মানুষ আসবাব-উপকরণকে কেবল একটা রাস্তা মনে করবে এবং আল্লাহ্‌র হেকমতের পর্দা বলে বিশ্বাস করবে। আর অন্তরের সম্পর্ক কেবল আল্লাহ্ তা'আলার সাথেই থাকবে।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্য থেকে যারা বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে, তাদের সংখ্যা সত্তর হাজার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংখ্যা শুধু তাদের, যারা এ মর্যাদার প্রথম স্তরে থাকবে। অন্যথায় অপর এক হাদীসে এ অতিরিক্ত বর্ণনাও এসেছে যে, তাদের প্রত্যেকের সাথে আরো সত্তর হাজার করে বিনা হিসাবে জান্নাতে দাখিল করা হবে। তাছাড়া একথা পূর্বেও কয়েক দফা বলা হয়েছে যে, আরবী ভাষা ও এর বাকরীতিতে সত্তর সংখ্যাটি শুধু আধিক্য ও প্রাচুর্য বুঝানোর জন্যও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এ হাদীসেও সম্ভবতঃ এটাই উদ্দেশ্য।

এ হাদীসটি কেবল একটি ভবিষ্যদ্বাণী ও আখেরাতে সংঘটিতব্য একটি ঘটনার সংবাদই শুধু নয়; বরং হাদীসটির আসল উদ্দেশ্য এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেসব উম্মতের কাছে এ হাদীস পৌঁছবে, তারা যেন নিজেদের জীবনকে তাওয়াক্কুলের জীবন বানিয়ে নেয়। যাতে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশকারী বান্দাদের তালিকায় তাদের নামও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

(٢٤٥) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهٖ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا * (رواه الترمذى وابن ماجة)

২৪৫। হযরত ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যদি আল্লাহ্‌র উপর এমন ভরসা কর, যেমন ভরসা করা উচিত, তাহলে তিনি তোমাদেরকে এভাবে রিযিক দান করবেন, যেভাবে পক্ষীকুলকে রিযিক দিয়ে থাকেন। এরা সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরাপেটে ফিরে আসে। —তিরমিযী, ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, আদম-সন্তানরা যদি জীবিকার বেলায় আল্লাহ্‌র উপর এমন ভরসা করে, যেরূপ ভরসা তাদের করা উচিত, তাহলে তাদের সাথে আল্লাহ্‌র আচরণ এই হবে যে, তিনি পাখীদেরকে যেমন সহজে রিযিক দিয়ে থাকেন যে, তারা মানুষের মত কষ্ট ও পরিশ্রম ছাড়াই সামান্য নড়াচড়ার দ্বারা রিযিক পেয়ে যায়। সকালে খালি পেটে বাসা থেকে বের হয়ে যায় আর সন্ধ্যায় ভরাপেটে ফিরে আসে। তেমনিভাবে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকেও সহজ-ভাবে রিযিক সরবরাহ করবেন। তাদের এত বেশী চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে হবে না, যেমন এখন করতে হয়।

(٢٤٦) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ لِقَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ بِكُلِّ وَادٍ شُعْبَةً فَمَنْ اَتْبَعَ قَلْبَهُ الشُّعَبَ كُلَّهَا لَمْ يُبَالِ اللّٰهُ بِاَيِّ وَادٍ اَهْلَكَهُ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ كَفَاهُ الشُّعَبَ * (رواه ابن ماجة)

২৪৬। হযরত 'আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের অন্তরের জন্য প্রতিটি ময়দান ও উপত্যকায় একেকটি শাখা রয়েছে। (অর্থাৎ, প্রতিটি ময়দানে মানুষের অন্তরের খাহেশ বিস্তৃত ও ছড়িয়ে আছে।) সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে এসব শাখা ও খাহেশের মধ্যে লাগিয়ে দেবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এর যে কোন শাখায় ধ্বংস করে দিতে কোন পরোয়া করবেন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ্র উপর ভরসা করবে (এবং নিজের সকল প্রয়োজন তাঁর হাওয়ালা করে দেবে, আর নিজের জীবনকে আল্লাহ্র হুকুমের অধীন বানিয়ে নেবে,) আল্লাহ্ তা'আলা তার সকল প্রয়োজন পূরণের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের তরজমার সাথেই এর মর্ম স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এ হাদীসের আসল অর্জন ও মূল পয়গাম হচ্ছে এই যে, বান্দা যেন নিজের সকল প্রয়োজনকে আল্লাহ্র কাছে সোপর্দ করে দেয়, তাঁর উপর ভরসা ও আস্থা রাখে, তাঁর বিধানের অনুসারী হয়ে জীবন কাটায় এবং দুনিয়ার প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজের চেষ্টা-সাধনাকেও তাঁর বিধানের অধীন করে দেয়। এরূপ করলে আল্লাহ্ই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন এবং তিনিই তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন।

(٢٤٧) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ وَاِذَا سَاَلْتَ فَاسْئَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِاجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَلَوِاجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ * (رواه احمد والترمذى)

২৪৭। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই সওয়ারীতে পেছনে বসা ছিলাম। এ সময় তিনি আমাকে সম্বোধন করে বললেন ঃ হে বৎস! তুমি আল্লাহ্র খেয়াল রাখ, (অর্থাৎ, তাঁর হুকুম পালন এবং তাঁর হক আদায় থেকে গাফেল হয়ো না।) আল্লাহ্ তোমার খেয়াল রাখবেন, (এবং দুনিয়া ও আখেরাতের বিপদ-মুসীবত থেকে তোমাকে হেফাযত করবেন।) তুমি আল্লাহ্কে স্মরণ রাখ, তাঁকে তোমার সামনেই পাবে। যখন তুমি কোন কিছু চাওয়ার ইচ্ছা কর, তখন আল্লাহ্র কাছেই চাও, যখন তুমি সাহায্যের মুখাপেক্ষী হও, তখন আল্লাহ্র কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। আর একথা অন্তরে বদ্ধমূল করে নাও যে, দুনিয়ার তাবৎ জনগোষ্ঠী যদি

একত্রিত হয়ে তোমার কোন উপকার করতে চায়, তাহলে তারা কেবল তোমার এতটুকু উপকারই করতে পারবে, যা আল্লাহ্ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। আর তারা যদি সবে মিলে কোন বিষয়ে তোমার ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তারা কেবল এতটুকু ক্ষতিই করতে পারবে, যা আল্লাহ্ তোমার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। (এর বাইরে কিছুই করতে পারবে না।) কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে এবং ভাগ্যলিপিও শুকিয়ে গিয়েছে। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম ও উদ্দেশ্য এবং এর প্রাণবস্তু এটাই যে, সব ধরনের লাভ-ক্ষতি ও সুখ-দুঃখ একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। এর বাইরে কারো এখতিয়ারে কোন কিছুই নেই। এমনকি যদি সারা দুনিয়ার মানুষ মিলে কোন বান্দার কোন উপকার অথবা ক্ষতি করতে চায় কিংবা সুখ দিতে বা কষ্টে ফেলে দিতে চায়, তবুও আল্লাহ্র হুকুম এবং তাঁর ফায়সালার বিপরীত কিছুই করতে পারবে না। অস্তিত্বে কেবল সেটাই আসবে এবং সেটাই হবে, যা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত হয়ে আছে এবং ভাগ্য লিখনের কলম যা এখন থেকে অনেক আগেই লেখার কাজ সেরে নিয়েছে এবং এ লেখা শুকিয়েও গিয়েছে। এমতাবস্থায় নিজের প্রয়োজনের জন্য কোন মাখলূকের কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করা অথবা তার কাছে সাহায্য চাওয়া কেবল মূর্খতা ও ভ্রষ্টতাই হবে। তাই যা চাইতে হয়, আল্লাহ্র কাছে চাও এবং নিজের প্রয়োজনের জন্য তাঁরই কাছে হাত বাড়াও। আর তাঁর নিকট থেকে পাওয়ার পথ এই যে, তাঁকে এবং তাঁর বিধানাবলী ও তাঁর অধিকারসমূহকে স্মরণে রাখ। তিনি তোমাকে স্মরণ রাখবেন, তোমার প্রয়োজন পূরণ করে দেবেন এবং দুনিয়া ও আখেরাতে তোমার উপর দয়া ও অনুগ্রহ করবেন।

যেহেতু কিতাবুল ঈমানে তকদীরের আলোচনায় অত্যন্ত স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে বলে আসা হয়েছে যে, তকদীরের মর্ম কি এবং তকদীর মেনে নেওয়া সত্ত্বেও আমল ও তদবীরের প্রয়োজন হয় কেন, এ জন্য এ সংশয় ও খটকা সম্পর্কে এখানে লেখার প্রয়োজন মনে করা হয়নি। পাঠকদের মধ্যে কারো যদি এ ব্যাপারে কোন সংশয় থাকে, তাহলে তিনি মা'আরিফুল হাদীস, প্রথম খণ্ডে তকদীরের আলোচনাটি পুনরায় দেখে নিতে পারেন।

(٢٤٨) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرِّبُكُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ اِلَّا قَدْ اَمَرْتُكُمْ بِهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ اِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَ اِنَّ الرُّوْحَ الْاَمِيْنَ (وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِنَّ رُوْحَ الْقُدُسِ) نَفَثَ فِىْ رَوْعِىْ اَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلَا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِي الطَّلَبِ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَاِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ اِلَّا بِطَاعَتِهٖ * (رواه البغوى فى شرح السنة والبيهقى فى شعب الايمان)

২৪৮। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকসকল! যে বস্তু তোমাদেরকে জান্নাতের কাছে নিয়ে যেতে পারে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখতে পারে, এমন সব বিষয়ের নির্দেশই আমি তোমাদেরকে

দিয়েছি। তদ্রূপভাবে যে বস্তু তোমাদেরকে জাহান্নামের কাছে নিয়ে যেতে পারে এবং জান্নাত থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে, এমন সব বিষয় থেকেই আমি তোমাদেরকে বারণ করে রেখেছি। (অর্থাৎ, কোন নেকী ও পুণ্যের বিষয় এমন অবশিষ্ট নেই, যার শিক্ষা আমি তোমাদেরকে দেইনি, আর কোন মন্দ ও গুনাহের বিষয় এমন বাকী নেই, যেগুলো থেকে আমি তোমাদেরকে নিষেধ করিনি।) হযরত রুহুল আমীন— অন্য এক বর্ণনায় রুহুল কুদুস (উদ্দেশ্য হযরত জিবরাঈল [আঃ]) এইমাত্র আমার অন্তরে একথা ঢেলে দিয়েছেন (অর্থাৎ, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ওহী পৌঁছে দিয়েছেন) যে, কোন প্রাণী সেই পর্যন্ত মারা যায় না, যে পর্যন্ত না সে নিজের রিযিক পূর্ণ করে নেয়। (অর্থাৎ, প্রত্যেক ব্যক্তিরই তার মৃত্যুর পূর্বে তার নির্ধারিত রিযিক অবশ্যই ভাগ্যে জুটে যায়। যে পর্যন্ত তার রিযিক পূর্ণ না হয়, সে পর্যন্ত তার মৃত্যু আসতেই পারে না।) তাই হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং রিযিক অন্বেষণে পুণ্য ও পরহেযগারীর পন্থা অবলম্বন কর। আর কাঙ্ক্ষিত রিযিকের কিছুটা বিলম্ব তোমাদেরকে যেন আল্লাহ্র নাফরমানীর পথে তা অন্বেষণ করতে উদ্বুদ্ধ না করে। কেননা, আল্লাহ্র কাছে যা আছে, তা কেবল তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করা যেতে পারে। —শরহুস্সুন্নাহ, বায়হাকী

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের প্রথম অংশটি কেবল একটি ভূমিকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আসলে ঐ কথাটি বলতে চেয়েছিলেন, যা জিবরাঈল (আঃ) ঐ মুহূর্তে তাঁর অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু উপস্থিত লোকদের মনকে পূর্ণরূপে মনোযোগী করার জন্য প্রথমে তিনি বললেন ঃ হে লোক সকল! হারাম-হালাল এবং পাপ-পুণ্যের সকল বিষয়ের শিক্ষাই আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। এখন আমি একটি চূড়ান্ত কথা তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, যা এইমাত্র জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলে গিয়েছেন।

এ ভূমিকা দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকদের মস্তিষ্ককে জাগ্রত এবং তাদের দৃষ্টিকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করলেন। তারপর ঐ বিশেষ কথাটি বললেন, যার সারবস্তু এটাই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির রিযিক লিপিবদ্ধ ও নির্ধারিত করে রাখা হয়েছে। এ রিযিক তার মৃত্যুর পূর্বে সে পেয়েই যাবে। ব্যাপার যখন তাই, তাহলে মানুষের উচিত, রিযিক ও জীবিকা লাভে যদি কিছুটা বিলম্বও ঘটে, তবুও সে যেন এটা অর্জন করার জন্য এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, যা আল্লাহ্ তা'আলার মর্জির খেলাফ এবং যাতে আল্লাহ্র নাফরমানী হয়; বরং আল্লাহ্ তা'আলাই রিযিকের মালিক— এ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করে কেবল হালাল ও বৈধ পন্থায়ই এটা উপার্জনের চেষ্টা করবে। কেননা, আল্লাহ্র দয়া ও অনুগ্রহ তাঁর আনুগত্য ও ফরমাবরদারীর পথেই লাভ করা যায়।

বিষয়টি একটি উদাহরণের মাধ্যমে সহজে এভাবে বুঝে নেওয়া যেতে পারে। মনে করুন, আল্লাহ্র কোন বান্দা অভাবে পড়ে আছে, তার পেট ভরার জন্য কিছু পয়সার প্রয়োজন। এ সময় সে এক ব্যক্তিকে দেখল যে, সে ঘুমাচ্ছে। শয়তান তখন এসে তার অন্তরে কুমন্ত্রণা দিল যে, এ ঘুমন্ত ব্যক্তির কোন জিনিস তুলে নাও এবং এখনই তা হাতে হাতে বিক্রি করে নিজের জীবিকার ব্যবস্থা করে নাও। এ সময়ের জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ শিক্ষা যে, তুমি বিশ্বাস রাখ যে, যে জীবিকা তোমার জন্য নির্ধারিত সেটা তোমার হাতে আসবেই। তাই তুমি কেন চুরি করে আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট, নিজের বিবেক ও আত্মাকে কলুষিত

এবং নিজের আখেরাতকে ধ্বংস করবে ? তুমি তোমার নির্ধারিত চুরির মাধ্যমে না, কোন হালাল ও বৈধ উপায়ে অর্জনের চেষ্টা কর। হালালের ময়দান ও ক্ষেত্র তো কখনো সংকীর্ণ নয়।

(٢٤٩) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى اَهْلِهٖ فَلَمَّا رَاٰى مَابِهِمْ مِنَ الْحَاجَةِ خَرَجَ اِلَى الْبَرِيَّةِ فَلَمَّا رَاَتِ امْرَاَتُهٗ قَامَتْ اِلَى الرَّحٰى فَوَضَعَتْهَا وَاِلَى التَّنُّوْرِ فَسَجَرَتْهُ ثُمَّ قَالَتْ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا فَنَظَرَتْ فَاِذَا الْجَفْنَةُ قَدِ امْتَلَاَتْ قَالَ وَذَهَبَتْ اِلَى التَّنُّوْرِ فَوَجَدَتْهُ مُمْتَلِئًا قَالَ فَرَجَعَ الزَّوْجُ قَالَ اَصَبْتُمْ بَعْدِىْ شَيْئًا قَالَتِ امْرَاَتُهٗ نَعَمْ مِنْ رَّبِّنَا وَقَامَ اِلَى الرَّحٰى فَذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَمَا اَنَّهٗ لَوْ لَمْ يَرْفَعْهَا لَمْ تَزَلْ تَدُوْرُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ * (رواه احمد)

২৪৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি নিজের পরিবার-পরিজনের কাছে আসল। সে যখন তাদেরকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখল, তখন (কাতরতার সাথে আল্লাহ্র কাছে দো'আ করার জন্য) ময়দানের দিকে বের হয়ে গেল। যখন তার স্ত্রী দেখল (যে, স্বামী আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাওয়ার জন্য বের হয়ে গেল, তখন সে আল্লাহ্র উপর ভরসা করে আল্লাহ্র অনুগ্রহ গ্রহণের প্রস্তুতি শুরু করে দিল এবং) সে উঠে চাক্কির কাছে গেল এবং সেটা স্থাপন করল, (যাতে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন শস্য আসলে তা দ্রুত পিষে নেওয়া যায়।) তারপর সে চুলার কাছে গেল এবং আগুন ধরিয়ে দিল। (যাতে আটা পিষে নেওয়ার পর রুটি তৈরীতে দেরী না হয়।) তারপর সে নিজেও এভাবে দো'আ করতে লাগল ঃ হে আল্লাহ! আমাদেরকে রিযিক দান কর। হঠাৎ সে লক্ষ্য করে দেখল যে, চাক্কির নীচের বিরাট পাত্রটি আটায় ভর্তি হয়ে আছে। তারপর সে চুলার কাছে গিয়ে দেখল যে, চুলাও রুটিতে পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তারপর স্বামী ফিরে আসল এবং স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, আমি চলে যাওয়ার পর তুমি কি কিছু পেয়েছ ? স্ত্রী উত্তর দিল, হ্যাঁ, আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পেয়েছি। (অর্থাৎ, সরাসরি গায়েবী ভাণ্ডার থেকে এভাবে পেয়েছি।) একথা শুনে সেও চাক্কির কাছে গেল (এবং বিস্ময় ও কৌতুহল বশতঃ এর একটি পাট খুলে দেখল।) তারপর যখন এ ঘটনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলা হল, তখন তিনি বললেন ঃ জেনে রাখ, সে যদি এটা উঠিয়ে না দেখত, তাহলে এ চাক্কি কেয়ামত পর্যন্ত এভাবেই ঘুরতে থাকত এবং এখান থেকে আটা বের হতে থাকত। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীসে যে ঘটনাটি বর্ণনা করা হয়েছে, এটা অলৌকিক বিষয়সমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ দুনিয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার দানসমূহ সাধারণতঃ উপায়-উপকরণের মাধ্যমেই লাভ হয়ে থাকে। কিন্তু কখনো কখনো আল্লাহ্ তা'আলার কুদরতের খেলা এভাবেও প্রকাশিত হয় যে, উপকরণ জগতের সাধারণ নিয়মের বিপরীত সরাসরি আল্লাহ্র কুদরতে এমন ঘটনা ঘটে যায়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'আলার জন্য— যিনি এ আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা— এটা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এ ধরনের কোন ঘটনা যদি আল্লাহ্ তা'আলার কোন নবীর হাতে

প্রকাশ পায়, তাহলে এটাকে মু'জেযা বলা হয়, আর যদি নবীর অনুসারী কোন উম্মতের হাতে এ ধরনের কোন ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহলে একে কারামত বলা হয়।

এ ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ে আল্লাহ্র উপর দৃঢ় বিশ্বাস করে তাঁর কাছে রিযিক চেয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দো'আ এভাবে কবূল করলেন যে, অলৌকিক পন্থায় তাদের জন্য রিযিকের উপকরণ পাঠিয়ে দিলেন। গায়েব থেকে চাক্কিতে আটা এসে গেল এবং চুলায় রুটি তৈরী হয়ে গেল।

যেসব লোক তাওয়াক্কুলের সম্পদ থেকে বঞ্চিত এবং আল্লাহ্র অসীম কুদরতের ব্যাপারে অজ্ঞ, তাদের মনে হয়তো এ ধরনের ঘটনার বেলায় সংশয় ও খটকা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ্র যেসব বান্দা তাওয়াক্কুল, বিশ্বাস ও আল্লাহ্র গুণাবলীর পরিচয় কিছুটা হলেও লাভ করেছে, তাদের জন্য এসব ঘটনায় আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর যথার্থ ভরসা করে, তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। (সূরা ত্বালাক্ব)

(٢٥٠) عَنْ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ اٰدَمَ رِضَاهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ تَرْكُهُ اِسْتِخَارَةَ اللهِ وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ اٰدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَى اللهُ لَهُ * (رواه احمد والترمذى)

২৫০। হযরত সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আদম-সন্তানের একটি সৌভাগ্যের দিক হচ্ছে আল্লাহ্র ফায়সালার উপর তার সন্তুষ্ট থাকা। আর আদম-সন্তানের দুর্ভাগ্যের একটি বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্র কাছে তার কল্যাণ কামনা না করা। তার আরেকটি দুর্ভাগ্যের বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্ তার জন্য যা ফায়সালা করে রেখেছেন, এতে অসন্তুষ্ট থাকা। —মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা ও ভাগ্য লিখনের কারণে মানুষের উপর অনেক সময় এমন অবস্থা আসে, যা তার মনের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে বান্দার সৌভাগ্য ও কল্যাণের লক্ষণ হচ্ছে এই যে, সে আল্লাহ্ তা'আলাকে সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময় ও বান্দাদের প্রতি পরম অনুগ্রহশীল বিশ্বাস করে তাঁর ফায়সালা ও সিদ্ধান্তের উপর খুশী থাকবে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে ঃ হতে পারে যে, তোমরা একটি জিনিসকে মন্দ মনে করবে, অথচ বাস্তবে ও পরিণামে এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তেমনিভাবে তোমরা হয়তো একটি জিনিসকে পছন্দ করবে, অথচ বাস্তব ও পরিণামের বিচারে এতে অকল্যাণ ও ক্ষতি রয়েছে। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই ভাল জানেন আর তোমরা জান না।

দ্বিতীয় কথাটি এ হাদীসে এই বলা হয়েছে, বান্দার জন্য জরুরী যে, সে সর্বদা আল্লাহ্র কাছে এ দো'আ করতে থাকবে, আল্লাহ্র কাছে বান্দার জন্য যে কল্যাণ রয়েছে, তার জন্য যেন এরই ফায়সালা করা হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে বলে দিয়েছেন যে, বান্দার নিজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কল্যাণ প্রার্থনা না করা তার জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যের কথা। অনুরূপভাবে এটাও বান্দার দুর্ভাগ্য যে, সে আল্লাহ্র ভাগ্যলিপি ও তাঁর ফায়সালার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবে।

একথা স্পষ্ট যে, ভাগ্য লিখনে সন্তুষ্টির এ স্তর বান্দা তখনই লাভ করতে পারে, যখন সে আল্লাহ্ তা'আলার ঐসব গুণাবলীর উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে নিতে পারে, কুরআন মজীদ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব গুণাবলীর কথা মানুষকে বলে দিয়েছেন। তারপর এ মা'রেফাত ও ঈমান-ইয়াকীনের ফলে তার অন্তর আল্লাহ্র মহব্বত ও ভালবাসায় সিক্ত ও পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ঈমান ও ভালবাসার এ স্তরে উপনীত হওয়ার পর বান্দার অন্তরের উচ্চারণ এই হয়ে থাকে ঃ হে আল্লাহ্! তুমি যদি আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, তাহলে এটা হবে তোমার অনুগ্রহ, আর যদি আমাকে মেরে ফেল, তাহলে এতেও আমার আপত্তি করার কিছু নেই। আমার অন্তর তোমার পাগল, তাই তুমি যাই কর, তাতেই আমি খুশী।

এখলাছ ও একনিষ্ঠতা এবং নাম-যশ কামনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে এ মানবজগত উত্তম চরিত্র ও গুণাবলীর যে শিক্ষা পেয়েছে, এ অধমের দৃষ্টিতে এর পূর্ণতা, এখলাছ ও একনিষ্ঠতার শিক্ষা দ্বারা সাধিত হয়। অর্থাৎ, এখলাছ ও একনিষ্ঠতা হচ্ছে নৈতিকতা অধ্যায়ের পরিসমাপ্তকারী শেষ পাঠ ও আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উন্নতির শেষ সোপান।

এ এখলাছ ও একনিষ্ঠতার মর্ম এই যে, প্রত্যেক সৎকর্ম অথবা কারো সাথে উত্তম আচরণ কেবল এ জন্য এবং এ নিয়্যতে করা যে, এতে আমার পরওয়ারদেগার খুশী হবেন, আমার উপর দয়া করবেন এবং আমি তাঁর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ থেকে বাঁচতে পারব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে দিয়েছেন যে, এখলাছই প্রত্যেক সৎকর্মের আত্মা ও প্রাণ। যদি কোন অতি উত্তম কাজও এখলাছশূন্য হয় এবং এর উদ্দেশ্য আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন না হয়; বরং যশ, সুখ্যাতি অথবা এ ধরনের কোন মনোবৃত্তি এর পেছনে কার্যকর থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এর কোনই মূল্য নেই এবং এর উপর কোন সওয়াবও পাওয়া যাবে না।

কথাটি অন্য শব্দমালায় এভাবেও বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি এবং আখেরাতের প্রতিদান— যা সৎকর্ম ও উত্তম চরিত্রের আসল পুরস্কার ও ফল এবং যা মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কামনা হওয়া চাই— সেটা কেবল কর্ম ও চরিত্রের ভিত্তিতেই লাভ করা যায় না; বরং সেটা কেবল তখন লাভ করা যায়, যখন ঐ কর্ম ও চরিত্র দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতের প্রতিদান লাভের ইচ্ছা এবং নিয়্যতও করা হয়, আর এটাই যখন এ কাজে উদ্বুদ্ধকারী হয়। আর আসলেও এমনটাই হওয়া চাই। কেননা, আমাদের নিজেদের ব্যাপারেও এটাই আমাদের নীতি।

মনে করুন, কোন ব্যক্তি আপনার খুব সেবা ও খেদমত করে, আপনাকে সর্বদিক দিয়ে শান্তি দিতে এবং খুশী রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু কোন সূত্রে আপনি যদি জানতে পারেন যে, আপনার প্রতি তার কোন আন্তরিকতা নেই; বরং তার এ আচরণ ও ব্যবহার তার কোন ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য অথবা সে আপনার কোন বন্ধু অথবা ঘনিষ্ঠজন থেকে নিজের কোন কাজ আদায় করে নিতে চায় এবং কেবল এ উদ্দেশ্যেই আপনাকে দেখানোর জন্য শুধু এ আচরণ করে, তাহলে আপনার অন্তরে তার এবং তার এ আচরণের কোন মূল্য থাকবে না। আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারটাও ঠিক তদ্রূপ। পার্থক্য শুধু এই যে, আমরা অন্যদের অন্তরের অবস্থা জানি না, আর আল্লাহ্ তা'আলা সকলের অন্তরের অবস্থা এবং তাদের নিয়্যত ও উদ্দেশ্য জানেন। অতএব, তাঁর যেসব বান্দার অবস্থা এই যে, তারা তাঁর সন্তুষ্টি ও রহমত কামনায়

পুণ্যকাজ করে, আল্লাহ্ তাদের আমল কবূল করে তাদের প্রতি খুশী হন এবং তাদের উপর রহমত নাযিল করেন। আর আখেরাত— যা প্রকৃত প্রতিদান জগত— সেখানেই তাঁর সন্তুষ্টি ও অনুগ্রহের পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। পক্ষান্তরে যেসব লোক দুনিয়ার মানুষের বাহবা কুড়ানোর জন্য অথবা নাম-যশ ও প্রসিদ্ধি লাভের জন্য সৎকর্মের মহড়া দেখায়, তাদের এসব উদ্দেশ্য দুনিয়াতে যদি সফলও হয়ে যায়, তবুও তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রহমত থেকে বঞ্চিতই থাকবে। তাদের এ বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটির পূর্ণ প্রকাশও আখেরাতেই ঘটবে।

এ অধ্যায়ের মূল ভিত্তি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ ঐ হাদীস, যেখানে বলা হয়েছে ঃ সকল কাজের মূল্যায়ন নিয়্যতের ভিত্তিতেই করা হয়। হাদীসটি প্রথম খণ্ডের একেবারে শুরুতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এবং সেখানেই এর ব্যাখ্যা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। তাই এখানে এর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। এখানে ঐ হাদীসটি ব্যতীত এ সংক্রান্ত অন্য কয়েকটি হাদীস আনা হচ্ছে এবং এ হাদীসগুলোর মাধ্যমেই দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটবে।

(٢٥١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ * (رواه مسلم)

২৫১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দেহাকৃতি ও তোমাদের সম্পদ দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও তোমাদের কর্ম এবং আমল দেখেন। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসের মর্ম এই যে, আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কোন কিছুর গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি কারো আকৃতি-অবয়ব অথবা তার সম্পদশালী হওয়া নয়; বরং অন্তরের পরিশুদ্ধি ও আমলের উৎকর্ষই হচ্ছে গ্রহণযোগ্যতার মাপকাঠি। তিনি কোন বান্দার জন্য সন্তুষ্টি ও রহমতের ফায়সালা তার চেহারা-আকৃতি অথবা তার ধন-সম্পদের ভিত্তিতে করেন না; বরং তার অন্তরের গতি ও কর্মের উৎকর্ষের ভিত্তিতে করে থাকেন।

এ হাদীসেরই অন্য এক বর্ণনায় উল্লিখিত শব্দমালার স্থলে এ শব্দমালা এসেছে ঃ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের দেহ ও আকৃতি এবং তোমাদের শুধু বাহ্যিক কর্ম ও আমল দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর দেখেন। —জমউল ফাওয়ায়েদ, ২য় খণ্ড

এ বর্ণনার শব্দগুলো এ মর্ম আদায়ের জন্য আরো অধিক স্পষ্ট যে, গ্রহণযোগ্যতার আসল ভিত্তি অন্তরের সঠিক গতি অর্থাৎ, নিয়্যতের বিশুদ্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, কোন ব্যক্তির আমল ও কর্ম যদি উত্তম থেকে উত্তমও হয়, কিন্তু তার অন্তর যদি এখলাছ বা নিষ্ঠাশূন্য থাকে এবং নিয়্যত শুদ্ধ না হয়, তাহলে সেই আমল ও কাজ কখনো গ্রহণযোগ্য হবে না।

এখলাছের বরকত এবং এর প্রভাব ও শক্তি

(٢٥٢) عَنْ اِبْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا ثَلٰثَةُ نَفَرٍ يَتَمَاشَوْنَ اَخَذَهُمُ الْمَطَرُ فَمَالُوْا اِلٰى غَارٍ فِي الْجَبَلِ فَانْحَطَّتْ عَلٰى فَمِ غَارِهِمْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَاطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ فَقَالَ

بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُنْظُرُوْا اَعْمَالاً عَمِلْتُمُوْهَا لِلّٰهِ صَالِحَةً فَادْعُوا اللّٰهَ بِهَا لَعَلَّهُ يُفَرِّجُهَا فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَ لِيْ وَالِدَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَلِيَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ كُنْتُ اَرْعٰى عَلَيْهِمْ فَاِذَا رُحْتُ عَلَيْهِمْ فَحَلَبْتُ بَدَأْتُ بِوَالِدَيَّ اَسْقِيْهِمَا قَبْلَ وُلْدِيْ وَاَنَّهُ قَدْ نَاءَ بِيَ الشَّجَرُ فَمَا اَتَيْتُ حَتّٰى اَمْسَيْتُ فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا فَحَلَبْتُ كَمَا كُنْتُ اَحْلُبُ فَجِئْتُ بِالْحِلاَبِ فَقُمْتُ عِنْدَ رُؤُسِهِمَا اَكْرَهُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَكْرَهُ اَنْ اَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَأْبِيْ وَدَأْبُهُمْ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ لَنَا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ فَفَرَّجَ اللّٰهُ لَهُمْ حَتّٰى يَرَوْنَ السَّمَاءَ قَالَ الثَّانِيْ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَتْ لِيْ بِنْتُ عَمٍّ اُحِبُّهَا كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَطَلَبْتُ اِلَيْهَا نَفْسَهَا فَاَبَتْ حَتّٰى اٰتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِائَةَ دِيْنَارٍ فَلَقِيْتُهَا بِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفْتَحِ الْخَاتَمَ فَقُمْتُ عَنْهَا اَللّٰهُمَّ فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ لَنَا مِنْهَا فَفَرَّجَ لَهُمْ فُرْجَةً وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ كُنْتُ اسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقِ اَرُزٍّ فَلَمَّا قَضٰى عَمَلَهُ قَالَ اَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَتَرَكَهُ وَ رَغِبَ عَنْهُ فَلَمْ اَزَلْ اَزْرَعُهُ حَتّٰى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا فَجَاءَنِيْ فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَظْلِمْنِيْ وَاَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَقُلْتُ اذْهَبْ اِلَى الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَقَالَ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَهْزَأْبِيْ فَقُلْتُ اِنِّيْ لاَاَهْزَأُ بِكَ فَخُذْ ذٰلِكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَاَخَذَهُ فَانْطَلَقَ بِهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرِجْ مَا بَقِيَ فَفَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ * (رواه البخارى ومسلم)

২৫২। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একবার তিন ব্যক্তি কোথাও যাচ্ছিল, এমন সময় তাদেরকে বৃষ্টি ধরল। ফলে তারা একটি পর্বত-গুহায় আশ্রয় নিল। সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করার পর পাহাড় হতে বিশাল এক প্রস্তরখণ্ড খসে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দিল। তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, তোমরা নিজেদের ঐসব আমলের দিকে লক্ষ্য কর, যেগুলো তোমরা শুধু আল্লাহ্‌র জন্যই করেছ এবং এগুলোর ওসীলা দিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ কর। আশা করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে এ পাথরের বিপদ থেকে মুক্তি দান করবেন।

তাদের একজন বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমার পিতা-মাতা ছিলেন অতিশয় বৃদ্ধ, আর আমার কয়েকটি ছোট সন্তান ছিল। আমি তাদেরকে দুধ পান করানোর জন্য মাঠে ছাগল চরাতাম। সন্ধ্যা হলে আমি বাড়ী ফিরে আসতাম এবং দুধ দোহন করে প্রথমে আমার পিতা-মাতাকে পান করাতাম এবং তারপর সন্তানদের দিতাম। একদিন এমন ঘটনা ঘটল যে, চারণভূমির বৃক্ষ

আমাকে অনেক দূরে নিয়ে গেল। (অর্থাৎ, ছাগল চরাতে চরাতে আমি অনেক দূরে চলে গেলাম।) তাই সময়মত বাড়ী ফিরতে পারলাম না; বরং সেখানেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। যখন বাড়ীতে ফিরে আসলাম, তখন দেখি, আমার পিতা-মাতা দু'জনই ঘুমিয়ে গেছেন। আমি অন্য দিনের মত দুধ দোহন করলাম এবং দুধের পাত্র নিয়ে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে গেলাম। তাদেরকে জাগিয়ে তোলাও আমার কাছে ভাল মনে হচ্ছিল না, আর তাদের পূর্বে সন্তানদেরকে দুধ পান করতে দেওয়াও আমি পছন্দ করছিলাম না। এদিকে সন্তানগুলো আমার পায়ের কাছে পড়ে ক্ষুধায় ক্রন্দন করে যাচ্ছিল। ভোর পর্যন্ত এ অবস্থায়ই কেটে গেল। (আমি দুধের পাত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে সন্তানরা কান্নাকাটি করছে আর পিতা-মাতা বিছানায় পড়ে নিদ্রায়।) হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান যে, আমি এ কাজটি শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করেছিলাম, তাহলে তুমি এ পাথরটি গুহার মুখ থেকে এতটুকু সরিয়ে দাও যে, আমরা আকাশ দেখতে পারি। এ দো'আর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা পাথরটি এতটুকু সরিয়ে দিলেন যে, এখন আকাশ দেখা যায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ্! আমার এক চাচাতো বোন ছিল, যাকে আমি খুব ভালবাসতাম।একজন পুরুষের কোন নারীর প্রতি যত গভীর ভালবাসা হতে পারে ঠিক ততটাই ছিল আমার। আমি তার কাছে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলাম। সে অস্বীকার করে বলল, যে পর্যন্ত আমাকে একশ স্বর্ণমুদ্রা না দিতে পারবে, এ কাজ হবে না। অতএব, আমি তা সংগ্রহ করার চেষ্টা শুরু করলাম এবং একশ স্বর্ণমুদ্রা জমা করে ফেললাম। তারপর এগুলো নিয়ে তার কাছে আসলাম। আমি যখন (মিলনের উদ্দেশ্যে) তার দুই পায়ের মাঝখানে বসে গেলাম, তখন সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমার সতীত্ব নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। আমি তখন আল্লাহ্র ভয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে গেলাম (এবং তার সম্ভ্রম নষ্ট করা থেকে বিরত হয়ে গেলাম।) হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান যে, এ কাজটি আমি কেবল তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করেছিলাম, তাহলে তুমি এ পাথরটি সরিয়ে দাও এবং আমাদের জন্য রাস্তা খুলে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা তখন এ পাথরটি আরেকটু সরিয়ে দিলেন।

তৃতীয় ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ! আমি এক শ্রমিককে কিছু ধানের বিনিময়ে কাজে নিয়োগ করেছিলাম। সে যখন নিজের কাজ শেষ করল, তখন বলল, আমার মজুরী দিয়ে দিন। আমি যখন মজুরী আনতে গেলাম, এ ফাঁকে সে মজুরী না নিয়েই চলে গেল এবং নিজের হক নিতে আর ফিরে এলো না। আমি তখন তার মজুরীর ধান দিয়ে চাষাবাদ শুরু করে দিলাম এবং ফসল উৎপাদন করতে থাকলাম। এভাবে এ ধানের মূল্য দিয়ে আমি অনেক গরু এবং এগুলোর রাখাল সংগ্রহ করে ফেললাম। অনেক দিন পর সেই শ্রমিক আমার কাছে আসল এবং বলল ঃ আল্লাহ্কে ভয় করুন, অবিচার থেকে বিরত থাকুন এবং আমার পাওনা পরিশোধ করে দিন। আমি উত্তর দিলাম, তুমি এসব গরু এবং রাখালদেরকে নিয়ে যাও। (কেননা, এগুলো সবই তোমার হক।) সে বলতে লাগল ঃ আল্লাহ্কে ভয় করুন, আমার সাথে মশকরা করবেন না। আমি বললাম, আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করছি না। তুমি এসব গরু ও রাখালদেরকে নিয়ে যাও, এগুলো তোমারই। তারপর সে এগুলো নিয়ে চলে গেল। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান যে, এ কাজটি আমি শুধু তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই করেছিলাম, তাহলে তুমি এ পাথরটি

সম্পূর্ণ সরিয়ে দাও। আল্লাহ্ তা'আলা তখন পাথরটি সরিয়ে দিলেন এবং রাস্তা খুলে দিলেন।
—বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসে যে তিন ব্যক্তির ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তারা সম্ভবতঃ পূর্ব যুগের কোন নবীর উম্মত ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ উম্মতের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এ ঘটনায় আল্লাহ্র এসব বান্দা নিজেদের যেসকল আমলকে আল্লাহ্র দরবারে পেশ করে দো'আ করেছিল, এগুলোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মত। সর্বপ্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য— যার উল্লেখ হাদীসেও রয়েছে এই যে, এ তিনটি আমলই শুধু আল্লাহ্র সন্তুষ্টি কামনায় করা হয়েছিল এবং এ বৈশিষ্ট্যের কারণেই তারা এগুলো আল্লাহ্র দরবারে পেশ করেছিল।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, এ তিনটি আমলই আল্লাহ্র হুকুম ও মর্জির বিপরীত নিজের নফসের চাহিদাকে পরাভূত করা ও বিসর্জন দেওয়ার উন্নততর দৃষ্টান্ত। একটু চিন্তা করে দেখুন, প্রথম ব্যক্তির নফসের বিরুদ্ধে মুজাহাদা ও সাধনাটি কত কঠিন! সারাদিন মাঠে পশুদেরকে ঘাস-পাতা খাওয়ানোর পর সন্ধ্যায় দেরী করে বাড়ীতে ফিরে আসল। স্বাভাবিকভাবেই তার মন ঘুমের জন্য পাগল হয়ে থাকবে। কিন্তু পিতা-মাতা যেহেতু দুধ পান না করেই ঘুমিয়ে পড়েছিল, আর সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি এতেই মনে করছিল যে, যখন ঘুম ভাঙবে, তখন সে তাদেরকে দুধ পান করিয়ে দেবে। এজন্য এ ব্যক্তি সারারাত দুধের পাত্র হাতে নিয়ে তাদের শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল। এদিকে তার সন্তানরা তার পায়ের কাছে পড়ে ক্ষুধায় কাঁদছিল। কিন্তু সে মা-বাপের হককে অগ্রগণ্য মনে করে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য এ মুজাহাদা ও ত্যাগ স্বীকার করল যে, বুড়ো মা-বাপের আগে নিজের আদরের সন্তানদেরকেও দুধ পান করতে দিল না। এমনকি এ অবস্থায়ই প্রভাত হয়ে গেল।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় ব্যক্তির আমলটির বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ্য। একজন যুবক এক মেয়ের প্রতি প্রেম লালন করে। যখন এজন্য এক বিরাট অংকের অর্থ নির্ধারিত হয়ে যায় এবং অনেক কষ্ট করে এ অর্থ সংগ্রহ করে তাকে দিয়েও দেয় এবং জীবনের এক বিরাট আকাঙ্ক্ষা পূরণের সুযোগও এসে যায় এবং কোন প্রতিবন্ধকতাও থাকে না, তখন আল্লাহ্র নাম মাঝে এসে যায় আর সে বান্দা নিজের নফসের চাহিদা পূরণ না করে আল্লাহ্কে ভয় করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি কামনায় উঠে চলে যায়। জৈবিক চাহিদার অধিকারী প্রতিটি মানুষ অনুমান করতে পারে যে, এটা কত কঠিন মুজাহাদা এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির বিপরীত নফসের কামনা বিসর্জন দেওয়ার এটা কত বড় দৃষ্টান্ত।

তেমনিভাবে তৃতীয় ব্যক্তির কাজের এ বৈশিষ্ট্যটিও প্রকাশ্য যে, একজন মজুরের কয়েক সের ধান কারো কাছে রয়ে গেল। সে এ ধানগুলো নিজের ভূমিতে বপন করে দিল। তারপর যে ফসল উৎপন্ন হল সেটাকে সে ঐ মজুরের মালিকানা সাব্যস্ত করে তারই হিসাবে জমা করে এটাকে আরো বাড়াতে থাকল। এমনকি এর দ্বারা এতটুকু সম্পদ জোগাড় হয়ে গেল যে, পশুদের আস্ত একটা পাল হয়ে গেল। তারপর ঐ মজুর যখন অনেক দিন পর আসল, তখন ঐ আমানতদার পুণ্যবান ব্যক্তি ঐ সমস্ত সম্পদ— যা তার পরিশ্রমে অর্জিত হয়েছিল সেই মজুরকে দিয়ে দিল। প্রত্যেক ব্যক্তিই অনুমান করতে পারে যে, সে সময় শয়তান তার অন্তরে কি ধরনের কুমন্ত্রণা ও কুবুদ্ধি দিয়ে থাকবে। তার নফসের কত প্রবল আকাঙ্ক্ষা হয়ে থাকবে যে,

এ সম্পদ— যা শুধু আমার পরিশ্রমের ফলে সৃষ্টি হয়েছে এবং ঐ মজুর যার খবরও রাখে না— সেটা আমার কাছেই থাকুক। কিন্তু আল্লাহ্র এ বান্দা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় নিজের নফসের এ আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিয়ে দিল এবং নির্দ্বিধায় এসব সম্পদ ঐ মজুরের কাছে সমর্পণ করে দিল।

রিয়া এক ধরনের শির্ক ও এক প্রকার মুনাফেকী

এখলাছ ও একনিষ্ঠতা (অর্থাৎ, যে কোন নেক কাজ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রহমত কামনায় করা) যেমন ঈমান ও তওহীদের দাবী এবং আমলের প্রাণবস্তু, তেমনিভাবে রিয়া অর্থাৎ, লোক দেখানো এবং দুনিয়াতে সুখ্যাতি লাভ তথা নাম-যশের জন্য নেক কাজ করা ঈমান ও তওহীদের পরিপন্থী এবং এক ধরনের শির্ক।

(٢٥٣) عَنْ شَدَّادِ ابْنِ اَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ اَشْرَكَ * (رواه احمد)

২৫৩। হযরত শাদ্দাদ ইবনে.আউস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নামায পড়ল, সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য রোযা রাখল, সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করল, সে শির্ক করল। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ প্রকৃত শির্ক তো এই যে, কেউ আল্লাহ্ তা'আলার সত্তা, তাঁর গুণাবলী অথবা তাঁর কাজ ও অধিকারের মধ্যে অন্য কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবে অথবা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো এবাদত করবে। এটা হচ্ছে শির্কে হাকীকী, শির্কে জলী এবং শির্কে আকবার, যার ব্যাপারে কুরআন মজীদে ঘোষণা করা হয়েছে এবং এটা মুসলমানদের একটি মৌলিক বিশ্বাসও যে, এ শির্কে লিপ্ত ব্যক্তিকে কখনো ক্ষমা করা হবে না। কিন্তু কিছু কর্ম ও চরিত্র এমনও রয়েছে, যেগুলো যদিও এ অর্থে শির্ক নয়; কিন্তু শির্কের কিছুটা মিশ্রণ এতে থাকে। এগুলোর মধ্য থেকে একটি কাজ এও যে, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র এবাদত অথবা অন্য কোন নেক আমল আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও রহমত কামনার স্থলে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করে। অর্থাৎ, এ উদ্দেশ্যে করে যে, মানুষ যেন তাকে আবেদ ও পুণ্যবান মনে করে এবং তার ভক্ত হয়ে যায়। এটাকেই রিয়া বলা হয় এবং এটা যদিও প্রকৃত শির্ক নয়; কিন্তু এক পর্যায়ের শির্ক এবং এক ধরনের মুনাফেকী ও মারাত্মক গুনাহ্। অন্য এক হাদীসে এটাকে শির্কে খফী অর্থাৎ, সূক্ষ্ম শিরক এবং অপর এক হাদীসে শির্কে আসগর তথা ছোট শির্ক বলা হয়েছে। (এ দু'টি হাদীসই সামনে আসবে।)

একথা স্মরণ রাখা দরকার যে, এ হাদীসে নামায, রোযা এবং দান-খয়রাতের উল্লেখ শুধু উদাহরণ হিসাবে করা হয়েছে। অন্যথায় এগুলো ছাড়াও যেসব নেক আমল মানুষকে দেখানোর জন্য এবং তাদের দৃষ্টিতে সম্মানের পাত্র হওয়ার জন্য অথবা তাদের কাছ থেকে কোন দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিলের জন্য করা হবে, সেটাও এক ধরনের শির্কই হবে এবং এমন আমলকারী সওয়াবের স্থলে আল্লাহ্র কঠিন শাস্তির উপযুক্ত হবে।

(٢٥٤) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ فَقُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ! قَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ اَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّىْ فَيَزِيْدُ صَلٰوتَهُ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ *

(رواه ابن ماجة)

২৫৪। হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজের কক্ষ থেকে) বের হয়ে আমাদের কাছে আসলেন। এসময় আমরা দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। তিনি তখন আমাদেরকে বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে ঐ জিনিসের কথা বলে দেব না, যা আমার দৃষ্টিতে তোমাদের জন্য দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয়াবহ। আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি অবশ্যই বলে দিন, সেটা কি জিনিস। তিনি উত্তর দিলেন ঃ সেটা হচ্ছে সূক্ষ্ম শির্ক, (যার একটি উদাহরণ এই যে,) এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়াল, তারপর সে নিজের নামায এজন্য লম্বা করল যে, কেউ তাকে নামাযরত অবস্থায় দেখছে। —ইবনে মাজাহ্

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বক্তব্যের মর্ম সম্ভবতঃ এই ছিল যে, দাজ্জাল যেই প্রকাশ্য শির্ক ও কুফরীর দিকে আহ্বান জানাবে এবং যার উপর সে মানুষকে বাধ্য করবে, আমি এ ব্যাপারে বেশী আশংকা করি না যে, আমার কোন খাঁটি উম্মত একথা মানতে রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু আমার এ ব্যাপারে অবশ্যই আশংকা রয়েছে যে, শয়তান তোমাদেরকে এমন কোন শির্কে লিপ্ত করে দেবে, যা প্রকাশ্য শির্ক নয়; বরং সূক্ষ্ম ধরনের শির্ক। এর একটি উদাহরণ তিনি এই দিয়েছেন যে, নামায এ উদ্দেশ্যে দীর্ঘ ও সুন্দর করে পড়া হবে, যাতে দর্শক এ নামাযীর ভক্ত হয়ে যায়।

ইবনে মাজাহ্ শরীফের অপর এক বর্ণনায় এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার নিজের উম্মতের শির্কে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশংকা ব্যক্ত করলে সাহাবায়ে কেরাম আরয করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি এমনটি মনে করেন যে, আপনার পরে আপনার উম্মত শির্কে লিপ্ত হয়ে যাবে ? তিনি বললেন ঃ এ ব্যাপারে আমি তো নিশ্চিন্ত যে, আমার উম্মত চন্দ্র, সূর্য, পাথর ও প্রতিমার পূজা করবে না, কিন্তু এটা হতে পারে যে, তারা রিয়া জাতীয় শির্কে লিপ্ত হয়ে যাবে।

(٢٥٥) عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَخْوَفَ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمْ اَلشِّرْكُ الْاَصْغَرُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ ؟ قَالَ الرِّيَاءُ * (رواه احمد)

২৫৫। হযরত মাহমূদ ইবনে লবীদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের বেলায় যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশী আশংকা করি সেটা হচ্ছে ছোট শির্ক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ছোট শির্কের অর্থ কি ? তিনি উত্তর দিলেন, সেটা হচ্ছে রিয়া। (অর্থাৎ, কোন নেক কাজ মানুষকে দেখানোর জন্য করা।) —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সকল বাণীর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে নিজের উম্মতকে সতর্ক করা, যাতে তারা সাবধান হয়ে যায় এবং এ ধরনের সূক্ষ্ম শির্ক থেকেও নিজেদের অন্তরকে হেফাযত করে। এমন যেন না হয় যে, শয়তান তাদেরকে এ সূক্ষ্ম ধরনের শির্কে লিপ্ত করে ধ্বংস করে ফেলে।

যে কাজে শির্কের সামান্য মিশ্রণও থাকবে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না

(٢٥٦) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَا اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً اَشْرَكَ فِيْهِ مَعِىَ غَيْرِىْ تَرَكْتُهٗ وَشِرْكَهٗ - وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاَنَا مِنْهُ بَرِىْءٌ هُوَ لِلَّذِىْ عَمِلَهٗ * (رواه مسلم)

২৫৬। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ আমি শির্ক ও অংশীদারিত্ব থেকে সবচেয়ে বেশী অমুখাপেক্ষী ও মুক্ত। (অর্থাৎ, যেভাবে অন্য অংশীদাররা অংশীদারিত্বের উপর রাজী হয়ে যায় এবং নিজের সাথে অন্য কারো অংশীদারিত্ব মেনে নেয়, আমি এভাবে মেনে নিতে রাজী নই; বরং সর্বপ্রকার অংশীদারিত্ব থেকে আমি সম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী ও মুক্ত।) অতএব, যে ব্যক্তি কোন আমলে আমার সাথে অন্যকে শরীক করে, (অর্থাৎ, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য আমার সন্তুষ্টি ও রহমত লাভ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে কিছু লাভ করা অথবা তাকে ভক্ত বানানো হয়,) আমি তাকে এবং তার এ শির্ককে বর্জন করে দেই। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। বস্তুতঃ ঐ কাজটি আমার জন্য নয়; বরং যার জন্য করেছে তার জন্যই। —মুসলিম

(٢٥٧) عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ فَضَالَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ لِيَوْمٍ لَارَيْبَ فِيْهِ نَادٰى مُنَادٍ مَنْ كَانَ اَشْرَكَ فِىْ عَمَلٍ عَمِلَهٗ لِلّٰهِ اَحَدًا فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهٗ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ اَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ * (رواه احمد)

২৫৭। আবূ সাঈদ ইবনে আবূ ফাযালা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা যখন কেয়ামতের দিন সকল মানুষকে একত্রিত করবেন, তখন একজন ঘোষণাকারী এ ঘোষণা দেবে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য কোন আমল করতে গিয়ে অন্য কাউকেও অংশীদার বানিয়ে নিয়েছিল, সে যেন এর প্রতিদান গায়রুল্লাহ্ অর্থাৎ, ঐ ব্যক্তির নিকট থেকেই চেয়ে নেয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা শির্ক থেকে সকল অংশীদারের চেয়ে বেশী অমুখাপেক্ষী। —মুসনাদে আহমাদ

ব্যাখ্যা ঃ উভয় হাদীসের সার ও মূল পয়গাম হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তা'আলা কেবল ঐ আমলকেই গ্রহণ করেন এবং এর উপরই প্রতিদান দেন, যা এখলাছের অনুভূতি নিয়ে কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি ও রহমতের কামনায় করা হয় এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে এতে শরীক না করা হয়। এর বিপরীত যে আমলের দ্বারা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো সন্তুষ্টি অথবা এর দ্বারা কোন

প্রকার স্বার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্য হয়, আল্লাহ্ তা'আলা সেটা কখনো কবূল করেন না। কেননা, তিনি অংশীদারিত্ব থেকে মুক্ত এবং শির্কের সংমিশ্রণ থেকেও অসন্তুষ্ট।

এ পরিণাম তো হচ্ছে ঐসব আমলের, যেগুলো আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে নিয়্যতের মধ্যে পূর্ণ এখলাছ ও একনিষ্ঠতা থাকে না; বরং কোন না কোনভাবে এতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো অংশ এসে যায়। কিন্তু যেসব নেক আমল কেবল রিয়ার সাথেই করা হয়, যেগুলো দ্বারা শুধু নাম-যশ, লোক দেখানো, খ্যাতিলাভ এবং মানুষের ভক্তি অর্জনই উদ্দেশ্য হয়, সেগুলো শুধু প্রত্যাখ্যান করে এসব আমলকারীর মুখেই ছুঁড়ে মারা হবে না; বরং এসব রিয়াকার মানুষ নিজেদের এসব আমলের কারণে জাহান্নামেও নিক্ষিপ্ত হবে।

রিয়াকারদের অপমানজনক শাস্তি

(٢٥٨) عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهٖ وَمَنْ يُرَائِيْ يُرَائِي اللّٰهُ بِهٖ * (رواه البخارى ومسلم)

২৫৮। হযরত জুন্দুব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন আমল শ্রুতি ও প্রচারের জন্য করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তার ব্যাপারটা ভালভাবেই প্রচার করবেন। আর যে ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য কোন আমল করবে, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে আচ্ছামত দেখিয়ে দেবেন। —বুখারী, মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ হাদীসটির মর্ম এই যে, যারা লোক দেখানো ও প্রসিদ্ধি লাভের জন্য নেক আমল করে, তাদেরকে তাদের এ কর্ম উপযোগী একটি শাস্তি এও দেওয়া হবে যে, তাদের এ রিয়াকারী ও মুনাফেকীর বিষয়টি খুব প্রচার করে দেওয়া হবে এবং সবাইকে দেখিয়ে দেওয়া হবে যে, এ দুর্ভাগারা এসব নেক আমল আল্লাহ্র জন্য করত না; বরং নাম-যশ এবং লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে করত। সারকথা, জাহান্নামের আযাবের পূর্বে তারা একটি শাস্তি এই পাবে যে, হাশরের ময়দানে সবার সামনে তাদের রিয়াকারী ও মুনাফেকীর পর্দা ছিঁড়ে দিয়ে সবাইকে তাদের অন্তরের কপটতা ও কলুষতা দেখিয়ে দেওয়া হবে।

দ্বীনের নামে দুনিয়া উপার্জনকারী রিয়াকারদের জন্য কঠোর সতর্কবাণী

(٢٥٩) عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ فِيْ اٰخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّاْنِ مِنَ اللِّيْنِ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّيَابِ يَقُوْلُ اللّٰهُ اَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ اَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِؤُوْنَ فَبِيْ حَلَفْتُ لَاَبْعَثَنَّ عَلٰى اُولٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ فِيْهِمْ حَيْرَانَ * (رواه الترمذى)

২৫৯। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শেষ যুগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা দ্বীনের আড়ালে দুনিয়া শিকার করবে। তারা মানুষের উপর নিজেদের দরবেশী জাহির করার জন্য এবং তাদেরকে প্রভাবিত করার জন্য ভেড়ার চামড়ার পোশাক পরিধান করবে। (অর্থাৎ, মোটা কাপড় ও কম্বল পরিধান করে নিজেকে সুফী-দরবেশ বলে প্রকাশ করবে।) তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়ে অধিক

মিষ্টি। কিন্তু তাদের অন্তর হবে হিংস্র বাঘের অন্তরের মত। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ্ বলেন ঃ এরা কি আমার অবকাশ পেয়ে ধোঁকা খাচ্ছে, না আমার উপর দুঃসাহস দেখাতে চায় ? আমার শপথ করে বলছি, আমি তাদের মধ্য থেকেই তাদের উপর এমন ফেতনা চাপিয়ে দেব, যা তাদের জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদেরকেও দিশেহারা করে ছাড়বে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, রিয়াকারীর এ প্রকারটি সবচেয়ে মন্দ ও ঘৃণিত যে, মানুষ দরবেশ ও বুযুর্গদের আকৃতি ও বেশ ধারণ করে এবং নিজেদের আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিপরীত মুখে নরম ও মিষ্টি কথা বলে সরলপ্রাণ লোকদেরকে নিজের ভক্তির জালে আবদ্ধ করার অপচেষ্টা চালায় এবং এভাবে দুনিয়া উপার্জনের কৌশল খাটায়। এসব লোককে আল্লাহ্ তা'আলা সতর্ক করে বলেছেন যে, মৃত্যুর পূর্বেই এ দুনিয়াতেই তারা কঠিন পরীক্ষা ও ফেতনার সম্মুখীন হবে।

রিয়াকার আবেদ ও আলেমদের জাহান্নামের কঠিন শাস্তি

(٢٦٠) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ ! قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ ؟ قَالَ وَادٍ فِىْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ اَرْبَعَ مِائَةِ مَرَّةٍ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا ؟ قَالَ اَلْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُوْنَ بِاَعْمَالِهِمْ * (رواه الترمذى)

২৬০। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা "দুঃখের কূপ" থেকে আশ্রয় প্রার্থনা কর। সাহাবীগণ জিজ্ঞাসা করলেন, দুঃখের কূপ কি ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটা জাহান্নামের একটা প্রান্তর অথবা পরিখা। (যার অবস্থা এতই খারাপ যে,) স্বয়ং জাহান্নাম প্রতিদিন চারশ' বার এর থেকে পানাহ চায়। জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে কারা প্রবেশ করবে ? তিনি উত্তর দিলেন ঃ ঐসব এবাদতকারী অথবা কুরআন পাঠকারী, যারা অন্যদেরকে দেখানোর জন্য নেক আমল করে। —তিরমিযী

ব্যাখ্যা ঃ জাহান্নামের এ "দুঃখ কূপে" যাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "কুররা" শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যার অর্থ বেশী এবাদতকারীও হতে পারে এবং কুরআনের এলেম ও কুরআন পাঠে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী লোকও হতে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীর মর্ম এই যে, জাহান্নামের এ বিশেষ কূপ ও পরিখায় তাদেরকে নিক্ষেপ করা হবে, যারা দৃশ্যতঃ উঁচুস্তরের দ্বীনদার, কুরআনের এলমের সম্পদে সম্পদশালী এবং বড়ই এবাদতকারী। কিন্তু বাস্তবে এবং অভ্যন্তর বিবেচনায় তাদের এ সকল দ্বীনদারী ও এবাদত-বন্দেগী হবে রিয়াসুলভ।

কেয়ামতের দিন সর্বাগ্রে রিয়াকারদের বিচার হবে

(٢٦١) عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ رَجُلٌ اُسْتُشْهِدَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعْمَتَهٗ فَعَرَفَهَا فَقَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِاَنْ يُّقَالَ جَرِىْءٌ فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهٗ وَقَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ

فِيْهَا ؟ قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْاٰنَ، قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ اَنَّكَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى اُلْقِىَ فِى النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَعْطَاهُ مِنْ اَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ فَاُتِىَ بِهٖ فَعَرَّفَهٗ نِعَمَهٗ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ اَنْ يُّنْفَقَ فِيْهَا اِلَّا اَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ثُمَّ اُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ بِهٖ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اُلْقِىَ فِى النَّارِ * (رواه مسلم)

২৬১। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যার বিরুদ্ধে (জাহান্নামে নিক্ষেপের) ফায়সালা করা হবে, সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে (জেহাদের ময়দানে) শহীদ হয়েছিল। তাকে আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ্ তাকে যেসব নেয়ামত দান করেছিলেন, এগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও আল্লাহ্-প্রদত্ত সকল নেয়ামতের কথা স্বীকার করবে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা জিজ্ঞাসা করবেন ঃ বল তো! তুমি এসব নেয়ামত পেয়ে কি কাজ করেছিলে ? সে বলবে, আমি তোমার পথে জেহাদ করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়ে গিয়েছি। (এভাবে আমি আমার সবচেয়ে প্রিয় ও মূল্যবান বস্তু আমার জীবনকে তোমার পথে উৎসর্গ করে দিয়েছি।) আল্লাহ্ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এ উদ্দেশ্যে জেহাদে অংশ গ্রহণ করেছিলে, যেন তোমাকে বীর বাহাদুর বলা হয়। আর সেটা তো বলা হয়েছেই। তারপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

আরেকজন হবে ঐ ব্যক্তি, যে এলমে দ্বীন শিক্ষা করেছিল এবং অন্যকে শিক্ষা দিয়েছিল এবং কুরআনও খুব ভালভাবে পড়েছিল। তাকেও আল্লাহ্র দরবারে পেশ করা হবে। আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও নিজের প্রদত্ত নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সেও সব স্বীকার করে নেবে। তারপর জিজ্ঞাসা করবেন ঃ তুমি এগুলোর দ্বারা কি কাজ নিয়েছিলে ? সে বলবে, আমি এলমে দ্বীন শিক্ষা করেছি এবং অন্যদেরকেও শিক্ষা দিয়েছি, আর আপনার সন্তুষ্টির জন্য কুরআনও পড়েছি। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো এলমে দ্বীন এ জন্য শিক্ষা করেছিলে এবং কুরআন এ জন্য পড়েছিলে, যাতে তোমাকে আলেম ও কারী বলা হয়। আর সেটা তো বলা হয়েছেই। তারপর আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয়জন হবে ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়াতে প্রচুর সম্পদ দিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ধরনের মাল-সম্পদ দান করেছিলেন। তাকেও উপস্থিত করা হবে এবং আল্লাহ্ তা'আলা তাকেও নিজের প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও এগুলোর কথা স্বীকার করে নেবে। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি এগুলো দিয়ে কি কাজ করেছ ? সে উত্তর দেবে, এমন কোন খাত নেই, যেখানে অর্থ ব্যয় করা তুমি পছন্দ কর; কিন্তু আমি সেখানে তোমার জন্য খরচ করি নাই। আল্লাহ্ তা'আলা বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি তো এ কাজ শুধু এজন্য করেছিলে, যেন তোমাকে দানশীল বলা হয়। আর সেটা তো বলা হয়েছেই। তারপর

তার ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া হবে এবং নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুড় করে টেনে নিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ আল্লাহু আকবার! কি ভয়ংকর পরিণতির কথা বলা হয়েছে এ হাদীসে! এটা শুনে কার অন্তরাত্মা কেঁপে না উঠবে ? এ জন্যই এ হাদীসের কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) এ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে কখনো কখনো বেহুঁশ হয়ে যেতেন। অনুরূপভাবে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, একবার তাঁর সামনে এ হাদীসটি বর্ণনা করা হলে তিনি খুবই কাঁদলেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন।

এ হাদীসে যে তিনটি আমলের উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ এলমে দ্বীন শিক্ষা করা ও শিক্ষাদান, কুরআন চর্চায় আত্মনিয়োগ এবং আল্লাহ্‌র রাহে জীবন ও সম্পদের কুরবানী— এ তিনটি কাজই উঁচু স্তরের পুণ্যকাজ। যদি এখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে এ কাজগুলো করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে এগুলোর প্রতিদান হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম। কিন্তু এ কাজগুলোই যখন লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং খ্যাতি লাভের আশায় অথবা অন্য কোন পার্থিব স্বার্থের জন্য করা হবে, তখন আল্লাহ্‌র নিকট এগুলো এমন পর্যায়ের গুনাহ্ ও পাপ যে, অন্য পাপীদের পূর্বেই এসব পাপে লিপ্ত লোকদের জন্য জাহান্নামের ফায়সালা করে দেওয়া হবে এবং এরাই সবার আগে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

নেক আমলের কারণে মানুষের কাছে সুনাম হয়ে যাওয়া আল্লাহ্‌র একটি নেয়ামত

(٢٦٢) عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَاَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ — وَفِىْ رِوَايَةٍ وَيُحِبُّهُ النَّاسُ عَلَيْهِ —قَالَ تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ *

(رواه مسلم)

২৬২। হযরত আবূ যর গেফারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, আপনি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলেন, যে কোন নেক আমল করে এবং লোকজন এ কারণে তার প্রশংসা করে— অন্য বর্ণনায় কথাটি এভাবে এসেছে যে, লোকজন এ কারণে তাকে ভালবাসে। তিনি উত্তর দিলেন ঃ এটা হচ্ছে মু'মিন বান্দার নগদ সুসংবাদ। —মুসলিম

ব্যাখ্যা ঃ রিয়া এবং প্রসিদ্ধি লাভের আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বোক্ত বাণীসমূহ সাহাবায়ে কেরামকে এমন শংকিত করে ফেলেছিল যে, তাদের কারো কারো অন্তরে এ সন্দেহ সৃষ্টি হতে লাগল যে, যে নেক আমলের কারণে দুনিয়ার মানুষ আমলকারীর প্রশংসা করে এবং তার নেক আমলের আলোচনা হয়, আর লোকজন তাকে আল্লাহ্‌র নেক বান্দা মনে করে তাকে ভালবাসতে শুরু করে, হয়তো ঐ নেক আমলও আল্লাহ্‌র দরবারে গৃহীত হবে না। কেননা, এ আমলকারী তো দুনিয়াতেই সুনাম ও ভালবাসার পুরস্কার লাভ করে নিল। এ ব্যাপারেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, যার উত্তরে তিনি বলেছেন ঃ "এটা হচ্ছে মু'মিন বান্দার নগদ সুসংবাদ।" এর মর্ম এই যে, কোন ব্যক্তির নেক আমলের সুখ্যাতি হয়ে যাওয়া অথবা লোকজনের তার প্রশংসা করা অথবা

তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়ে যাওয়া কোন খারাপ বিষয় নয়; বরং এ ক্ষেত্রে মনে করতে হবে যে, এটাও আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আখেরাতে প্রাপ্ত আসল পুরস্কারের পূর্বে এ দুনিয়াতেই একটি নগদ পুরস্কার এবং এ বান্দার মকবূলিয়্যাত তথা প্রিয়পাত্র হওয়ার একটি সুসংবাদ অগ্রিম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) একদিন নিজের ঘরে নামায পড়ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসল এবং সে তাঁকে নামাযরত অবস্থায় দেখল। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আমার এ কারণে খুব আনন্দ হল যে, এ ব্যক্তি আমাকে নামাযের মত একটি নেক আমলে লিপ্ত দেখতে পেয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ব্যক্ত করলেন। (যাতে আল্লাহ্ না করুন, এটাও যদি রিয়ার কোন শাখা হয়ে থাকে, তাহলে তিনি তওবা-এস্তেগফার করে নেবেন।) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আশ্বস্ত করলেন যে, এটা রিয়া নয়; বরং তুমি এ অবস্থায় নির্জনে এবাদতের সওয়াবও পেয়ে যাবে এবং লোকসমক্ষে এবাদতের সওয়াবও পেয়ে যাবে।

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, যেসব নেক আমল কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই করা হয়; কিন্তু আমলকারীর ইচ্ছা ও চেষ্টা ছাড়াই আল্লাহ্র বান্দারা এটা জেনে ফেলে এবং এর দ্বারা আমলকারীর মন আনন্দিত হয়, এমতাবস্থায় এটা এখলাছের পরিপন্থী নয়।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন নেক আমল এ উদ্দেশ্যে মানুষের সামনে করে যে, অন্যরাও তার অনুসরণ করবে এবং তার কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করবে, তাহলে এটাও রিয়া হবে না; বরং এ অবস্থায় এ বান্দা অন্যকে নেক আমল শিক্ষা দেওয়ার এবং দ্বীন প্রচারের সওয়াব পাবে। অনেক হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক আমল ও কাজে এ উদ্দেশ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখা হত।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে খাঁটি এখলাছ দান করুন, তাঁর একনিষ্ঠ বান্দা বানিয়ে দিন এবং রিয়া ও আত্মপ্রচারের মত মারাত্মক ব্যাধি থেকে আমাদের অন্তরকে হেফাযত করুন। আমীন!

২য় খন্ড সমাপ্ত